উজান-ভাঁটি

সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস

পরিবেশক :

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৭০০০০৯

UJAN-BHANTI

a novel by

Sukriti Ranjan Biswas

প্রথম প্রকাশ :
৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

প্রকাশনায় :
শ্রীমতী বিশখা বিশ্বাস
চিকনপাড়া, ঠাকুরনগর, ২৪-পরগণা

প্রচ্ছদ :
শ্রীপঞ্চানন মালাকার

মুদ্রণে :
শ্রীঅধীর বিশ্বাস
বর্ণালী প্রিন্টার্স
মছলন্দপুর, ২৪-পরগণা।

মশিয়াহাটীর দু'টি বিশেষ পরিচয় আছে—একটা হলো মশিয়াহাটী উচ্চ বিদ্যালয় এর বুকের উপর দাঁড়িয়ে, অপরটি হলো ছিয়ানব্বই-এর প্রাণ-কেন্দ্র বলে এর পরিচিতি।

ছিয়ানব্বই বলতে সমগ্র বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবংগের জন-সাধারণের এক বিরাট অংশ, বিশেষতঃ যারা বাঙাল, তাদের চিনতে অসুবিধা হয় না। ছিয়ানব্বই মানেই হলো পাশাপাশি ছিয়ানব্বইটি গ্রামের সমষ্টি; যশোর ও খুলনা জেলার একাংশ নিয়ে এর অবস্থান। মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশে ছিয়ানব্বই-এর প্রায় সমগ্র বাসিন্দা হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত, যার আবার নিরানব্বই শতাংশ লোকই হলো নমঃশুদ্র। এরা শিক্ষায় অত্যন্ত পিছিয়ে এবং আর্থিক অবস্থা এদের আরও বেশী শোচনীয়। এদের সম্পর্কে আরও একটা কথা বলার প্রয়োজন, নতুবা অবিচার করা হবে—এরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, সাম্প্র-দায়িক সম্প্রীতি এদের বর্ণনাতীত। অতীতের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এদের কখনও স্পর্শ করতে পারেনি।

আর, মশিয়াহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্মের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। আজ হতে ষাট-বাষট্টি বছর আগে, ১৯১৮ সালে এর প্রতিষ্ঠা। মশিয়া-হাটীর ছেলেরা পড়াশুনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ঠিক এরই আগের ক'টি বছর হতে।

দু'মাইল দূরে নেহালপুরের বাবুদের স্কুলে তারা যাতায়াত শুরু করে সংখ্যায় ওরা অত্যন্ত নগণ্য; পাঁচ-ছ'জন মাত্র। এরা প্রত্যেকেই বেশ মেধাবী, আগ্রহের কোন অভাব এদের ছিল না। এদের আরেকটি গুণ ছিল, যা অত্যন্ত অসময়োচিত বলা যেতে পারে, তা হলো আত্মসম্মানবোধ।

প্রতিদিন সকাল সকাল এরা ক্লাসে হাজির হয়ে সামনের সারিতে জায়গা নিতো, আর বাবুদের ছেলেরা এসে ওদের বইগুলি পিছনের বেঞ্চে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামনের সারিতে বসে ক্লাস করতো। বলাই-বাহুল্য, শিক্ষকের কাছে নালিশ জানিয়ে ওরা কোন সুবিচার পেত না।

জন্মলগ্ন থেকেই এরা লক্ষ্য করেছে, তাদের প্রতি বাবুদের ঘৃণা অত্যাচার। নীচ জাতি বলে বর্ণহিন্দু বাবুরা ওদের ছায়া মাড়াতে চাইলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক অত্যাচার করতে পিছপা হতো না।

অত্যাচারিত এই লোকগুলির মনে বিক্ষোভ পুরুষানুক্রমে দানা বেঁধে ছিল। অন্যায়, অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত, শোষিতের একদিন রুখে দাঁড়াবেই, এটা শাশ্বত সত্য ঘটনা; শুধুমাত্র সময় সুযোগের অপেক্ষা। এখানেও এতদিনে সেই শুভক্ষণটি এসে হাজির হলো।

এই অল্পবয়স্ক গুটিকয়েক ছাত্র সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল—সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াবে, প্রতিষ্ঠিত করবে তাদের ন্যায়সংগ অধিকার। তারা সেদিন শপথ করেছিল, বাবুদের বাড়ীতে পূজাপার্বণে তাদে প্রতি যে বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তারা ত প্রতিবাদ করবে; প্রয়োজনে তারা ওদের অনুষ্ঠান বর্জন করে নিজেরা তার আয়োজন করবে। যেকোন উপলক্ষ্যে বাবুদের বাড়ীতে সম্মানজনকভা আমন্ত্রিত না হলে সেখানে অংশ নেবে না এবং ভোজনান্তে নিজেদের এঁটো নিজেদের ফেলে দিয়ে আসবার মত কোন ঘৃণ্য শর্ত মেনে নেবে ন ক্ষেতে তৈরী ভাল শব্জী, গাছের ভাল ফলটি, ধৃত বড় মাছটি আর বাবুদে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হবে না। বাবুদের লেঠেলবাহিনীর অন্যায়-অত্যাচারে এরপর হতে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। তারা সেদিন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল, শিক্ষা তাদের আশু প্রয়োজন।

তারই শুভসূচনা ঘটলো নেহালপুর স্কুলে। প্রতিদিনের ন্যায় বাবুদে ছেলেরা ছোটলোকের ছেলেদের বইপত্র ছুঁড়তেই ওরা বাধা দিল। বা পেয়ে বাবুতনয়েরা ক্ষেপে গেল। কোমল হাতে চড় বসালো ছোটলোকে শক্ত চোয়ালে। কিন্তু আজ একটা অভিনব ঘটনা ঘটে গেল, ওরা মার পাল্টা মার শুরু করলো শক্ত হাতে। অপেক্ষাকৃত বয়োঃজ্যেষ্ঠ ও কষ্টসহি ছেলেগুলির হাতে প্রচণ্ড মার খেলো বাবুদের ছেলেরা। আর উল্লেখ করলেও চলে, এখানেই তাদের নেহালপুর স্কুলের পাঠ চুকে গেল।

বেপরোয়া ছেলেগুলি ঐদিনই সন্ধ্যেবেলায় দল বেঁধে চলে এলো নেহাল হাটে: হাটের একটিমাত্র মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খেতে চাইলো; কিন্তু ঘো

বা নারাজ। সে বলে, কোনক্রমেই দোকানে বসে ওদের মিষ্টি খেতে দেওয়া চলে না। ছেলেগুলিও নাছোড়বান্দা, দিতেই হবে। অগত্যা ভয় পেয়ে ঘোষমশায় কৌশল পাল্টে কাকুতি মিনতি শুরু করলো — বাবুদের বাড়ীর লোকেরা জানতে পারলে তার ব্যবসা গোটাতে হবে অথবা বাবুদের বাড়ীর কেউ তার দোকানে না খেলে ব্যবসা এমনিতেই গুটিয়ে যাবে। কিন্তু কাকুতি-মিনতিতে ওরা কান দিলো না; ওরা জানতো ঘোষ আর বাবুরা তাদের একই নজরে দেখে।

ফলে, যা ঘটবার তাই ঘটলো, মিষ্টির দোকান তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেল। তারপর বহুকাল ওখানে আর কোন মিষ্টির দোকান বসেনি, পরে যখন দোকান হলো, তখন সবাই পাশাপাশি বসে মিষ্টি খায়, গল্প করে।

এভাবে এখানে ওখানে বেশ কিছু সংঘর্ষের পর, নেহালপুর স্কুলে পড়া-বন্ধ যখন পাকাপাকি হয়ে গেল, তখন ওদের অভিভাবকেরা একসঙ্গে বসে পরামর্শ করে স্থির করলো, স্কুল নিজেদেরই একটা গড়তে হবে। সাথে-সাথে কুলটিয়া গ্রামের ঠাকুরদের ভিটাতে একটা দো'চালা ঘর তোলা হলো কিন্তু মুস্কিল বাধলো শিক্ষক নিয়ে। কোনক্রমে কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল, বাবুরা জানতে পেরেই তাঁকে ভাগিয়ে দিল। এ অবস্থায় সবাই একরকম নিরাশ হয়েই পড়েছিল কিন্তু তাদের এ উদ্যোগে ছেদ টানবার প্রয়োজন হয়ে ওঠেনি, শিক্ষক একজন মিলে গেল। লেখাপড়া যদিও বেশী জানেন না কিন্তু মনের জোর তাঁর প্রচণ্ড। তাছাড়া তিনি একজন অত্যন্ত প্রগতিমনা। নিজে ব্রাহ্মণ যদিও, শুদ্রদের তিনি মোটেই ঘৃণা করতেন না, বরং তাঁর, এদের দুরাবস্থা দেখে অত্যন্ত বেদনা হতো। বাবুরা শিক্ষকমশায়কে তাড়ানোর জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন। প্রথমে ভয় দেখানো হলো, পরে তাঁর সামনে দেওয়া হলো লোভের টোপ; কিন্তু এই আদর্শবাদী নির্ভীক পুরুষ কোন কিছুতেই তাঁর নিজের সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন করেন নি।

শ্রদ্ধেয় এই মহাপুরুষ তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন ছাত্রদের মানুষ করার কাজে এবং সাথে সাথে স্কুলটিকে গড়ে তোলার জন্যে প্রাণ-পাত পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের একটি করে ক্লাসে প্রমোশন

দিয়েছেন, আর স্কুলে বাড়িয়েছেন একটা করে ক্লাস। নতুন নতুন ছেলেরা এসে যেমন পূরণ করেছে নীচের শূন্য ক্লাসগুলি, ধীরে ধীরে তিনি নিয়োগ করেছেন আরও নতুন শিক্ষক। এইভাবে তিলে তিলে গড়ে তোলা তাঁর সে স্কুল এখন সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্টিত "মশিয়াহাটী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়"। সেদিনের সেই দো'চালা খড়ের ঘর আজ বিরাট অট্টালিকা। মশিয়াহাটী স্কুল এতদিনে জন্ম দিয়েছে একটা কলেজ, দু'টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দশটিরও বেশী উচ্চ বিদ্যালয় এবং অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমশায় অনেকদিন আগেই সবার মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু তাঁর কর্মফলের মধ্যে তিনি অমর হয়ে আছেন; মশিয়াহাটীর জনসাধারণ তাঁকে কখনও ভুলবে না।

আজ আর ওদের একটা চিঠি পড়াবার জন্যে বাবুদের বাড়ীতে ছুটতে হয় না, একটা চিঠি লেখাবার বিনিময়ে বাবুদের ক্ষেতে কোঁদাল চালাতে হয় না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আজও ওরা সুখী নয় বরং আজ ওরা আরও বেশী সমস্যা জর্জরিত। আজ বাবুদের অত্যাচারের বেশীর ভাগ অংশই দখল করে নিয়েছে একদিন যারা সম্মিলিতভাবে বাবুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তাদেরই একটা অংশ। আজ ওদের আপাতঃ শত্রুর চেহেরা পাল্টে গেছে, অত্যাচারের কৌশল অনেক বদলেছে বরং তা আরও বেশী তীক্ষ্ণ ও ব্যাপক। তাই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কি অবস্থায় এবং কিভাবে এ অত্যাচারের অবসানে কা'রা সংঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসে।

★ ★ ★ ★ ★

দীননাথের ঘুম ভেঙে গেল খুব ভোরে। রাত্রি তখনও অনেকটা বাকী ওর স্ত্রী বললো, আহানো মেলারাত বাহি, আর এটটু ঘুমোও, আমি ঠিক-মত ডাইয়ে দিবানি।

দীননাথ এক মুহূর্ত চিন্তা করলো— আজ তার নিজের জমিতে চাষ করতে হবে, ভাল করে বীজ ছড়াতে হবে—যাতে সমস্ত জমিটাতে সমান-ভাবে পড়ে। চাষটা আর মইটাও জুৎসই হওয়া চাই। ফলে সময় একটু

বেশী লাগবেই। নিজকে এবং বলদ দু'টিকেও আজ একটু বাড়তি খাটতে হবে, ফলে এক্ষুনি গিয়ে তাদের ভাল করে খাওয়াতে হবে। মালিকের মত বেশী জমিজমা থাকলে চিন্তার কিছুই থাকতো না। একটাতে কোন কারণে ধান ভাল না হলেও অন্যটাতে পুষিয়ে যাবে। কিন্তু তার জমি সামান্য, ধান একটু খারাপ হলে তার ধাক্কা ওর ছেলেমেয়ের গায়ে লাগবেই। নিজে কোনমতেই, কোন দিক দিয়েই তা পুষিয়ে নিতে পারবে না।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো সে, বললো, পূবি ফর্সা দেছে, আর শুয়া যায় না; তুই শুয়ে থাক্, আমি পাইখানা করে হাতমুখ ধুয়ে আসি, তারপর উঠিস্ কেনে।

দীননাথ সোজা গাঙ পাড়ের দিকে হেঁটে চললো, বটগাছের নীচের কল থেকে এক কস ভর্ত্তি জল খেয়ে নিলো ও। এ অভ্যাস ওর ছোট-বেলা থেকেই, ওর বাবা শিখিয়ে গেছেন। দীননাথ নিজেও খুব বিশ্বাস করে যে, বাসি পেটে জল খাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। গাঙ পাড়ের মুক্ত হাওয়ায় বসে প্রাতঃক্রিয়া সেরে নিলো, নিমের ডাল দিয়ে ভাল করে দাঁত মাজলো। কলে এসে হাতমুখ ধুয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই ওর কেমন যেন মনে হলো রাত্রি শেষ হতে আজ অনেক বাকী।

ও ফিরে গিয়ে পুলের ওপর বসল। এখানে গরমের দিনে পাড়ার ছেলেরা অনেক রাত পর্যন্ত বসে গল্প-গুজব করে। তাঁরমত বয়স্করাও হুঁকো *বোন্দেল নিয়ে মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে বসে; দুষ্প্রাপ্য অবসর বিনোদন করে।

কর্মশূন্য অবসর মুহূর্ত দীননাথের জীবনে খুব কম এসেছে। নিস্তব্ধ শেষরাতের নিঃসঙ্গ পরিবেশে দীননাথ একবার নিজের জীবনকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করলো। —দৈত্যের মত চেহারা, আর অসীম শক্তি ছিল দেহে। আজও যা অবশিষ্ট, এতদঞ্চলের দু'একটার বেশী যুবকের পেশীতে তা পাওয়া যাবে না। অলসতা কাকে বলে দীননাথ আজও তা জানে না। সাত বছর বয়সে তাঁর বাবা অপরের বাড়ীতে মজুরী খাটতে ওকে নিয়োগ করে।

---

* বোন্দেল—খড় মেয়েদের চুল বাঁধার মত শক্ত করে জড়ানো হয়, ক্ষেতে ওটাতেই আগুন ধরিয়ে রাখা হয়।

গরুর ঘাস-পল কাটতো দীননাথ, বিনিময়ে জুটতো ঝাটা-লাথি গালি-গালাজ থেকে অখাদ্য-কুখাদ্য পর্যন্ত। তবুও ওর বাবা পরের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনেনি, কারণ ঝাটা-লাথি খেয়েও বেঁচে থাকবে সেখানে, বাড়ীতে যে না খেয়েই মারা পড়বে। তবুও একটু ভাল ব্যবস্থার জন্যে কখনও কখনও একবাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে বদলি করেছে ওর বাবা, কিন্তু এ যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা !

দীননাথ সেই হতে আজও পরের বাড়ীতে মাহিন্দার। আজও অত্যাচার ও অনাচার সে সহ্য করে চলেছে, অভিযোগ সে করতে শেখেনি। এতদিন সে ভেবে এসেছিল গায়ে খেটে অবস্থার উন্নতি করবে। সে নিজে তার ফলভোগ করতে না পারলেও ভবিষ্যৎ বংশধরেরা নিশ্চয়ই ভোগ করবে। কিন্তু একান্তে বসে আজ তার মনে হচ্ছে, এ সবই ব্যর্থ প্রয়াস। কোথায় একটা প্রচণ্ড গলদ আছে, যার ঘূর্ণিপাকে সে দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে অনিশ্চয়তার গভীরে, কি সে গলদ !

এভাবে অনেকক্ষণ আপনমনে ভাবনার পর সম্বিত ফিরে পেল সে। বড় ক্লান্ত মনে হলো, এতটা দুর্বল ও অসহায় নিজেকে আর কোনদিন মনে হয়নি ওর।

কিন্তু আর বসে থাকবার সময় নেই তার; গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। বাড়ীতে এসে দেখে তার স্ত্রী উঠোনের গোবরছড়া সেরে ঝাঁটা দিয়ে ঝাট দিচ্ছে। দীননাথ জানে, সে উঠে পড়লে স্ত্রী কখনও বিছানায় শুয়ে থাকবে না। তবুও সে বললো, কি কয়ে গেলাম তোরে, না শুয়ে উঠে আসে কাজে লাগে গেলি ক্যান ?

স্ত্রী যেন একটু বিরক্তির সুরে জবাব দিল, তুমার জন্যি শুবার জো আছে নাহি ? দুহোর রাতি উঠে জনমভোর কাজ কাজ করে মরলে, সারাদিন খাটা-খাটনির পর রাতি তুমার এটটু ঘোমও কি আসেনা !

দীননাথ ব্যস্ত স্বরে বললো, কুঁড়ের মত শুয়ে শুয়ে যদি কাটাতাম, তালি আর ভাত জুটতনা কপালে। দে দে, পান্থা-টান্থা যদি থাহেতো তুড়ো দে, বেলা উঠে যাবেনে।

স্ত্রী আপনমনে বিড় বিড় করে বললো, এত খাটেও তুমার কপালে ভাত যে কত জুটলো! জোটা, না জোটার কি যে ফারাক তাই তো বুঝলাম না।

রাতে সবাইকে একমুট করে কম খাইয়ে দীননাথের জন্যে পান্তাভাত রেখে দিয়েছিল ওর স্ত্রী। সে জানতো পরের দিন নিজের জমিতে চাষ করতে যাবে দীননাথ, তাই ভোরে নিজের বাড়ী থেকেই কিছু খেয়ে যাবে।

স্ত্রী ঘরে ঢুকে টিনের থালাতে পান্তাভাত বেড়ে দিয়ে ওকে ডাক দিলো। রান্নাঘরে আবছা অন্ধকার, দীননাথ পা ছড়িয়ে পিঁড়ির ওপর বসলো। ওর স্ত্রী দু'টি কাঁচাঝাল,. লবণের মালা (পাত্র) আর একগ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওর স্ত্রী জানে, খাবার পর সে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। তাই, তাড়াতাড়ি ঘর থেকে রাতের বেলা কুলোয় ঝেড়ে ধামাতে গুছিয়ে রাখা চকচকে বীজ-ধানগুলি উঠোনে বের করে আনলো। হুঁকোতে জল পাল্টে দিয়ে কলকেটা নিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢুকলো। উনুনে কাঠের নিভন্ত আগুন তখনও ছিল। কল্‌কে সেজে ফুঁ দিতে দিতে রান্নাঘর থেকে বেরোতেই, পিছন পিছন দীন-নাথ খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লো। বীজের ধামাটা ঘাড়ে করলো, স্ত্রীর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে হাটতে হাটতে বলে চললো— ভাতটা সুয়ালে সুয়ালে দিয়ে আসিস্‌কেনে, অন্য কারো যদি পাস, তাগে কাছে না হয় পাঠায় দিস্‌কেনে। বেশী দেরী হয় না যানো·····।

এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পান্তাভাত একটি অতিপ্রিয় খাদ্য। সামর্থ্য থাকলে বাড়ীতে দু'বার উনুন জ্বলবে, কিন্তু খাওয়া চাই চারবার। ফলে, দু'বারই পান্তা। এরা অন্যান্য অনেক ধারনার সাথে এ বিশ্বাসও করে যে, পান্তা না খেলে শরীর ভাল হতেই পারে না। পান্তা ভাতের মধ্যে ৭২ রকমের রোগ বীজাণুর উপস্থিতি এদের স্মরণ করে দিলে এক-টাই উত্তর মিলবে, "ওসব শহুরে বাবুদের জন্যে খাটে।"

প্রলয়বাবু M. Com. পাশ করেছেন, Law পাশ করেছেন; বিরাট

অফিসার তিনি। তাছাড়াও, বিশেষ জ্ঞানীলোক বলে তাঁর খ্যাতিও প্রচুর। কিন্তু পান্তাভাতের দুর্বলতা আজও আদৌ কেটে উঠতে পারেন নি। থাকেন খুলনাতে, বাড়ী কুলটিয়া থেকে চাল নিয়ে যেতে যেমন হাঙ্গামা তেমনি ব্যয়বহুল। কিন্তু একমাত্র পান্তাভাতের লোভ সামলাতে পারেন না বলেই বাড়ী থেকে তাঁর চাল নিয়ে যাওয়া চাই-ই, কেনা চালের ভাতে কখনও ভাল পান্তা তৈরী হয় না।

অন্যান্য সবার থেকে দীননাথের স্ত্রী মোটেই ব্যতিক্রম নয়। রাতের খাওয়ার শেষে অবশিষ্ট ভাতে পরিমিত জল ঢেলে দেয়। ভাল করে চটুঝে দিয়ে উনুনের মুখে জলভাত পূর্ণ হাঁড়িটাকে বসিয়ে রাখতে সে কখনও ভুল করবে না। নিভন্ত উনুনের অল্প তাপে ভাতটা একটু পচে উঠবে, যারফলে মৃদু টকস্বাদ, যা সবাইকে এতবেশী আকর্ষণের ক্ষমতা রাখে: আউশ ধানের পান্তা হলেতো সোনায় সোহাগা।

এখন ফাল্গুন মাস। কিছুদিন হলো, চালু বিল থেকে জল নেমে গেছে। জলের সাথেসাথে বিলের মাঝে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত মাছও নেমে আসে খালের মধ্যে। তারপর, আরও পরে, খালের জলে টান পড়লে ওরা আরও পিছিয়ে গিয়ে ট্যাকার গাঙে আশ্রয় নেবে, আর বর্ষার নতুন জলের জন্যে অপেক্ষা করে করে আপনজনের অধিকাংশকেই হারিয়ে ফেলবে।

জলের সংগে বিল থেকে যখন মাছ নেমে আসতে থাকবে, মাছ ধরার জন্যে গ্রামের লোক নাড়ার বান্দাল (বাঁধ) দেয়। জায়গা বুঝে বান্দাল দিতে হবে, নতুবা মাছ তেমন পাওয়া যাবে না। বিলের মধ্যে যে জায়গাগুলি নীচু, সাধারণতঃ সেই পথ ধরে মাছ খালের দিকে নেমে আসে। স্বাভাবিকভাবেই, ঐপথগুলিতে বান্দাল দিতে পারলে বেশী মাছ ধরা পড়বে।

বিভিন্ন ধরণের মাছ ধরবার জন্যে আলাদা প্রকারের যন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা নতুন নতুন অবস্থাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির ব্যবহার করে এরা প্রচুর মাছ ধরতে সক্ষম হয়।

এ ধরণের বান্দালগুলিতে কই, মাগুর, জিয়েল (শিঙ্গী) ও ল্যাঠামাছই বেশী ধরা পড়ে। এবং যন্ত্রের ব্যবহার হয় সাধারণতঃ (স্থানীয় নাম) চারো এবং আরিংদে। তবে, যত আলাদা প্রকারের যন্ত্রই হোক, তার প্রত্যেকটি তৈরী তল্লা বাঁশের সলাকে তালগাছ থেকে প্রাপ্ত চোঁচ অথবা লতাদিয়ে সুন্দরভাবে জড়িয়ে।

এখন শুকনো বিলে ঐ সমস্ত নাড়ার বান্দাল আলের মত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত বিলের মাঝে কোন আল আদৌ থাকে না। বাঁশ অথবা কাঠের গোঁজা পুঁতে সীমানা স্থির করার নিয়ম আছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাও থাকেনা, তবে এরজন্যে কৃষকদের সীমানা চিনতে ভুল হয় না।

জমির ধান কাটা শেষ। বিলের জল নামতে নামতে নীচু জমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আরেকটা অভিনব উপায়ে কইমাছ, ল্যাঠামাছ ধরে থাকে। ওরা সাত-আটজন দলবেঁধে বিলে নেমে আসবে। হাটু অথবা তার কম জল যে সমস্ত জমিতে সেখানে জন্মগত অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ এই সমস্ত ছেলে-মেয়েরা বিশেষ বিশেষ জায়গা দেখে ঐটুকু ঘিরে বৃত্তাকারে দৌড়াতে শুরু করে। জায়গা বেশী নয়, ওরা প্রত্যেকে কোনরকমে ওর মাঝে দাঁড়াতে পারবে। কয়েক পাক দৌড়াতেই বালক সর্দারের নির্দেশে ঘেরা জায়গা হতে প্রত্যেকে অতি দ্রুত-তার সাথে নাড়াগুলি টেনে নিয়ে নিজ নিজ পায়ের নীচে গুঁজে দিয়ে জায়গাটিকে ঘিরে ফেলবে এবং একই সংগে ঘেরা জায়গাটিতে হাতড়া দিয়ে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে মাছ ধরে নেবে প্রত্যেকে। অথবা কখনও কখনও প্রতিযোগীতা উদ্ভূত উপসর্গগুলিকে এড়াতে ধৃত মাছ একই সঙ্গে রেখে দেবে, অবশেষে সমানভাগে ভাগ করে নিয়ে বাড়ী ফিরবে। এরফলে, পরবর্তী-কালে শুকনো বিলে জমিগুলি দেখলে মনে হবে প্রচণ্ড চেঁচো অথবা কচুর জমিতে শুয়োরে যেন মাটি খুঁড়েছে।

ছেলেমেয়েদের এই দৌরাত্মে বিলের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মাছ

গভীর জলে নেমে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে ; কিন্তু খালের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় অত সহজে মিলবেনা। চলার পথের অসংখ্য ফাঁদ অতিক্রম করলেও, খালের ভেড়িতে এসে আটকে যাবে ; এবং অগত্যা †নয়নঝুলিতে মাথা গুজবে।

ছেলেমেয়েরা এই সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে সারিবেঁধে †পোলো নিয়ে হানা দেয় তারা। শোল, বোয়াল, ল্যাঠামাছে পাত্র ভারি হয়ে ওঠে।

দীননাথ ডাক্তার বাড়ীতে বছর-মাইনে থাকে। বছরে সে পাবে নগদ ৬০০ টাকা। পূজোর সময় একটা গেঞ্জি, কাচা আর গামছা। আর সারা বছর প্রয়োজনে কাচা-গামছা সে পাবে। তবে, এখানে প্রয়োজনের কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা থাকে না। খাবে-দাবে ওখানেই, আর কাজ করতে হবে বাড়ীর কাজ মনে করে। প্রতিদিনের কাজের সময় সীমা—ভোর-বেলা কাক ডাকলেই কাজের শুরু, আর কাজ সেরে সে যখন অন্ধকারে সাপ তাড়াতে লাঠি ঠুক্তে ঠুক্তে বাড়ী ফিরবে তখন সমস্ত গ্রাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। উল্লেখ না করলে ডাক্তারদের প্রতি অবিচার করা হবে, ওরা দীননাথকে আরেকটি সুবিধা দেবে ; সেটা হলো, দীননাথ ওদের বাড়ীতে কাজের মধ্যে ডাক্তারের কাজের ক্ষতি না করে সময় করে নিতে পারলে নিজের বিঘাখানেক জমিও চাষ করে নিতে পারবে। অবশ্য বছর শেষে সেই কাজটুকু দীননাথকে পুষিয়ে দিতে হবে।

একদিনের জন্যে ডাক্তারের কোন জমিতে চাষের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আর কাকুতি-মিনতি করে দীননাথ ডাক্তারকে রাজী করেছে। একদিনের জন্যে হাল-বলদ ও নিজেকে নিজের জমিতে কাজে লাগাতে পারবে। দীননাথ একটু জোর দিয়ে বললে ডাক্তারবাবু অনেক সময় 'না' বলতে সাহস করেন না। কারণ, দীননাথের মত লোকের চাহিদা বাজারে প্রচুর। তারমত দক্ষ, পরিশ্রমী ও সৎ কৃষক খুব কম মেলে। তাছাড়াও, ওর আরেকটি বৈশিষ্ট্য—কাজ করতে গিয়ে ও কখনও নিজের আর অপরের কাজের কোন প্রভে

†নয়নঝুলি—কখনও কখনও খালের উল্টোদিকে ভেড়ী বাঁধবার মাটির প্রয়োজনে অগভীর গর্ত খোড়া হয়, ঐ গর্তকে নয়নঝুলি বলে। †পোলো—মাছ ধরবার এক ধরণের যন্ত্র

করে না।

নিজের জমিটাতে এখন পুরো জো। অনুমতি পেয়েই গতকাল সন্ধ্যে-বেলায় দীননাথ তার জমিতে গিয়ে জো-টা আরেকবার পরীক্ষা করে এসেছিল। নাড়ার বান্দালগুলি, আর এলোমেলোভাবে জমা করা নাড়ার ঘুটো (স্তুপ) ভেঙ্গে দিয়ে আলগাভাবে ছড়িয়ে দেয়। তারপর বান্দালের আগুন জেলে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসেছিল। এটাকে হুড়ো বাছা বলে।

ফাল্গুনের সন্ধ্যেবেলায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুকুর পাড়ের নারকেল, খেজুর, কলা, আম, জাম, কাঁঠাল আর বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে বিরাট খোলা বিলের দিকে তাকালে দেখা যাবে সমস্ত বিলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আগুনে শুকনো নাড়া পুড়ছে। ধূয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে, কখনও দখিনা হাওয়ায় মাটির সঙ্গে মিশেগিয়ে আকাশে উড়বার ফুরসৎ পাচ্ছে অনেকদূর এগিয়ে। কখনও কখনও পরিচালকহীন আগুন লাগামশূন্যভাবে জমির পর জমির নাড়া পুড়িয়ে দেয়। তারফলে, একদিকে যেমন জমিতে প্রচুর সারের যোগান পায়, অন্যদিকে কৃষকদের ক্ষতিও কম হয়না। এই নাড়া কৃষক-দের ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গরীব কৃষকেরা, যারা প্রতিটি গ্রামের তিন চতুর্থাংশের বেশি, সারা বছর এই নাড়া দিয়েই রান্নার কাজ চালিয়ে নেয়। এরফলে, তাদের জ্বালানী খরচটা প্রায় কোন খরচই নয়। কিন্তু এই সুবিধাটুকু ভোগ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশতঃ তাদের মাঝে মাঝে খেসারতও দিতে হয়। —বারান্দায় ছেলে কাঁদছে, সন্ধ্যে হয়ে এলো —পাঁতিশিয়াল অথবা বনবিড়ালের উৎপাত — হাঁস-মুরগীগুলিকে খুপীতে ঢোকানো প্রয়োজন, কর্তা বিল থেকে এসে মাছের ভাড়টা রেখে দিল —সেগুলি তাড়াতাড়ি কুটে আনা প্রয়োজন, উঠোনে ধান শুকোতে দেওয়া, হাঁসের পাল এসে লেগে গেল অথবা হঠাৎ বর্ষা এসে ধান, খড়, বড়ে প্রভৃতি ভিজে যাচ্ছে, ভাত নামাবার সময় হয়ে এলো, তরকারী এখনও হাঁড়ে

(মাচায়) অথবা ঘরের চালে, গিন্নী ছুটে বেরিয়ে গেল। উনুনের ওপর রান্না চড়ানো উনুনের ভিতরে তখন নাড়া জ্বালানি, জ্বলছে, যার লম্বা লেজ এসে শেষ হয়েছে ঘরের বাঁশের বেড়ার ধারে উনুনের পাশেই জমা করা ঐদিনের মত প্রয়োজনীয় নাড়ার ছোট্ট গাদাটিতে। ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটবে। আগুন নাড়া বেয়ে উঠে এসে প্রথমে গাদাতে, আর সাথে সাথে বেড়া হয়ে ঘরের চালে। গিন্নীর চোখ তখন ছানাবড়া, চিৎকার-চেঁচামেচি। গ্রামের লোক সব ছুটলো, ঘরখানা পুড়ে শেষ, আগুন আয়ত্বে এলো।

শুধু রান্নার কাজে নয়। ধান সিদ্ধ আর রস জ্বালানোর একমাত্র জ্বালানি এই নাড়া। এবং এ তু'টি কাজে গ্রামের লোকের যে কত বেশী জ্বালানি লাগে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঘরের ছাউনী হিসাবেও এর ব্যবহার ব্যাপক। গরীব কৃষকেরা শোবার ঘরখানার ছাউনীও এই নাড়া দিয়েই সেরে নেবে। ধনী কৃষকেরাও কখনও ঢেঁকিঘর, গোয়ালঘর, রান্নাঘর, বিচালীঘর প্রভৃতির ছাউনীতে নাড়া ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবহার করবে না।

তাই লাগামহীন আগুনে অনেক সময় সারিবদ্ধভাবে কেটে শুকোতে দেওয়া নাড়া পুড়ে ক্ষতি হয়ে যায় এবং জমির পর জমির নাড়া পুড়ে গিয়ে নাড়াসংকটের সৃষ্টি হয়।

এই সময় বিলের মধ্য দিয়ে দল বেঁধে লোক চলেছে শোলে বড়শী টানতে। ওরা এসছে অনেকদূর থেকে। ওদের প্রায় সবাই মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। খানপুর, ভরতপুর, কোনাখোলা প্রভৃতি দূরের গ্রামের মাছুরে ওরা। ওরা চলবে খালের পাতাড়ি (ভেড়ি) ধরে সারি বেঁধে। ডানহাতে দশ-বারো হাত লম্বা ছিপ, বাহাতে টর্চ আর †খারোই। †চার হিসাবে ওরা ধরে আনবে ছোট ছোট জ্যান্ত পাতি ব্যাঙ। ওগুলি শোলমাছের লোভনীয় খাদ্য।

---

†খারোই – মাছ রাখবার পাত্র। †চার – মাছের লোভনীয় খাদ্য

ওরা সন্ধ্যের পর গিয়ে বসবে ধাপের পাশের জলাজমিতে অথবা রাতের ান্ধকারে মানুষেরসুলভ স্বভাবের বশবর্তী হয়ে বেশী মাছের লোভে অন্যের ঘয়োতে ছিপ ফেলবে।

ঠিক এই সময়ে মানুষেদের উল্টো গতি নাড়ার বোঝা কাঁধে সারিবদ্ধ বক। রাস্তা থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হবে কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে বড় বড় নাড়ার বোঝাগুলি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কিন্তু নিকটে গেলে ভুল ভেঙ্গে যাবে, দু'দুটি বোঝার মাঝে গ্রাম বাংলার সাধারণ বি, একটি করে অস্থিকংকালসার ঘর্মাক্ত মানুষ। মাধ্যাকর্ষণ বল, আর ফাল্গুনের হাওয়ার সাথে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে তারা গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে আসছে। এই গোধূলী লগ্নে কল্পনাবিলাসীরা আমাদের দৃষ্টির অতীত হয়তো আরও অনেক কিছুই এখানে খুঁজে পেতে পারে।

★ ★ ★ ★ ★

শ্যামল দাঁড়িয়ে বললো, আমি সভাপতিমশায়ের অনুমতি নিয়ে শ্রদ্ধেয় মলকবাবুর উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি। উনি বিভিন্ন বংশের নামোল্লেখ করে যেভাবে কটাক্ষ করেছেন তাতে আমি মনে করি উক্ত বংশের সমস্ত লোকদের সাথে তিনি এই সভাকেও অবমাননা করেছেন। তাই আমি দাবী করি, তিনি তাঁর এই কথা প্রত্যাহার করুন। —সভার মাঝে শ্যামলের সমর্থনে অনেকেই এগিয়ে এলেন। আধা অন্ধকারে পিছন থেকে কে একজন বলেই ফেললেন, বিশ্বাসগোষ্ঠী, ঢালীগোষ্ঠী, মল্লিকগোষ্ঠী, ঘরামীগোষ্ঠী এভাবে গোষ্ঠী গোষ্ঠী বলে কথা বলার তুমি কে? কুলটিয়ার ছেলেরা বিনাপয়সায় স্কুলে পড়বে নাতো ফ্রি পড়বে কি সুজাতপুরের বিশ্বাসরা?

আমরা জমি দিয়েছি, ছেলেরা ফ্রি পড়ে, তোমরা দাও নি, ফ্রি পড়ার সুযোগ তোমাদের নেই। এটা তাঁরা, যাঁরা স্কুল তৈরী করেছিলেন, নিয়ম করে গেছেন। তুমি এসব নিয়ে ব্যঙ্গ করার কে? এভাবে বিভিন্ন লোকের নানা ধরনের মন্তব্যে সভায় হৈচৈ শুরু হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে গোলমাল থেমে এলো। অলকবাবু সবাইকে বোঝাতে চাইলেন, কাউকে ব্যঙ্গ করে তিনি ওকথা বলেন নি, স্কুলের স্বার্থে তিনি ঐ কথার উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে স্কুলের ½ অংশ ছাত্র আসে কুলটিয়া গ্রাম থেকে, তার প্রায় কেউই বেতন দেয় না। যার ফলে স্কুলের ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক কাঠামো দিন দিন আরও দুর্বল হচ্ছে। তিনি মোটেই কুলটিয়ার লোকের ত্যাগের কথা অস্বীকার করেন নি। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলেন, তখনকার দিনে, যখন স্কুল তৈরী হয়, তার থেকে আজকের দিনের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই কিছু নিয়ম-কানুনের পরিবর্তনের প্রয়োজন এসে পড়েছে। তাঁরা স্কুল তৈরী করতে যে কৌশল নিয়েছিলেন, আজ সে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে সে নিয়মের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের একান্ত প্রয়োজন।

অলকবাবু, শ্যামলের কথাটাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। বুঝতে পেরেছেন আবেগে তিনি কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, যা সভাতে বিসদৃশ মনে হতেই পারে। কিন্তু সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে যে সমস্ত কথা সভাতে উঠেছে তা অত্যন্ত বেমানান ও অপমানসূচক। তাতে তিনি ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হলেও তা প্রকাশ করলেন না। এই সমস্ত কারণে অলকবাবুকে সবাই বুদ্ধিমান ও কুশলী লোক বলে শ্রদ্ধা ও ভয় করে।

সীমানার খালের পাড়ে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। খালের পাড়ে বলে এ হাটের নাম খালের হাট। হাট বসে রবি ও বুধবারে সন্ধ্যায়। অঞ্চলের যে কোন সভা, তা স্কুল সংক্রান্ত হোক, মিলিত পূজা বা এমন কোন সভা যাতে দু'দশ গ্রামের লোকের হাজির হবার প্রয়োজন—তা হাটবারেই বসবে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ তথাকথিত স্বাধীন হবার পর মশিয়াহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ে কোন স্থায়ী কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। চার সদস্য-বিশিষ্ট এ্যাডহক কমিটি কাজ পরিচালনা করে চলেছিলেন। ইতিমধ্যে সরকারী circular এসেছে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী কার্য্যনির্বাহক কমিটি গঠন করতে হবে।

ফলে, এর জন্যে যে জিনিষটির আশু প্রয়োজন তাহলো ভোটারতালিকা। পুরোনো ভোটারতালিকা থাকে; প্রতিবারেই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কিছু কিছু ওর উপর যোগ-বিয়োগ করে তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু এবারের অবস্থা অন্যরকম। ১৯৭১ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের কাড়াকাড়ির সময়ে গোলমালে স্কুলের সমুদয় কাগজ-পত্র খোয়া গেছে। তাই, এবারে নতুন করে ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

মশিয়াহাটী এলাকাতে এই নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন থেকেও বেশী উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অনেক বেশী খাটুনী খাটে যারা এই নির্বাচনে কর্মীর ভূমিকা নেয়। সেজন্যে ভোটারতালিকা প্রস্তুত ও তার নীতি-নির্ধারণের এই সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্কুলের সামনে খোলা আকাশের নীচে সভা বসেছে। সভাপতির আসনে বসেছেন স্কুলের প্রাক্তন সেক্রেটারী ফণীবাবু; বুড়ো মানুষ তিনি, সভাপতি হলেও সভা পরিচালনার দায়িত্ব কিন্তু তাঁর নয়।

সভার দিকে মুখ করে যে চেয়ার ক'খানি দেওয়া হয়েছে তাতে বসে আছেন বিজয়বাবু, বাণীবাবু, উপেনবাবু প্রমুখ অঞ্চলের গণ্যমান্য প্রবীণ লোকেরা। সভায় উপস্থিত অন্যান্যরা সবাই মাঠের সবুজ ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে আছেন। একটা মাত্র হ্যারিকেন সভাপতিমশায়ের টেবিলে। কোন Resolution হলে লিখতে হবে মনে রেখে কাগজ-কলম টেবিলের উপর রাখা হয়েছে এবং লেখবার জন্যে প্রধান শিক্ষকমশায় প্রস্তুত।

নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক গার্জেন ভোটার হবেন, সেখানে গোলমালের কোন প্রশ্ন ওঠেনা। যে বাড়ীতে ছাত্ররা ফ্রি লজিং পায়, সে বাড়ীর কর্তা বিদ্যোৎসাহী বলে পরিগণিত হবেন, তিনিও ভোটার। Founder

ভোটার আছেন সাতজন। প্রকৃত Founder-এর মৃত্যুর পর তার উত্তর ধিকার কেউ ভোটার নির্দিষ্ট হয়ে আছেন। ফলে, সেখানে আপাততঃ আ কোন ঝামেলা নেই। কিন্তু বিতর্কের ব্যাপার হলো Donor ভোটার আগে থেকেই Donor ভোটার তালিকা নিয়ে অনেকের মনে ক্ষোভ জ হয়েছিল। তার উপর ৭১-এর ঝামেলার সময়ে কয়েকজন ভোটার মা গেছেন। তারজন্যে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে আছে।

হয়তো পাঁচ কাঠা জমি দান করেছেন কারুর বাবা অথবা ঠাকুরদা তাঁদের ছেলে অথবা নাতি এখন পাঁচ-সাত-আট-দশজন। কে অথবা ক'জ এখন ভোটার হবেন? ওদের হয়তো বিভিন্ন জনের দল আলাদা। যা জন্যে নেতারা চাচ্ছেন নিজ নিজ দলের লোক ঐ পরিবার থেকে ভোট হোক।

এ সমস্ত সমস্যাকে সম্বল করে অলকবাবু তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় প্রাসঙ্গি ভাবে গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছিলেন। ভাবাবেগে যা হয়তো সীমাকে কিছু অতিক্রম করেছিল।

অলকবাবু অঞ্চলের ত্ব'টি দলের একটির নেতা। কুলটিয়ার বেশি ভাগ লোক তাঁর বিরোধিতা করে এখন। তাই, Donor ভোটার কম হবে উনার সুবিধা ততবেশী। তিনি চেয়েছিলেন বিশেষ কায় কুলটিয়ার প্রতি ঐ এলাকার লোকের একটা বিরূপ মনোভাব জাগি তুলতে। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে সুকৌশলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ বিপ

সেদিনের সে সভা আর বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সিদ্ধান্তশূন্য সভায় হৈ-হট্টোগোলের মধ্যে সেদিনের মত ছেদ পড়ে গেল।

অতীতে শ্যামল বহুবার চিন্তা করেছে এ সমস্ত দলাদলির ঘটনা নি আজও সে গভীরভাবে ভাবলো দলাদলিসৃষ্ট উপসর্গগুলি নিয়ে।

নির্বাচন নিয়ে এই দলাদলিতে প্রত্যেকটি দলের প্রথম এবং প্র উদ্দেশ্য থাকে যেকোন প্রকারে ক্ষমতা দখল। তারজন্যে, তারা বি ধরণের অপকৌশল প্রয়োগেও কখনও পিছপা হয় না; ঠিক যেম ঘট্‌ছে আমাদের দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে। ফলতঃ এর কুফল হয় অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

ক্ষমতা দখলের এই খেয়োখেয়িতে ভোটারদের তরফ থেকে অনেক ময় অন্যায় ধরণের শর্ত আরোপ করা হয়। যেমন—তাদের বংশের কোন ছেলের স্কুলে চাকরী দিতে হবে, কাউকে কাউকে ফ্রি পড়বার অথবা অর্ধেক বেতনে পড়বার সুযোগ দিতে হবে, যদিও তারা তার মোটেই উপযুক্ত নয়।

নির্বাচনের পরেই এ ধরণের শর্তের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কোন শূন্যপদ পড়ে থাকলে সেখানে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক কর্মীকে নিয়োগ করা হয়। বেশীরভাগ স্থানেই দেখা যায় তারা সে পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে শূন্যপদের সৃষ্টি করা হয় অবৈধ উপায়ে। ফলে, একদিকে যেমন একজন উপযুক্ত শিক্ষক অথবা শিক্ষক কর্মচারী কর্মের সংস্থান হারিয়ে ফেলেন, অন্যদিকে স্কুলের শিক্ষকদের চেয়ারে এসে জমা হয় আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল।

এর ফল হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। পচা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয় বাড়তি উপসর্গ। শিক্ষার মান নামতে নামতে একেবারে শেষ বিন্দুর দিকে ধাওয়া করে। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় ছাত্রেরা দিশেহারা, ছাত্রেরা আজীবন তার ফলভোগ করে, ভোগায় অভিভাবকদের, জাতীয় জীবনেও এর প্রভাব পড়তে বাধ্য।

ক্রমে ক্রমে শিক্ষকরাও বিভক্ত হয়ে পড়েন দু'টি বিবাদমান শিবিরে; ছাত্রদেরও তাঁরা দু'টি ভাগে ভাগ করে ফেলেন। ফলে, সেখানেও পক্ষপাতিত্ব দেখা দেয়। এর ছোঁয়া সরলপ্রাণ ছাত্রদেরও আক্রমণ করে বসে, কেউই রেহাই পায় না।

ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্রদের পরস্পরের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে। শিক্ষকেরা নিজেদের সহকর্মীদের সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখেন, পরস্পর পরস্পরের নিকট হতে দূরে সরে যান, আদর্শ গুলিয়ে ফেলেন। প্রত্যেকে নিজের নিজের অবস্থানকে দুর্বল মনে করেন। নিজেদের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সদা ভীত হয়ে থাকেন। একে অপরের সর্বনাশ করতেও দ্বিধাবোধ করেননা; এই দলাদলিতে স্কুলপ্রাঙ্গন কলুষিত হয়।

গ্রামে গ্রামে শুরু হয়ে যায় এর মারাত্মক কুফল। ঝগড়াঝাটি থেকে মারামারি পর্যন্ত। এক বংশের সাথে অন্য বংশের অনুরূপ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এমনকি ভাইয়ে ভাইয়ে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত করে ফেলে।

এই দলাদলি সংক্রামিত হয় খেলাধূলা, গান-বাজনা, পূজাপার্বণের মত সার্বজনীন ক্ষেত্রগুলিতেও। জমিজমা সংক্রান্ত ছোট-খাট গোলমালকে কোন কোন সময়ে এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক করতে সাহায্য করেছে; যারফলে খুন-জখমও হয়েছে অনেকে।

এ সমস্ত দলাদলির সুযোগ নিয়ে গ্রামের এক শ্রেণীর সুবিধাবাদীরা তাদের কাজ হাসিল করে, শ্রেণীচেতনাহীন এই সাধারণ কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে আর ওরা দূরে বসে মজা উপভোগ করে।

স্কুলের ছাত্রদের একটা বড় অংশ কনসেশন ভোগ করে থাকে। কিন্তু পারতঃপক্ষে যারা এটা পাওয়া উচিৎ তারা কখনও পায় না। এখানে পক্ষপাতিত্ব হয় প্রায় ষোল আনা পরিমাণে। যারা উপযুক্ত একদিকে তাদে যেমন বঞ্চিত করা হয়, অন্যদিকে দলীয় স্বার্থে নির্ধারিত সীমার অনেক বেশী ছাত্রকে এ সুযোগ প্রদান করে স্কুলের অর্থনীতিকে দুর্বল করে ফেলা হয়ে থাকে।

দলাদলি থেকে আরও একটি মারাত্মক কুফল পাওয়া যায়। কো দলই উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করতে সাহসী হয় না। বিবেকবুদ্ধি হীন, প্রশাসন সম্পর্কে অজ্ঞ, একটা পুতুল বিশেষকে তারা চেয়ারে বসিয়ে রাখবার পক্ষপাতি—যাতে খুশীমত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসানো যায়। ফলত সর্বত্র আরও বেশী বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, স্কুলের Development-এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

আপাতঃশেষ ফল হিসাবে উল্লেখ করা যায় মামলা-মোকদ্দমা। যা স্কুলের ইতিহাসে মোটেই নতুন নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচনের বৈধ চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা করা হয় এবং একপক্ষ স্কুলের টাকা এ অজুহাতে যথেচ্ছ খরচ করতে ও আত্মসাৎ করতে পিছপা হয় না।

ক্ষমতাসীন দল কোন ভাল পদক্ষেপ নিলে বিরোধীদের কর্তব্য হয়ে পা তাকে যেকোন প্রকারে বাধা দেওয়া। বিরোধীদের ভয় লাগে, ভাল কা ক্ষমতাসীনেরা সফল হলে আগামীতে তাদের হৃতস্বর্গ পুনরুদ্ধার করা অসম্ভ হয়ে পড়বে।

শ্যামল এ ব্যাপারে অনেক আগেই তার কিছু কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সা

আলাপ-আলোচনা করেছে। সাড়াও যে মেলেনি এমন নয়। কিন্তু অত্যন্ত শক্ত বাধা দেখে অনেকেরই হতাশার সুর; আবার কেউ কেউ বেশ আগ্রহও দেখিয়েছে।

শ্যামল মনে মনে স্থির করে ফেললো। —এর একটা সুষ্ঠ সমাধান করতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কৌশলও সে মোটামুটি স্থির করে নিলো। একটা তৃতীয় শক্তির জন্ম ঘটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে সে। যে শক্তি তৈরী হবে স্কুল, অঞ্চল ও সাধারণ মানুষের প্রতি সত্যিকারের দরদীদের নিয়ে।

তার কিছু সৎ বন্ধুকে নিয়ে সে নেমে পড়বে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিদ্যানুরাগী ও স্কুল সম্পর্কে আগ্রহী কৃষকদের আগ্রহ ও সাহস বাড়িয়ে তুলতে হবে, যাতে তারা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে এগিয়ে আসে। সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে নির্বাচন ঠেকাতে, মিটমাটের মাধ্যমে তৈরী করতে হবে একটা সার্বজনীন কার্যনির্বাহক কমিটি এবং সেখানে প্রবেশ ঘটাতে হবে নিরপেক্ষ, বুদ্ধিমান ও সৎ জনসাধারণকে।

শ্যামলের মনে বারে বারে অলকবাবুর কয়েকটি কথা নাড়া দিল। "নিয়মকানুনের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন। স্কুল সৃষ্টি করতে তাঁরা যা করেদিলেন, প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করতে তার পরিবর্তন প্রয়োজন"। —হ্যাঁ, সত্যি আজ বেশ কিছু নিয়ম পরিবর্তন করা প্রয়োজন, যেগুলির প্রয়োজন এখন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু অলকবাবু কি সত্যিকারের স্কুল-দরদী বলে একথা বললেন, না এগুলি তাঁর অপকৌশলের অংগ? —এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে শ্যামলের ঘুম এসে গেল। আগামীভোর হতেই কাজে নেমে পড়বে, আরেকবার তার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

★

বড়পুকুর পাড় দিয়ে দীননাথ আস্তে আস্তে বিলে নেমে গেল। কাঁধে লাঙলের একপ্রান্তে বাষইখানা (মই) আর অন্যপ্রান্তে শিকের মধ্যে ঝোলানো বীজধানের ধামা ও জোয়াল, ডানহাতে হালো পাঁচনি (লাঠি) বাহাতে হুঁকোটি টানতে টানতে দীননাথ লম্বা পায়ে এগিয়ে চললো বিলের মধ্যদিয়ে। তালতলা অতিক্রম করে ও খালের পাড়ে পৌছালো। ওখানকার

বেলে জায়গা দিয়ে গরু দু'টিকে ও নিজে পার হয়ে গেল। বলদজোড়াও যেন টের পেয়ে গেছে আজ দীননাথের জমিতে চাষ দিতে হবে। যে দীননাথ আদর করে খাবার দেয়, কুচি-কুচি করে পল কেটে দেয়, খোল মেখে দেয়, অকারণে যত্ন করে। তাই, ওরাও আজ ব্যস্ত।

জমিতে পৌঁছে দীননাথ ধান বোনা শুরু করল, প্রথমে লম্বালম্বি, পরে আড়াআড়ি, তারপর চার পাঁচ †আতর চাষ করে ফেল্‌লো, কিন্তু তখনও বিলের মধ্যে কাউকে কাছাকাছি দেখতে পেলোনা সে। মুখে চোঁ-চোঁ শব্দ করে বলদ জোড়াকে থামিয়ে লাঙ্গলের পাশে পাঁচনিটা পুঁতে রাখলো। ভাবলো, একটু তামাক খেয়ে নেবে। কিন্তু এতক্ষণে তার খেয়াল হলো—তামাক-বোন্দেল আনতে আজ বেমালুম ভুলে গেছে সে। অগত্যা জমিতে দলাদলা হয়ে জমে থাকা নাড়ার ছাই পা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগল, আর অপেক্ষা করতে থাকলো কাছাকাছি কাউকে পাওয়া যায় যদি।

অবশেষে শান্তিরাম এসে পাশের জমিতে লাঙ্গল জুড়লো। দীননাথ বললো, কাহা, তামাক বোন্দেল আনতি ভুলে গিছি, তুমার বোন্দেল কি ধরানে আছে?

শান্তিরাম রসিকতা করতে খুবই ভালবাসে। সে বললো, বেলা উঠার আগে দশ কাঠা চষতি গেলি কি আর বোন্দেল বটার সুমায় পাওয় যায়! ছিলুম সাজ, আমি দুইপাক মারতি লাগি।

দীননাথ তামাক সেজে ঝট্‌পট্ কয়েকটা টান, তারপর লম্বা শেষটা মেরেই বললো, টানবা নাহি কাহা? মেলাক্ষণ কামাই গেল, ধরো তাড়াতাড়ি

শান্তিরাম বললো, মান্‌সি মজা করে কয় শুনিচি, আমার নাহি কা থুয়ে ভুঁই রুয়ার সুমায় হয় না। আসলে কথাডা এ্যাহেবারে মিথ্যে না আমি এহন তামাকটানা আর আড্ডামারাডারেই আসল কাজ বুলে ধ নিছি; নাঙ্গল চষা আর ধান কাটাডা হলো ফাও। —বলতে বল লাঙ্গল ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে এসে দীননাথের হাত থেকে হুঁকোটা নি আর আরাম করে টান্‌তে টান্‌তে দীননাথের পিছু নিল; জাঁকিয়ে বস

†আতর: জমিতে চাষের সুবিধার জন্যে কৃষকেরা জমিটাকে ৪/৫ হাতের ক্ষুদ্র অ ভাগ করে নেয় একবার করে লাঙল চালিয়ে। এই ক্ষুদ্র অংশগুলিকে আতর ব

নাথের জমির আলে।

দীননাথ ততক্ষণে ঢা···নি, বায়, থায়-পারতলে, থায়-থায় প্রভৃতি করতে করতে চাষ শুরু করেছে।

শান্তিরাম ডাকলো, ও দীনো, তোর সাথে কয়ডা কথা ছিল, শুনবি তি? —সাড়া না পেয়ে আবার তাগাদা দিলো, কি কানে তুলো দিছির তি?

দীননাথঃ কও, আমি শুনতিছি।

শান্তিরাম আরম্ভ করলো, গতরে খাটে অবস্থার উন্নতি করবো তোর মত মিও একদিন ভাবদাম। তোর বাবাও ভাবদো, আর কি প্রচণ্ড খাটতো র বাবা, সেকথা তোরওতো মনে থাহার কথা। সগলে ভাবে আর খায়ে খাটে খাটে শেষে অকালে বুড়ো হয়, কিন্তু কতি পারিস কেউ রেচে অবস্থা ভাল করতি এভাবে? তোর বাবাকি পারলো? তোর বাবা টে থাকতি কি পাইলো আর তুইও বা বাবার কাচতে কি পাইচির? বার চিন্তা করে ছাখ্। কিছু তোর বাবা তোরে দিয়ে যাতি পারেনি। লি এতখাটে করলো কি? আর তুইওবা কি করলি এতকাল? —দীননাথের দিয়ে কোন জবাব না পেয়ে শান্তিরাম আবার তাগাদা দিল, কি, া কচ্চিরনে যে?

দীননাথ বললো, তুমি কও, আমি শুন্‌তিছি।

ঃ তা মাঝে মধ্যি এট্টু হঁা-হুঁ, না করলি কি কতা কয়ে আরাম ওয়া যায়? এট্টু সায়-টায় পুরিস্?

শান্তিরাম বলে চললো, আসলে এই খাটাখাটনির দাম কেউ কোনদিন না, অথবা যাগে জমিতি খাটি তারা দে না। আমি ভাবেচিন্তে তাই করিচি, যেটুক না করলি এহেবারে চলেনা, তার বেশী একদম না। চাইতে ঐটুক্ শক্তি জমা থাক, লাগলি অন্যকোন ভাল কাজে লাগবে, লাগলি দুই-চারদিন বেশী বাঁচপো।

সত্যিকারের রোগডা আগে ধরা দরকার। খাটাখাটনি যারা করে ক্যান্ সেই পাগলদলের দিন দিন ভাত উঠে যাচ্ছে! আর বাবুগিরি মারে যারা রিঘরের খুটিতি পা বাঁধায়ে বসে থাহে, তাগে দিন দিন পোয়াবারো হচ্ছে!

দীননাথ এতক্ষণে মুখ খুললো, বললো, এসব আমিও ভাবিচি। কিন্তু কি আর করা যাবে! উগে যে জমিজমা মেলা, আরামতো উরা করবেই; আর আমাগে প্যাটের জ্বালায় খাটে মরতি হবে!

শান্তিরাম বললো, আমি মেলা ভাবিচি দীনো। কাজে ঢিল মারে আমি ভাবনার পরে জোর দিছি। কিন্তু বুঝতি পারতিছিনে কি এরে এই উল্টো পাকড়া মারে। আসলে তো যারা কাজকর্ম করে, তাগে অবস্থা দিন দিন ভাল হবার কথা। তা ভাল না হয় নাই হলো; কিন্তু আজ-কাল তো আর ভাতই জোটে না।

তবে ফুলবাবুদের জব্দ করার এট্টা পিলান আমি পায়ে গিছি আমরা যদি কেউ নাঙল না চষি, তালি বাবুগে কুপোকাত। মেলাজমির মাটি খায়ে তো আর দিন চলবে না!

দীননাথঃ কেন, কিনে খাবেনে?

ঃ কিনতি গেলিতো পয়সা লাগে। পয়সা পাবে কনে? উগে তো পয়সা হয় ধান-চাল বেচে।

ঃ অন্য জাগারতে জন কিনে আনবে?

ঃ সেইতো কলাম, আমরা দেশের যতলোক জন বেচে খাই, কেউ পরের জমিতি কাজ করবো না, তালি? —দারুণ তৃপ্তিতে শান্তিরাম হো হো করে হাসতে হাসতে বললো, ইডা করতি পারলি নির্ঘাত উগে দাঁতে দড়ি।

ঃ তোমার যতসব আজগুবি চিন্তা ভাবনা!

ঃ তুগে মোটা মাথায় এইডেরেই আজগুবি মনে হয়! আমরা খাটে মরবো, আর আমাগে ছাওয়াল-মায়েরা না খায়ে মরবে, ইডা আজগুবি ভাবতি তুগে কষ্ট লাগে!

ঃ উগে দাঁতে দড়ি উঠলি আমাগে লাভ কি?

ঃ আমরা মাঝে মাঝে প্যাটে ভাতে জন বেচি ক্যান?

ঃ যেদিন আর কোন উপায় থাহে না, সেদিন আর কি এরা যারে খাওয়া ডা তো পাওয়া যায়।

ঃ তার মানে দায় ঠেহে তো? —ঐ রহম উগেও যদি ঝামেলা

দীননাথ বললো, যাও কাহা, ভাত নিয়ে আসার সুমায় হয়ে আসলো দুই-চার আতর মারো তাড়াতাড়ি, খাবার দামতো উঠোতি হবে।

*   *   *

সন্ধ্যের পর শান্তিরামের বারান্দায় আসর যথারীতি জমে উঠল। হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে অনেকেই হাজির হলো। প্রায় প্রত্যেকের গাঁটে অতিরিক্ত দু'চার ছিলিম তামাক।

মাত্র কিছুদিন আগেও এ আসরের বিষয়বস্তু ছিল আজকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। হাসি-তামাশা, পরচর্চা-পরনিন্দার মধ্যদিয়ে যে আসরের জন্ম হয়েছিল, সে আসরটি আজ নিজেদের অবস্থান নির্ণয়ের গবেষণাগারে রূপান্তরিত হতে চলেছে। এখানে বসে প্রত্যেকে তারা নিজ নিজ মত ব্যক্ত করে—কিভাবে তারা বাঁচবে, দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে, সন্তান-সন্ততিদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে।

শান্তিরাম তার যোগ্যতাবলে বরাবর এই আসরের মধ্যমণি। তাই প্রত্যেকের বক্তব্যের পর তাকে মতামত দিতে হয়। আসরকে জমজমাট রাখতে তার জুড়ি এ পাড়াতে আর কেউ নেই। শত দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যেও রোদে পোড়া আর অনাহারক্লিষ্ট শুক্‌নো মুখখানাতে হাসি লেগেই আছে।

শান্তিরাম সবাইকে একটা নতুন সংবাদ দেবার জন্যে মুখটা গম্ভীর করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বললো, কালকে বোহেলে ডুমোরতলার উত্তর-বাড়ের বড় বটতলায় কম্যুনিষ্টপার্টির মিটিং হবে। সগলে মিলে যাতি হবেনে, কি কয় সব শুনতি হবেনে। আমি শুনিচি উরা আমাগে জন্যি মিটিং করে বেড়ায়, সরকারের সাথে যুদ্ধ বাঁধায়, জেল খাটে, অনেক কষ্ট করে আমাগে উন্নতি করতি চায়। উরা নাহি সব দেবতার মত লোক। তাই সগলে বেলা থাক্‌তি বিলিরতে উঠ্‌বি। একসাথে সব যাতি হবে, মনে থাহে যেন। আহানে সব সুয়ালে সুয়ালে বাড়ী যাইয়ে শুয়ে পড়্, বিয়ানরাতি (ভোররাত) বিলি চলে যাবি, তালি আগে আগে বাড়ী ফিরতি পারবেনে।

একে একে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন এসে হাজির হলো তে'মাথার আমতলায়। প্রত্যেকে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে নিজেকে পরিপাটী করে সাজাতে।

কারুর গায়ে একটি ভাল জামা, হয়তো পাশের বাড়ীর স্কুল-কলেজ প
কোন ছাত্রের কাছ থেকে ধার করা, কারুর গায়ে গোটা দশকের সাক্ষী শ
ছিন্ন শার্ট, সদ্যবিবাহিত কারুর কারুর গায়ে লুঙ্গির ওপর শুভ্র পাঞ্জাবী শো
পাচ্ছে। তবে, অধিকাংশেরই পরণে কাচা ও গায়ে গেঞ্জি, খালি গায়ে
কেউ কেউ। তবে, প্রত্যেকের পোষাকই যে সাধ্যমত পরিষ্কার করার চে
করা হয়েছে, দেখলেই বোঝা যায়। বাড়ীতে বোন, স্ত্রী বা বৃদ্ধা মা হয়
জান অথবা কলাপাতা পোড়ানো ক্ষার দিয়ে কেচে দিয়েছে।

ওরা দলবেঁধে তিন মাইল দূরের বটতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল
একটু গিয়েই ওরা বুঝতে পারলো, তারা ছাড়াও অনেক লোক মিটিং
যাচ্ছে। প্রায় সবাই ওদের মত কৃষক অথবা ছাত্রেরা। যত এগিয়ে গে
ততই ওরা বুঝতে পারলো বিরাট আয়োজন, প্রচুর লোকসমাগম। আন
ওদের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। জোর কদমে এগিয়ে গিয়ে যখন পৌঁছা
বটতলা তখন লোকে লোকারণ্য। চারদিক থেকে স্রোতের মত লোক আস
উদ্দেশ্য বটতলা।

সময়টা ১৯৬৮ সাল। পাকিস্তান তখন জেনারেল আয়ুব খানের জং
শাসনে অতিষ্ঠ। পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণ অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতি
স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে। শুরু হয়েছে আন্দোলন
অন্যদিকে, আয়ুবশাহীর গণবিরোধী চরিত্র দিন দিন বেশী করে প
স্ফুট হয়ে উঠছে। শুরু হয়েছে নিরীহ জনসাধারণের উপর অকথ্য নির্যাত
দমন-পীড়ন।

এক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন এ সুযোগকে কাজে লাগাতে উ
পড়ে লাগলো। জনসাধারণের মুক্তির প্রবল আকাংখাকে সাম্রাজ্যবাদ
তার দেশীয় দালালেরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যে চক্রান্তে
জাল বুনে চললো, জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠলো
১৯৬৫ সালে ভারতের পাকিস্তান যুদ্ধের মধ্যদিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যব
চেয়েছিল পাকিস্তানকে একটা আচ্ছামত মার দিয়ে তাকে নতি স্বীকা
বাধ্য করতে। যারফলে, মার্কিনের পরিকল্পিত বিপ্লবী চীনবিরোধী চক্রা
তারা বাধ্য হয়ে যোগদান করে। কিন্তু, যুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবা

বিশ্বাসঘাতকতার সময়ে চীন অত্যন্ত সঠিকভাবে পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়ায়। ফলতঃ, মার্কিনের সোনালী স্বপ্ন মাঠে মারা যায়।

১৯৬৫ সালের ব্যর্থতায় সাম্রাজ্যবাদীরা থেমে যায়নি। তারা কৌশল পাল্টে এবার চালিয়ে যেতে থাকে ভিতর থেকে এই দেশকে দুর্বল করার জঘন্য ষড়যন্ত্র। দালালও একজন জুটে গেল। তিনি আর কেউ নন, ইতিহাসে কুখ্যাত হিটলারের উন্নত সংস্করণ, শেখ মুজিবর রহমান। বিতর্কিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যাঁকে দান করলো রাজনৈতিক নবজীবন।

সাম্রাজ্যবাদের পাটদালাল উগ্র জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে জনসাধারণের দৃষ্টি হতে আসল শত্রুকে আড়াল করতে পশ্চিম পাকিস্তানকে মূল শত্রু বলে প্রচার শুরু করলো। বর্বর পাক-সেনাবাহিনীর অত্যাচার আওয়ামী লীগকে ধাক্কা মেরে মেরে এগিয়ে দিল নিজেদের সর্বনাশের পথে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্টপার্টিও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সর্ব্ব-শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বটতলার বিশাল জনসমাবেশে বিভিন্ন কমিউনিষ্ট নেতা বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের দ্বারা শোষিত হয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। শ্রেণীচেতনা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার জন্যে বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা করলেন। পশ্চিম পাকিস্তান নয়, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-ই যে জনগণের প্রধান শত্রু এটা তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করলেন এবং ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে তাঁরা বিস্তৃত আলোচনা করলেন। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বললেন, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের সম্মিলিত বাহিনীই এ লড়াইয়ে সাফল্য আনতে পারে। তাই, এই মৈত্রী গড়ে তুলতে ভুল করলে চলবে না। আওয়ামী লীগকে তাঁরা ভয়ংকরভাবে আক্রমণ করলেন। আওয়ামী লীগ কি ধরণের সংগঠন এবং এরা কাদের প্রতিনিধিত্ব করে, এর উদ্দেশ্যই বা কি? —ব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে তাঁরা আওয়ামী লীগ সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। আয়ুবের মতই আওয়ামী লীগও যে জনগণের শত্রু এটা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন।

মিটিং শেষ হবার পর দীননাথ আর কারুর সংগে কোন কথা না বলে সোজা বাড়ী চলে এসেছে। এমনকি ডাক্তার বাড়ীতেও সে খবরটা জানিয়ে এলোনা। মিটিং এর বেশীর ভাগ কথাই সে বুঝতে পারেনি; কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে যে, এতদিনের তার যে পরিকল্পনা তা সত্যি সত্যি মিথ্যে। তার কঠোর পরিশ্রম ও নম্রতার প্রতিকারের মূল্য এ সমাজে কেউ দেবেনা। চলার পথে এ যেন এক প্রচণ্ড হোঁচট। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল।

দীননাথ হতাশ মনে বারান্দায় একটা বেদে পাটী পেতে বসে পড়লো। স্ত্রী তাকে এভাবে দেখে অবাক হয়ে গেল। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, তোমার জ্বর-টর হইনি তো?

দীননাথ প্রশ্ন এড়িয়ে বললো, ছিলুম সাজে আন্।

ঃ ছিলুমতো ডাক্তার বাড়ী।

দীননাথ নিজের ভুলটা বুঝতে পারলো, গাঁট থেকে একটা বিড়ি বের করে বললো, ধরায় নিয়ে আয়।

দীননাথের স্ত্রী কয়েকবার বিভিন্ন প্রশ্ন করে কোন উত্তর না পেয়ে বিরক্তবোধ করলো। বললো, বিড়ি যে শুদো টানেই চললে, কোন কতা টতা কবা, না-কি?

দীননাথ, কি কবো আর!

ঃ রাত্তি না খায়ে তো আর থাহা যাবেনা। বাড়ী খাবা, না ডাক্তার বাড়ী?

ঃ ক্যান তুগে জন্যি কিছু রান্ধিস্ নি?

ঃ আমাগেতো সগলের খাবা হয়ে গেছে। যা দু'ডো আছে, তাতে জল ঢালে দিছি।

ঃ ঐত্তি আমার হয়ে যাবেনে। আর রান্ধার দরকার হবেনা। আজ আমার গায় সিরাম যুত নেই।

এমন সময় শান্তিরাম সদলবলে এসে হাজির হলো। দীননাথকে মিটিং শেষে না পেয়ে ডাক্তার বাড়ী হয়ে ওরা এখানে এসেছে।

দীননাথ তাড়াতাড়ি আর একটা পাটী বিছিয়ে দিয়ে সবাইকে বসতে বললো।

দাদার বারান্দা থেকে হুঁকোটা নিয়ে সেজে আনলো।

শান্তিরাম কোন ভূমিকা ছাড়াই আরম্ভ করলো, কি দীনো, দেখলিতো আমার কথা এহেবারে মিথ্যে না, শুদো গতরে খটে ভাত জোটপে না। যিরাম খাটতি হবে, সেইরাম উপযুক্ত দাম পাবার জন্যি সমিতি করতি হবে, দাম আদায় করে নিতি হবে। রাজনীতি করে ক্ষমতা কাড়ে নিতি হবে, নিজিগে সুবিধে মত আইন বানাতি হবে, ওসব বড়লোকেরা উগে যৃতমত আইন বানায়, তাতে আমাগে মরণ হয়।

দীননাথঃ কিন্তু কাহা, কম্যুনিষ্ট পার্টি, সমিতি, ঐসব করতি গেলি যদি পুলিশি ধরে নিয়ে যায়, তালি বাড়ীর কয়ডা এহেবারে না খাইয়ে মরে যাবেনে। তহন ইগে দ্যাখপেনে খিডা?

ঃ তোর যদি জ্বর-জারি হয়ে পড়ে, তহন উগে দ্যাখপেনে খিডা? আর তোর ওষোধ-পত্যিবা জোটপেনে কন্‌তে? অতসব ভাবলি কি আর কাজ করা যায়? তাছাড়া তোর মত, আমার মত লোক নিয়ে যদি জেল ভরে ফ্যালে, তালিতো আমার পিলান কাজে লাগে যাবেনে। নাঙল চষার লোক আর কেউ থাকপে না, ডাক্তারগেও তালি দাঁতে দড়ি। ওসব বাজে চিন্তা, শুনলিতো আজ, এই সুবিধের নিশ্চয়তার জন্যিই তো লড়াই করতি হবে। তোরে ধরলি বৌমাও সমিতি করতি লাগে যাবেনে। তালিতো আর বাড়ীর ভাবনা থাকপে না, বাড়া ভাত কয়দিন খাওয়া যাবেনে।

ঃ না কাহা, আমার কাজডা ভাল লাগতেছে না। তুমরা বরং করতি লাগো, আমি এট্টু ভাবে চিন্তে নি, তারপর দেহা যাবেনে। আমার মত একজন তুমাগে সমিতিতি না থাকলি কি আর সিরাম ক্ষেতি হবে।

শান্তিরাম ও তার দলবলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুরুতে এভাবে ধাক্কা খেতে হবে ভাবতে পারে নি। অনেকটা নিরাশ হয়ে ওরা উঠে পড়লো।

ওদের সাথে দীননাথ রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ফিরে এসে স্ত্রীকে বললো, যা হয় কিছু খাতি দে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি।

স্ত্রী বললো, এট্টোনি দেরী করো, প্রায় হয়ে গেচে।

ঃ কি, আবার হয়ে গেচে; কলামতো যা আছে তাই খাবানি!

ঃ তুমরা যত সহজে কতি পারো, আমরা ত্যাতো সহজে তা করতি

পারিনে। সারাদিন খাটাখাটানির পর তুমরা না খায়ে শুয়ে থাকপা, তালি আমাগে আর করার মত কাজ কি থাকলো?

বিছানায় শুয়ে ওর স্ত্রী বললো, আজ স্কুলিরতে ছাওয়ালডারে তাড়ায় দেছে। মাইনে না দিলি আর কিলাস করতি দেবেনা কয়ে দেছে। কিলাস ছিক্‌ছেয় এহন পাঁচ টাহা বেতন।

ঃ ক্যান্ ও ফিরি হতি পারবে না?

ঃ তা আমি জানিনে, ও কলো ওসব মিটিং স্কুলি হয়ে গেছে। ওর ফিরি হইনি আর মাইনেও কুমিনি।

ঃ ক্যান্, গরীব মানুষ হলিতো ফিরি পড়তি পারবে শুনিচি, তা ওর হবে না ক্যান্?

ঃ আমি, অতসব জানিনে তুমি কালকে মাতব্বরগে কাচতে শুনে দেহনে।

ঃ তুই বরং একবার মাঝে কাহার কাচে যাইয়ে কয়ে আসিস্‌কেনে, আমার হয়তো সুমায় হবে না, নাহয় মনে থাকপে না।

★

১৯৬৭ সালে শ্যামল মশিয়াহাটী স্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্র সংগঠন, ছাত্র ইউনিয়ন তখন দেশের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে ক্ষমতার শীর্ষে। যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজ ও দৌলত-পুরের সরকারী ব্রজলাল কলেজ তার ব্যতিক্রম নয়। মফঃস্বলের স্কুল কলেজগুলিকে দেশের সমস্ত রকম ছাত্র আন্দোলনের সাথে একাত্ম করতে নেতৃবৃন্দ এক ব্যাপক পরিকল্পনা নেন। এই কর্মসূচীর অংশ হিসাবে মশিয়াহাটী স্কুলে এই দুই প্রাতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আনাগোনা শুরু করেন।

মশিয়াহাটী সমস্ত দেশের রাজনীতিতে অধঃপতিত এলাকাগুলির অন্যতম। ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়ীবৃত্তি করে যেনতেন প্রকারে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা এতদঞ্চলের মোড়লেরা এ যাবত করে এসেছে।

তাই, মশিয়াহাটী স্কুলে সংগঠন করতে এসে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ...কে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের ধারণা স্কুলে সরকার ...রোধী কোন সংগঠন তৈরী হলে স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারী সাহায্য ...দায়ে ব্যর্থ হবে, উপর মহলে নিজেদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে; তাই ...রা শিক্ষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চললো কেউ যেন ওসব পথে পা দেয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে। অভিভাবকরাও যেন চাপ সৃষ্টি করে তারজন্যে ...বস্থা নেওয়া হলো। ফলে, এমতাবস্থায় এখানকার ছাত্রেরা দেশের ছাত্র ...মাজের সাথে আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহসী হলো না।

একদিন শিক্ষক বিনয়বাবু শ্যামলসমেত দশ-পনের জন বেপরোয়া, বিশ্বাস-...যোগ্য ছাত্রকে ছুটির পর তাঁর সাথে দেখা করতে নির্দেশ দিলেন। বললেন, ...তোমাদের উচিত দেশের সমস্ত ছাত্র-সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে এগিয়ে ...ওয়া। তোমাদের বন্ধুরা, সহপাঠীরা যখন আয়ুব খাঁর বুলেটকে পরোয়া ... করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, তখন তোমরা এখানকার কতকগুলি ...নোপুঁটি মোড়লের ভয়ে শিয়ালের গর্তে ঢুকে বসে থাকবে! আমি তোমাদের ...ত তরুণের কাছ থেকে এটা আশা করিনে। আমি জানি দেশের, জাতির ...খা সমগ্র মানবের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের শরিক হলে তোমাদের ...কান ক্ষতি করে এ মোড়লেরা রেহাই পাবে না। তাই, তোমাদের উচিৎ ...কটা কমিটি তৈরী করে ফেলা এবং নেতাদের কাছ থেকে যেমত নির্দেশ ...বে, সেমত কাজ চালিয়ে যাওয়া।

শ্যামল: স্যার, কোন ধর্মঘট হলেতো আমরা মাত্র কয়েকজন তাতে ...যোগদান করবো। অন্যেরাতো ভয়েই পিছিয়ে যাবে। তাহলে তাতে ...ভটা কি?

: তোমাদের সবাইকে বোঝাতে হবে। ধর্মঘট করেও তোমাদের যখন ...কান ক্ষতি হবে না তখন অন্যেরা সাহস পাবে। প্রথমে দশজন, পরে ...পঞ্চাশজন, আস্তে আস্তে গোটা ছাত্ররাই তোমাদের সাথে ক্লাস বর্জন করবে। ...প্রত্যেকটা জিনিষ এভাবে একটু একটু করে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গড়ে ...তোলা সম্ভব।

বিনয়বাবু নিজে সংগে থেকেই কমিটি তৈরী করে দিলেন। শ্যামলকে

সাধারণ সম্পাদক করতে সবাই আগ্রহ প্রকাশ করলো। শ্যামলই হলো মশিয়াহাটী স্কুলের ছাত্র সংগঠনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক। শুরু হলো শ্যামলের আপোষহীন সংগ্রামী জীবন।

শ্যামলদের দিয়ে বিনয়বাবু যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন অল্পদিনে তার সুফল ফলতে শুরু করলো। শ্যামলরা আদর্শের জন্যে লড়াই করা আজ ভয় পায় না, পরোয়া করে না অভিভাবক ও শিক্ষকদের অন্যায় উপদেশ ও চোখ রাঙানীকে। বিনয়বাবু চেয়েছিলেন এমন কিছু ছাত্রে তিনি গড়ে তুলবেন, যারা মশিয়াহাটীর কালিমাখা অতীতকে ভুলে যে সাহায্য করবে। নতুন করে গড়ে তুলবে মশিয়াহাটীর ঐতিহ্যকে। মশিয়াহাটী স্কুলে প্রাথমিকভাবে সাফল্যলাভের পর শ্যামলের ওপর দায়িত্ব দিলেন পার্শ্ব বর্তী স্কুলগুলিতে সংগঠন গড়ে তোলার।

সেদিনটির কথা শ্যামল আজও ভুলতে পারেনি। ন'মাইল দূরে সুফল কাঠি হাই স্কুলে ওদের তিনজনকে বিনয়বাবু পাঠিয়েছেন একটা মিটিং করা জন্যে এবং সম্ভব হলে একটা কমিটি তৈরী করে আসতে। পরিচয় দি প্রধান শিক্ষকমশায়ের অনুমতি নিয়ে একটা নোটীশ দেওয়া হবে এবং টিফি টাইমে অথবা ছুটির পরে ছাত্রদের নিয়ে মিটিং হবে।

সুফলাকাঠির উদ্দেশ্যে রওনা দেবার পর হতেই কোন এক অজান অদৃশ্যশক্তি যেন শ্যামলকে চেপে ধরতে থাকে। প্রথম সমস্যা হেডস্যারে নিকট হতে অনুমতি নেওয়া। সেকি পারবে হেডস্যারের মুখোমুখি হ একথা বলতে! যদিও তা হয়, সভায় বক্তৃতা; কি বলবে সে! বিনয়বাবু শেখানো বুলি সাইকেলের ওপর বসেই মনে করতে পারছে না সে, মিটি এ দাঁড়িয়ে কি তা মনে করা সম্ভব? —এক সময় ভাবলো ফিরে যাওয়া ভাল, যাহোক একটা মিথ্যা বলবে বিনয়বাবুকে, বলবে স্কুল কোন কার বন্ধ ছিল।

এভাবে ভয় ও ভাবনা নিয়ে ওরা তিনজন একসময় স্কুলের পাশে এ থামলো। মশিয়াহাটীর মত বড় স্কুল, ঢুকতেই ওদের ভয় লাগছে ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজে।

একে অপরকে ঠেলাঠেলি করে, কে আগে যাবে। কিন্তু শেষ পর্য

াহসে আর কুলালো না। ওরা স্কুলের পিছন দিকের রাস্তায় গিয়ে াড়ালো। এবার যাই, যা হয় হবে, বিভিন্নভাবে মনকে প্রবোধ দিয়ে াক্ত করতে চেষ্টা করে। ওদিকে দু'টো প্রায় বাজে। আর অপেক্ষা রা যায় না। একটু বাদেই একটা করে ক্লাসের ছুটি হতে শুরু করবে। রিয়া হয়ে তিনজনে স্কুলে ঢুকলো। একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করে জেনে িল হেড-স্যার কোথায় বসেন।

ভয়ে ভয়ে হেডস্যারের ঘরে ঢুকে পড়লো তিনজনে। হেডস্যার ওদের সতে বললেন। তারপর নিজেই জানতে চাইলেন কোত্থেকে কিজন্যে ওরা সেছে। হেডস্যার শুনে খুবই খুশী হলেন। জেনে নিলেন কখন তারা াড়ী থেকে বেরিয়েছে এবং খেয়েছে। তারপর দপ্তরীকে দিয়ে কিছু াবার এনে ওদের খেতে দিলেন এবং নিজেই শুরু করলেন তাঁর আক্ষেপের থা—তাঁর স্কুলের ছেলেরা দেশের সমস্ত ঘটনা থেকে কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ড়ে আছে। ঠিক সেই কথাগুলি, যা বিনয়বাবু ওদের বলে দিয়েছেন।

এতক্ষণে পেটে কিছু পড়ে শ্যামলের গলাটা ভিজলো, আর হেড-্যারের কথা শুনে আস্তে আস্তে ওর স্মৃতিশক্তি ফিরে এলো। উনিই ্যোগ নিয়ে সবাইকে ডেকে এক জায়গায় করলেন এবং তাঁর ছাত্রদের াগে পরিচয় করে দিলেন।

শ্যামল ধীরে ধীরে, গুছিয়ে, প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় কথা বন্ধুদের ঝিয়ে বললো এবং মশিয়াহাটী স্কুলে সংগঠন গড়তে নিজের অভিজ্ঞতার কটা বিবরণ দিলো। সংগঠন তৈরী করে তাদের সাথে যোগাযোগ করার াবেদন জানিয়ে শ্যামল শেষ করলো।

তারপর একের পর এক পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্কুলে সংগঠন গড়ে তুলতে া সাহায্য করেছে। কোথাও শিক্ষকদের কাছ থেকে পেয়েছে সহযোগিতা াথাও বিরোধিতা, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয়েছে সর্বত্র। আজ আর তার য় করে না হেডস্যারের মুখোমুখী হতে, স্মরণশক্তি লোপ পায় না ক্তৃতা দিতে। মশিয়াহাটী স্কুলের সংগঠন আর শুধুমাত্র ঐ স্কুলের সংগঠন য়, তা যেন এ এলাকার সংগঠনগুলির ভারকেন্দ্র। শ্যামল আজ আর ধু মশিয়াহাটী স্কুলের ছাত্রনেতা নয়, সে এতদঞ্চলের প্রত্যেকটি স্কুলের

ছাত্রদের স্বীকৃত নেতা।

এখন পাশাপাশি ছ'তিনটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে একটা স্কুলে জমা হয় এবং মিলিত মিছিল বিভিন্ন শ্লোগানে গ্রাম-প্রান্তর কাঁপিয়ে গেঁয়ো রাস্তা পরিভ্রমণ করে। সাড়া জাগিয়ে তোলে গ্রামের কৃষকদের মনে, তারা অনুপ্রাণিত হয় নতুন চিন্তায়।

বিনয়বাবু অনেকদিন থেকেই বুঝতে পারছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে আছেন এবং তিনি এটাও জানতেন অনতিবিলম্বে তাঁর উপর একটা আঘাতও তারা করবে। সেজন্যে, মনে মনে তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। একবার ভেবেছিলেন শ্যামলকে কথাটা জানিয়ে রাখবেন; কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত বিপদে ওদের সাহায্য চাইতে বিবেক সাড়া দিলো না।

বিনয়বাবু Biology ও Chemistry পড়ান। শিক্ষক হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ সফল। তাই, চাকরী নিয়ে তিনি ভয় পান না। কিন্তু মশিয়াহাটীর সাথে তাঁর প্রাণের এক গভীর যোগসূত্র সৃষ্ট হয়েছে। তাঁর প্রিয় ছাত্রদের রেখে অন্যত্র যাবার কল্পনায় মনটা ব্যথায় চন্ চন্ করে ওঠে। মনটা তাঁর মোটেই দুর্বল নয়, প্রয়োজনে তাঁকে অবশ্যই যেতে হবে অন্যত্র: নিশ্চয়ই তিনি আত্মসম্মান ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে মশিয়াহাটীর শিক্ষকতাকে রক্ষা করবেন না। তবে, অন্যায়কে মাথা পেতে নেবার মানসিকতাও তিনি পোষণ করেন না।

অবশেষে আশংকাকে সত্যে পরিণত করে চাকরীতে ইস্তফা দেবার নোটীশ পেলেন তিনি। কমিটি তাঁকে এজন্যে এক মাসের সময় দিয়েছে।

এ ধরণের ঘটনা স্কুলে মোটেই নতুন নয় বরং তা বহু পুরোনো। কিন্তু পুরোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে কমিটি নতুন বাধার সম্মুখীন হলো। বিনয়বাবু সাফ জানিয়ে দিলেন স্থায়ী চাকরীতে ইস্তফা তিনি দেবেন না।

ঘটনাটি বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। ছাত্র, অভিভাবক সবাই জানলো; কিন্তু কেউই বুঝতে পারলো না বিনয়বাবুকে কমিটি কেন তাড়াতে চায়। সবার একই কথা, বিনয়বাবুকে স্কুল থেকে তাড়ানো চলবে না।

শ্যামল ও তার কিছু বন্ধু বুঝতে পারলো কেন এমনটি ঘটলো। তাদের যে বিনয়বাবুই যুক্তি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সাহস দিয়ে প্রত্যেকটি সৎ আন্দোলনে এগিয়ে দেন, এটা কমিটি বুঝে গেছে। তাই স্কুলকে আবার মগের মুলুকে রূপান্তরিত করতে হলে সবার আগে বিনয়বাবুকে তাড়াবার প্রয়োজন ওদের, কিন্তু ওরা জানেনা যে, বিনয়বাবু এখানে শক্ত মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে আছেন, তাঁকে এভাবে হটানোর প্রচেষ্টা মূর্খামী ছাড়া কিছু নয়।

পরের দিন স্কুল শুরু হবার মুহূর্তে সমস্ত ছাত্রেরা হেডস্যারের চেম্বারের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। তারা বিনয়বাবুর প্রশংসা করে এবং হেডস্যার আর ম্যানেজিং কমিটিকে নিন্দা করে শ্লোগান দিতে থাকে। উপস্থিত শিক্ষকেরা ছাত্রদের শিক্ষকপ্রীতিতে স্তব্ধ, হেডস্যার নির্বাক।

এমন সময় স্কুলের মাঠে বিনয়বাবুকে দেখতে পেয়ে ছাত্রেরা সেদিকে ছুটে গেল, বিনয়বাবুকে জড়িয়ে ধরে তারা শহীদ বেদীর পাশে গেল আর একে একে বক্তৃতা করলো। সবার কণ্ঠে একই প্রতিজ্ঞা ঝংকৃত হয়ে উঠলো, যে কোন মূল্যে তারা তাদের শ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষা করবে।

আনন্দে বিনয়বাবুর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তাঁর এ আনন্দ বিপদে আশ্রয় পেয়ে নয়; তিনি আজ বুঝতে পারলেন, তাঁর এতদিনের পরিশ্রম নিরর্থক হয়নি।

স্কুলের প্রত্যেকটি ছাত্র ম্যানেজিং কমিটিকে নিন্দা করে লিখিত পত্রে স্বাক্ষর করলো। তাতে বলা হলো, অনতিবিলম্বে নোটীশ প্রত্যাহার করতে; এই বলে সাবধান করে দেওয়া হলো, নোটীশ প্রত্যাহার না করলে অথবা প্রত্যাহারের বিলম্বের কারণে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তার পুরো দায়-দায়িত্ব কমিটিকে নিতে হবে।

দু'দিন অপেক্ষা করার পর কোন উত্তর না পেয়ে ছাত্রেরা হেডস্যারকে অপর এক চিঠিতে জানিয়ে দিল, চলতি সপ্তাহের মধ্যে নোটীশ প্রত্যাহার না করলে আগামী সপ্তাহের শুরু থেকে তারা ক্লাস বর্জন করবে।

এর মাঝে নেতৃস্থানীয় ছাত্রেরা, অন্যান্য শিক্ষকদের সংগে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলো। ছাত্রেরা শিক্ষকদের বোঝাবার চেষ্টা করলো যে, তাদের

এ লড়াই প্রতিটি শিক্ষকের চাকরির স্থায়িত্ব সৃষ্টির লড়াই, যাতে কমিটি তাদের খুশীমত কাউকে বরখাস্ত করতে না পারে। ফলে, শিক্ষকদের এ ব্যাপারে সহকর্মীকে সহযোগিতা করা নিজের স্বার্থের সংগে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ক্লাস বর্জন শুরু হলো। দ্বিতীয় দিনেই অভিভাবকেরা স্কুলে এসে হানা দিল। কেন ছাত্রেরা ক্লাস করতে চাইছে না, বিনয়বাবুর মত শিক্ষককে কেন বরখাস্ত করা হবে?—তারা জানতে চাইলো। অপর দিকে কয়েকজন সুযোগ্য শিক্ষক Resignation দেওয়ার হুমকি দিলেন।

অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে অবশেষে ম্যানেজিং কমিটি রণে ভংগ দিলো। অভিভাবকদের সম্পূর্ণ উল্টো মানসিকতায় তারা অবাক হলো, নোটীশ প্রত্যাহার করলো। জয় হলো বিনয়বাবুর আদর্শের, জয় হলো মশিয়াহাটীর নতুন প্রজন্মের।

★

কুলটিয়া গ্রামের প্রায় সমস্ত গরীব কৃষক শান্তিরামের বাড়ীতে মিটিং-এ যোগদান করলো। বারান্দা উপচে খোলা উঠোনে যার যার মত নারকেল পাতা, নাড়া, যাহোক কিছু একটা পাছার নীচে দিয়ে বসে পড়লো। যথারীতি শান্তিরাম এ মিটিং-এর মধ্যমণি। মিটিং-এ নিজের নিজের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ কেঁদেই আকুল। ফাল্গুন মাসে ছেলে মেয়েকে খাবার দিতে পারছে না, তাই আশংকা আষাঢ় মাসে তাদের বাঁচাবে কি করে!

তারপর আস্তে আস্তে সবাই মিটিং-এর উদ্দেশ্যের কাছাকাছি এগিয়ে এলো। শান্তিরাম সবাইকে লক্ষ্য করে সভার উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং করণীয় সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখলো তা এইরূপঃ- আমরা গ্রামের গরীব কৃষকেরা সাধারণতঃ যে কয়টি পথে বিশেষভাবে শোষিত হই তা সবার জানা আছে। প্রথমতঃ আমরা পেটের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন মহাজনদের কাছে হাত পাতি তখন তারা চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। তোমাদের প্রত্যেকের জানা আছে প্রতি একশ' টাকাতে এক মণ অথবা তারও বেশী আমাদের সুদ হিসাবে মেপে মহাজনের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হয়। আমরা সাধারণতঃ আষাঢ় অথবা কার্ত্তিক মাসে টাকা ধার নিয়ে

থাকি এবং পরিশোধ অথবা সুদ দিয়ে থাকি শ্রাবণ-ভাদ্র অথবা পৌষ মাসে। তার অর্থ দাঁড়ায় প্রতি একমাসে আমাদের প্রতি একশ' টাকাতে একশ' টাকা সুদ দিতে হয়, তার ফলে সুদ সমেত আসল পরিশোধ করতেই আমাদের ফসল শেষ হয়ে যায়। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটানো শুরু হয়।

জমি বন্ধক হলো আমাদের মরণের আরেকটি মারাত্মক ফাঁদ। দুই থেকে তিনশ' টাকায় আমরা এক বিঘা করে জমি বন্ধক দিতে বাধ্য হই। প্রত্যেকেই আশাকরি পরবর্তী বছরেই ছাড়িয়ে নেব। কিন্তু বাস্তবে তা আর কখনও হয় না। বছরের পর বছর মালিকের কাছে পড়ে থাকে চাষের জমি। প্রতি বছরে এক বিঘা জমি থেকে মালিক কম করেও ষোল-সতের মণ ধান পায়, যার মূল্য পনেরশ'-ষোলশ' টাকার কম নয়। কিন্তু অনন্ত-কাল ধরে মালিক জমি চাষ করলেও আসল টাকাগুলি পরিশোধ হয় না। উপরন্তু একদিন মালিক দাবী করে বসে, জমিটা নাকি তার হয়ে গেছে। আমরা তাদের সাথে শক্তিতে পারিনে, কারণ আমবা সংঘবদ্ধ নই, পারি-নে মোকদ্দমা করতে কারণ পর্যাপ্ত টাকা না থাকলে মামলা কিছুকাল করা গেলেও কখনও জেতা যায় না।

মজুরীর ন্যায্য দাম আমরা কখনও পাইনে। ভোর থেকে অনেক রাত্রি অবধি কঠিন পরিশ্রম করে বিনিময়ে পাই মাত্র এক অথবা দেড় টাকা, যা আমাদের পরিশ্রম ও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য.

আমরা আমাদের উৎপন্ন শস্য নামমাত্র দামে বিক্রি করতে বাধ্য হই। দু'দিন বাদেই ঐ সমস্ত জিনিষ আবার আমরা চড়া দামে কিনে পেটের খিদে মেটাই। ভোটের সময় বড় সাহেবরা আমাদের ভোট দিতে বলেন, আমরা দিয়েও থাকি, কিন্তু আমাদের এ সব সমস্যা আর কেউ কখনও দেখেন না, কোন আইন কানুন তৈরী করেন না আমাদের বাঁচাতে।

ভাগচাষী যারা আছে কি কঠিন পরিশ্রম তারা করে থাকে জমিতে। আবর্জনায় ভর্তি জমিটাকে আগাছা সাফ করে দু'টো ফসল পেতে না পেতেই আর দেবে না। ওটা নিজে চাষ করবে জন কিনে আর অন্য কোন আগাছা ভর্তি জমি হয়তো অন্যকে ভাগে দেবে। তাতে চাষী যেমন দখল হারায় অন্যদিকে পরিষ্কার জমিতে কম খরচে মালিক বেশী উৎপন্ন করে।

তারপরেও নিজের খরচে চাষ করে মাত্র তিনভাগের একভাগ ফসল পাবে চাষী।

এই সমস্ত বহুবিধ ছাড়াও সামাজিক দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে আমরা অবিচার পেয়ে থাকি। আমরা ন্যায় করে শাস্তিভোগ করি, আর পয়সা যার আছে অন্যায় করে বুক উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়।

তাই, আজ আমাদের শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার তাগিদে এসব অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হবে, মুক্ত করতে হবে নিজেদের, তাছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু কিভাবে আমরা এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করবো? —সেটাই কঠিন প্রশ্ন। তবে নিঃসন্দেহে সংঘবদ্ধভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে, ত্যাগ স্বীকারে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, তিলে-তিলে মৃত্যুকে মেনে নেওয়া অপেক্ষা লড়াই করে শহীদের মৃত্যু অনেক শ্রেয়ঃ।

আশু প্রয়োজন আমাদের মধ্য থেকে সৎ, বুদ্ধিমান ও সাহসী লোক-দের নিয়ে একটা কমিটি তৈরী করা, যারা সমিতিকে পরিচালনা করবে। তারপর সবার মতামত নিয়ে তারা ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে সুনিশ্চিত নীতি ও কৌশল নির্দ্ধারণ করবে। তাদের ওপর সবার আস্থা রাখতে হবে।

শান্তিরামের দীর্ঘ অসংলগ্ন বক্তৃতা উপস্থিত কৃষকদের বুঝতে মোটেই অসুবিধা হলো না। গেঁয়ো, বাচাল কৃষক শান্তিরামের বক্তব্য শুনে সবাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা যেন একটা আশার সবুজ সংকেত দেখতে পেলো; ওদের মনে বিশ্বাসের জন্ম হলো, তাদের দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্ভব হলেও হতে পারে।

উপস্থিত সবাই চেপে ধরলো শান্তিরামকে সমিতির সভাপতি হতে হবে। সেই-ই একমাত্র যোগ্য নেতা তাদের। কিন্তু শান্তিরাম নিজে আপত্তি জানালো। বললো, আমারে সভাপতি বানাস্‌নে, আমি সভাপতি হলি সমিতির কাজ ঠিকমত চলবে না।

সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করলো, ক্যান্ কি হবেনে?

শান্তিরাম ঃ আমারে এ অঞ্চলের মান্‌সি সব চাইতে ক্যাল্লাস লোক বুলে জানে। আমি সগলের কাছে যাত্রাদলের ভাঁড় বুলে পরিচিত। সেইজনি আমি সমিতির সভাপতি হলি সমিতির ওজন খানিকটে পাত্‌লা হয়ে যাবেনে, সিডা হওয়া মোটেই ঠিক হবে না। তাছাড়া, আরাট্টা সহজ কথা, শক্ত

সবল শরীরেই শক্ত মনের বাস। আমারতো একটা ভাড়া খালি পাইখানা পাবোনে, আমারে দিয়ে নেতার কাজ চলে না।

তারপর নিজেই প্রস্তাব করলো, তোরা বরং দীনোকে সভাপতি কর, ওই হবে আমাগে আসল নেতা।

শান্তিরামের কথাটা সবাই চিন্তা করলো। ও সভাপতি হলে গ্রামের বাবুরাতো আছেই, পাশের গ্রামের কৃষকেরাও তামাশা করতে ছাড়বে না। শান্তিরাম যতই বুদ্ধিমান হোক, এলাকার সবাই তাকে ভাঁড় বলেই জানে।

সবাই মিলে দীননাথকে চেপে ধরলো, তাকেই সমিতির সভাপতি হতে হবে, কোন আপত্তি নয়।

দীননাথ বিনীতভাবে তার অসুবিধা জানায়—ডাক্তার বাড়ী বছর মাইনে খাটি। তুমরাতো জানো যোর থাকতি কাজ আরম্ভ করি আর রাত দশটার আগে শেষ হয় না। আমি সমিতির কাজ করবো কি এরে!

সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, ভূতির ব্যাগার আর খাটপো না বুলেইতো সমিতি করতিচি, তুই জনমভোর বেশী খাটে মরিচির বুলেই তোরে নেতা হতি হবে। তোর সগলের চাইতে উগে পরে ঘেন্নাডা বেশী।

হরেন মনে মনে হিসাব করলো, তারপর বললো, দীনো, তোরতো ডাক্তার বাড়ী বছর পুরতি আর বাহি থাহার কথা না, আমার হিসেবে আর মাত্তর পাঁচ-সাত দিন বড় জোর।

দীননাথ: ডাক্তার বাড়ী আমার বছর শেষ হয়ে গেছে। এহন সারা বছরে যে কয়দিন কামাই হয়ে গেচে, সেই কয়দিন খাটতিচি। ডাক্তার-বাবু অবশ্যি আবার ধরেচে, কুড়ি টাহা বেশী দেবে কচ্চে।

হরেন: তুই আর বছর মাইনে থাকতি যাস্‌নে। তোর তো বছর মাইনে থাহা ভারী লোকসান। তুই কাজ করতি চালি তোর জন বছরে একদিনও কামাই যাবে না। আর জন বেচে বেড়ালি পয়সা যিরাম কিছু বেশী পাবা যায়, খাটনিও বেশ কম হয়। নিজির বাড়ীর টুকটাক্‌ কাজ, মাছ মারা, এ সবেরও এট্টু সুমায় পাওয়া যায়। গ্রামের সগলে জানে বিলি এহন কোন কাজ থাহে না, মানষি তোরে বাঁশের মুড়ো তুলতি জন নে, তুই ক্যান বছর মাইনে থাকতি যাবি! আর বছর মাইনে না থাকলি সমিতির

কাজ করার মেলা সুযোগ পাবেনে।

সমবেত কৃষকদের একান্ত আগ্রহের সামনে দীননাথের আপত্তি টিকলো না। দীননাথ সভাপতি মনোনীত হলো, হরেন হলো সাধারণ সম্পাদক, শান্তিরাম কোন প্রকারে কোষাধ্যক্ষের পদটি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো না। অপর চারজন সদস্য নিয়ে কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো সাত।

শ্যামল সমস্ত আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্তগুলিকে যথাসাধ্য সাজিয়ে লিখলো। তারপর সবাইকে দিয়ে সই করিয়ে হরেনের হাতে দিয়ে দিলো।

দীননাথের স্ত্রীর মনটা আজ খুবই খারাপ। দুপুর বেলায় মেঝো শ্বশুরের কাছে গেল—ছেলের ফ্রি পড়ার কোন ব্যবস্থা তিনি করে দিতে পারেন কি-না? তিনি তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে বললেন, বৌমা, তুমি হয়তো জানো না বেশ কিছু দিন হলো আমি আর মাতব্বরিতে যাই না। স্কুলের যত ঝামেলা সব কিছুরই আসামী হলো শ্যামল, তাতে মান-সম্মান থাকে না। এখন সমর, ভূপেন ওরা মিটিং এ যায়, তুমি ওদের কাউকে গিয়ে বলো, ওরা চেষ্টা করলে অসুবিধা হবে না।

সমরবাবুকে না পেয়ে ও গেল ভূপেনবাবুর বাড়ীতে। বললো, কাহা, বড় কুদার স্কুলি ফিরি হইনি, অত টাহা বেতন দিয়ে ওরে আমরা কি এরে স্কুলি পড়াবো, তুমি ওর ফিরি পড়ার এট্টা ব্যবস্থা করে দিয়েনে।

ভূপেনবাবু বললেন, ও কোন্ ক্লাসে পড়ে এখন?

বৌমা: ওতো এই বারই বড় স্কুলি পড়তি গেল।

: লেখাপড়াতো অনেকদূর হয়ে গেছে, দীনোখুড়ো এখন আস্তে আস্তে বুড়ো হচ্ছে, ছেলেকে ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দাও না?

: না, মাষ্টররাতো কয় ওর মাথা ভাল আচে, পড়ালি ও লেহা-পড়া শিখতি পারবেনে।

: নাম সই করা শিখে গেছে আর তোমাদের দরকার কি? গরীবের ছেলেরা প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত পড়বে বলেই প্রাইমারী স্কুলে বেতন দিতে হয় না, এ সব তোমরা বোঝ না কেন?

: না কাহা, তুমি বলে কয়ে ওরে ফিরি করে দিয়েনে।

: তোমরা আজকাল বড় বেশী বোঝ। ভাল কথা বললে তোমাদের

কানে যায় না, তোমরা যা পারো করো, অমি কিছুই করতে পারবো না। দীনোর ছেলে লেখাপড়া শিখে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে!

দীননাথের স্ত্রী রাস্তাতে গিয়েও শুনতে পাচ্ছে শ্বশুর বলেই চলেছেন —ওরা সব লেখাপড়া শিখে সাহেব হবে, আর আমরা জন কেনার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াবো……।

কথাগুলি দীননাথের স্ত্রীকে প্রচণ্ড আঘাত দিলো। বিপদে যাদের একমাত্র ভরসা বলে এতদিন ভেবে এসেছে তাদের মুখে একি কথা! আজ একেবারে অসহায় মনে হচ্ছে নিজেদের। পথে বারে বারে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সে বাড়ী চলে এলো। বাড়ীতে মুখ গোমটা করে বসে আছে ছেলেটা, আজও ওকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছে।

দীননাথের স্ত্রী নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলো না। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, ছেলেও মায়ের কান্না দেখে কাঁদতে থাকলো। অনেকক্ষণ পর মা বললো, যা কুদা বাড়ী বসে পড়্‌গে। তারপর বারান্দায় শুয়ে ঘোম পড়িসকেনে; রোদি রোদি ঘুরে বেড়াসনে।

ছেলে বললো, মা, এমনিতি আমার সব বই নেই। আর স্কুলি না গেলি পরে কিচ্ছু বুঝতি পারবো না। তাপসের মা-বাবার মত তোমরাতো আর আমারে পড়ায় দিতি পারবানা? একটু থেমে মার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, মা, তোমার দুডো হাঁস বেচে আমার বেতনডা দিয়ে দেও না, আর পয়সায় হলি অংকের বইডা?

মা চিন্তা করলো, প্রতিদিন হাঁসে চার-পাঁচটি করে ডিম দেয়। ছ'আনা-দশ পয়সা দরে জোড়া বিক্রি করে পাঁচ-ছ' আনা করে পয়সা আসে। আর ঐটা দিয়েই তেল, লবণ, কেরোসিন যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষের চাহিদা মেটাতে হয়। বিক্রি করে দিলে সংসার চলবে কি করে! বললো, তোর বাবা তালি আর আস্ত রাখপে না কারো।

ছেলেঃ বাবাতো হাঁস খুপিরতে বার করার আগে বিলি চলে যায়, আর আসে আমরা শুয়ে পড়ার পর মেলা রাতি, বাবা টের পাবে না। আর ঠিক পালিউ কিছু কবে না বুধায়, বেতন দিলি আর বই কিনলি বাবা রাগ করতি পারবে না।

পড়াশুনায় ছেলের আগ্রহ দেখে মা প্রীতি অনুভব করলো। প্রস্তাবটাও একেবারে খারাপ বলে মনে হয়নি। কিন্তু তবুও স্বামীকে না জানিয়ে অত-বড় একটা কাজ করার কথা ভাবতে পারলো না।

আনন্দ আর ভাবনা নিয়ে দীননাথ যখন বাড়ীতে ফিরলো, তখন গভীর রাত্রি। স্ত্রী বদনায় হাতমুখ ধুয়ার জল এনে দেবে বলে এগিয়ে গেল। দীননাথ বাধা দিয়ে বললো, তুই তাড়াতাড়ি ভাত গুছায়ে দে, আমি ভারে-কলসীরতে পা ধুয়ে আসি। খেতে বসে দীননাথ বিরক্তির স্বরে বললো, এত ভাত তরকারী কি এট্টা মান্ষি খাতি পারে? রান্ধার সুমায় হিসেব পাস্নে?

স্ত্রী বললো, তুমি যেগুলো পারো খাও। আমিতো কচ্চিনে যে জোর করে তোমারে খাওয়াবো।

দীননাথঃ তার মানে তুই তালি আহানো খাসনি?

স্ত্রীঃ বাড়ীর বিটাগে খাওয়া না হলি কি বিটিরা খায় কহনও? তুমরা সারাদিন খাটা খাটনির পর আসে কড়োকড়ো ভাত খাবা আর আমরা রান্দে-টান্দে গরম গরম খায়ে নেব, তাকি হয়? পাড়ার মানষি কয় কি তালি

দীননাথঃ তোরা অন্ততঃ সুমায় মত যদি দু'ডো খাস্ তালিতে তুগে শরীর ভাল থাক্তি পারে। তা না হলি অযথা আমাগে জন্যি কষ্ট এরে জ্বর-ব্যাগোর হয়ে পড়লি কারে খিডা দ্যাহে কদিন? মানষি যা কয় কোকগে, আমার জন্যি আর কোনদিন ইরাম বসে থাকপি নে খায়ে দায়ে ভাত বাড়ে রাহে শুয়ে পড়বি।

স্ত্রীঃ তুমি অত কথা না কয়ে, এট্টু দেহে শুনে দুডো খাও, কাটা বাছে খায়ে, ঝুরো মাছের কাঁটা যেন গলায় না ফোটে।

স্ত্রী হুঁকো সেজে এনে দিলো, দীননাথ বসে নিশ্চিন্ত আরামে টানছে। খেতে খেতে ওর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো, তুমাগো মিটিংই কি হলো কবানা এট্টু।

দীননাথ, সে মেলা কতা, সব কব তোরে, তার আগে কাহার সাথে দেহা হয়চে কি-না তাই কয়েনে।

দীননাথের স্ত্রীর মুখখানা আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে গেল। দীননাথ বললো, যাস্নি তালি? তুগে পরে এট্টা কাজের ভার দিলি তা ঠিকমত হবে না, আমি আর এতো দোড়োদোড়ি করে পারিনে।

স্ত্রী ধীরে ধীরে বললো, কাহারা কয়ে দেছে, তোমার ছাওয়ালের জন্যি তারা কিছু করতি পারবে না। সোজাসুজি কয়ে দিল, তুমার ছাওয়াল যদি

লেহাপড়া শেহে, তালি তোমার কাহাগে খ্যাতে জন দেবে কারা ?

দীননাথ ঃ মাঝে কাহা এই রহম কথা কয়ে দিল ?

ঃ না, মাঝে শউর উরাম কথা কয়ও না, আজও কয়নি। মাঝে শউর বুড়ো হয়ে গেচে, এহন আর মাতব্বরিতি সিরাম যায় না, তাই তোমার ভূপেন খুড়োর কাচে গি-লাম।

ঃ ভাল হয়চে, আর কারো কাছে যাতি হবেনা, নিজির খ্যামতায় যদি কুলোয় ছাওয়াল পড়াবো, না পারি আমার মত খ্যাতে খাটপে।

ঃ অত রাগ করলি চলেনা। আমরা গরীব মানুষ, এটটু সহ্য করতি হয়, মাথা গরম করে যা-তা করে ফেললি তাতে নিজ্জিগে খেতি হবেনে। কুদা যদি তোমার মত খ্যাতেই খাটলো তালিতো উরাই জিতে গেল। উরাতো চায় তোমার ছাওয়াল লেহাপড়া না শিহে উগে বাড়ী জন খাটে মরুক। আমরা খাই বা না খাই, মানসি যা কয় কোকগে, কুদার লেহাপড়া বন্দ এরা যাবেনা— বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠলো।

গরমের দিনে বেশিরভাগ সময় গ্রামের মানুষ খোলা বারান্দায় ঘুমায়। মশারী টাঙাবার প্রয়োজন নেই, টাঙালেও ৯০° কোণ করে উড়তে থাকে। এমনি দিনে লোকে ঘরে ঘুমানোর মত মুর্খামী করে না।

দীননাথ মাদুরে উবুড় হয়ে বুকের নীচে পুরোনো বালিশটা গুঁজে দিল। চোখ বন্ধ করে আরাম করে হুঁকো টানছে আর ভাবছে, বউ এসে আরেকবার মিটিংএর সংবাদটা জানতে চাইলেই হয়, নতুবা কি করে তাকে বলবে গ্রামের সমস্ত কৃষকেরা যে তাকেই নেতা করেছে—একথা উপযাজক হয়ে বলতে দীননাথের লজ্জা করছে।

দীননাথের স্ত্রী বাইরে কলসীর পাশে থালাবাটী রেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো আশে-পাশে ছাই নেই। তাই, উঠোনের ওপর দিয়ে অন্যদিকে ছাইয়ের সন্ধানে যাচ্ছিল। এদিকে দীননাথ স্ত্রীকে সুখবরটা জানাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, স্ত্রীকে বললো, ওগুলো আজ থুয়ে দে, কাল বিয়ানে করিস্ কেনে, আজ মেলা রাত হয়ে গেছে।

কথাটা শুনে ওর স্ত্রী থমকে গেল। এইতো মাত্র কয়েকদিন আগে এঁটো থালা রাতের বেলায় পরিস্কার না করে রাখার জন্যে দীননাথ রেগে গিয়ে তাকে প্রায় মেরেই বসেছিল। আজ আবার একি কথা! মুহূর্তেই অতি জটিল প্রশ্নটা যেন স্পষ্ট হয়ে গেল ওর কাছে। বাঁকা চোখে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললো, এট্টোনি দেরী এরো, আমি তাড়াতাড়ি আসতিচি।

ছাই নিয়ে মাজতে বসলো, কি যেন এক অজানা আনন্দের শিহরণ বয়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীরে। অতি দ্রুত কাজটুকু শেষ করে ঘরে নিয়ে ওগুলি রেখে দিল। আঁচলে হাতমুখ মুছে ঘর থেকে বারান্দায় বেরোতে কেমন একটা মধুর লজ্জা তাকে যেন আটকে দিতে চাইলো। কয়েক মুহূর্ত ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে স্বামীর বিছানায় গিয়ে বসলো।

দু'জনে নির্বাক, কারুর মুখে কোন কথা নেই। দীননাথ ভাবছে, এক্ষুনি হয়তো স্ত্রী আদর করে জানতে চাইবে মিটিং এর ফলাফল। কি ভাবে সে বলবে কথাগুলি, তা একবার মনে মনে আউড়ে নিল। স্ত্রী ভাবছে স্বামী তাকে এক্ষুনি দু'হাতে বুকে টেনে নেবে, পরম নিশ্চিন্তে স্বামীর বুকে মুখ লুকোবে। আরও কয়েক মুহূর্ত, স্বামীর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সে অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে গেল; নিজেকে গোপন..করতে কোন কথাই তার মনে পড়লো না। অগত্যা বললো, জানো, সুরে খাঁ আজ আবার আরাট্টা নতুন বিয়ে এরে আনেচে, ইডা নিয়ে ওর পুনারো-ষোল ডা বউ হয়ে গেল।

আশাহত দীননাথ অবাঞ্ছিত কথায় চটে গেল। বললো, তুগে সারা-দিন কোন কাজ থাহে না, তাই পাড়ায় ঘুরে যতসব বাজে কথা জুগায়ে এরে বেড়াস্। মান্দারের বউর সাথে মনাবাবুর খুব ভাব, আর মান্দার কাজ না করে ভাল খায়, পরে; তাতে তোর কি? সুরে খাঁর পুনারো কি ষোল বিয়ে সে হিসেবে তোর কাজ কি? তোরে আমি বারণ করে দিলাম এ সব কথা যেন তোর কাছে আর না শুনি।

দীননাথ নিজেই ওর স্ত্রীকে এ সব গল্প শোনায়। কি করে এসব নোংরা ঘটনা নিয়ে গোলমাল, মারামারি আর তার সালিসীর কি ফলাফল হয় ইত্যাদি। এইতো সেদিনই সুরে খাঁ কি করে ছেলের বিয়ে দিয়ে এনে ওর বৌমার সাথে ভাব করার চেষ্টা করে, আর ওর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ছেলে-বউ পালিয়ে যায়, বৌমার ওপর জবরদস্তি করতে গিয়ে জানাজানি হয়ে যায়, আর পাড়ার লোকে কি ভাবে তাকে পিটিয়ে আধমরা করে ইত্যাদি। এ সবই তো দীননাথ তাকে শোনায়। তাই, দীননাথের এ আচমকা ভাবান্তরে স্ত্রী অবাক না হয়ে পারলো না।

দীননাথের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজতে চেষ্টা করলো সে, বললো, তুমাগে মিটিংই কি এই সব ঠিক হয়চে না-কি?

দীননাথ: কি সব?

স্ত্রী: ঐ যে রাত্তির বেলা থালাবাটী মাজা যাবে না, পাড়ার কনে কি হচ্চে জানা যাবে না, আর জানলিউ তুমাগে কওয়া যাবে না, এই সব?

স্ত্রীর এই রসিকতা দীননাথের খারাপ লাগলো না, হয়তো প্রসঙ্গটা দীননাথের চিন্তার কাছাকাছি এসে পড়েছে সেজন্যে।

দীননাথ বললো, না ওসব বাজে কথা নিয়ে আমাগে মিটিংই কোন আলোচনা হয়নি, বেশ দামী মিটিং হয়চে।

স্ত্রী: কি হলো তুমাগে দামী মিটিংই?

দীননাথ ধীরে ধীরে স্ত্রীকে সবই বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলো। স্বামীর মুখে এ ধরণের কথা সে প্রথম শুনছে। মনোযোগ দিয়ে শুনলো, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না। দীননাথ সভাপতি হয়ে এসেছে, গ্রামের যোগ্য লোক বলেই সবাই তাকে সভাপতি করেছে। তাই, স্ত্রীর কাছে সে প্রচুর প্রশংসা ও উৎসাহ পাবে আশা করেছিল; কিন্তু স্ত্রীর তেমন কোন ভাবান্তর না দেখে মনে মনে ব্যথা পেল সে, খানিকটা ভাঁটা পড়লো তার উৎসাহে। কিন্তু দীননাথ ভাবতে পারলো না যে, তার স্ত্রীর পক্ষে সমিতি যে কি, আর তার সভাপতির মূল্যই বা কতটুকু এটা বোঝা সম্ভব নয়।

★

রান্না-বান্না শেষ, সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার কাজে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় বাড়ীতে দু'জন অতিথি এলো। মা বললো, শ্যামল, তুই তাড়াতাড়ি পাড়া থেকে কয়েকটা ডিম এনে দিয়ে তবে স্কুলে যা, নতুবা আমার রান্না করার কিছুই নেই।

শ্যামল আশে পাশে অন্য কাউকে দেখতে পেল না। অগত্যা নিজেই ছুটলো। সম্ভাব্য কয়েকটা বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে মিললো না। তারা জানালো সকালে ব্যাপারী এসে গেছে, তাই কারুর বাড়ীতে ডিম নেই। শ্যামল

ছুট্‌লো গাঙপাড়ের দিকে। দীননাথের বাড়ীতে গিয়ে বললো, বৌদি, ডিঃ আছে ? —কোথাও পাচ্ছিনে।

ঃ আচে চারডে, তা রাত্তি উরা খাবে বুলে থুয়ে দেচে।

ঃ তাহলে থাক। দেখি অন্য কোথাও পাই কিনা।

ঃ অসুমায়ে ডিম কি করবা ? মেলা দরকার তুমাগে ?

ঃ বাড়ী দু'জন আত্মীয় এসেছেন। স্কুলে যাচ্ছিলাম, মা পাঠালো। কিন্তু সকালে ব্যাপারী ঘুরে যাওয়ায় কোথাও পাচ্ছিনে।

ঃ তালি এ কয়ডা নিয়ে যাও, উরা নাহয় কালকে খাবেনে।

ঃ না থাক্, —বলে পা বাড়ালো।

ঃ না তুমি নিয়ে যাও। আমি নাহয় তুহোর সুনায় অন্য বাড়ীর‌ে কিনে আনবানি।—বলে ছেলেকে ডাকলো, ভজা, কাহারে ডিম কয়ডা আনে দে

শ্যামল ফিরে এলো, ভজাকে দেখে বললো, কিরে স্কুলে যাবিনে শরীব খারাপ নাকি ?

ওর মা বললো, না, বেতন দিত্তি পারিনি বলে ওরে স্কুলিরতে তাড়ায় দে। সেইজন্যি দুইদিন হলো স্কুল কামাই হচ্চে।

ঃ কেন, ওরতো ফ্রি হওয়া উচিৎ, কোন কন্‌সেশনই কি হয়নি ওর

ঃ না।

শ্যামল ভজার দিকে তাকিয়ে বললো, তুইতো আমাকে বলিস্‌নি তোকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বা তোর ফ্রি হয়নি ? তোর বাবার মত অত সরল মানুষ হলে চলবে না। এখন সরল মানেই লোকে ভাবে বোকা। জামা গায়ে দিয়ে চলে আয়, আমার সাথে যাবি।

শ্যামল ভজাকে সংগে নিয়ে সোজা হেডস্যারের ঘরে গেল। বললো স্যার, ভজার বাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ, ছাত্র হিসাবেও ভাল, ওর্ ফ্রি পড়বার ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। আপনারা হয়তো ওর ব্যাপারটা ভুলেই গেছেন। ওর ফ্রি পড়বার ব্যবস্থা করে দিন। আর আপাততঃ Class Teacher-কে বলে দিন ওকে যেন ক্লাস থেকে তাড়িয়ে না দেন।

ঃ ভজা··· ভজা মানে কোন্ ছেলেটা সে ?

ঃ এই যে সে, ভজন বিশ্বাস, বলে ভজাকে দেখিয়ে দিল।

ঃ দেখ শ্যামল, সব তাতেই একটা নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা হয়, সেতো তুমি জানোই। এবারের মত মিটিং হয়ে কনসেশনের ব্যাপারটা Final হয়ে গেছে। এ বছর আর কিছুই করা যাবে না, আগামীতে দেখা যাবে। তাছাড়া, ওর দরখাস্তটা নিয়ে কথা উঠেছিল, কেউ রাজী হয়নি ওকে concession দিতে।

ঃ ওর জন্যে কিছু করতে হলে এ বছরই তা করতে হবে। বেতন দিয়ে একবছর পড়ার কোন সামর্থ্যই ওর নেই। ফলে, আগামী বছরের কোন প্রশ্নই এখানে আসেনা।

ঃ তুমি এখন যাও। এ নিয়ে আমাদের আর কিছুই করার নেই।

ঃ কনসেশনের ঐ ব্যবস্থাটা চালু আছে এইসমস্ত গরীব ছাত্রদের জন্যেই; মোড়ল এবং কতকগুলি প্রভাবশালী শিক্ষকদের চামচাদের জন্যে নয়—একথা প্রধান শিক্ষক হিসাবে আপনার মাথায় রাখবার প্রয়োজন আছে। আরও পিছিয়ে গিয়ে বলা যেতে পারে—অজ পাড়াগাঁয়ে মশিয়াহাটী স্কুলের জন্ম হয়েছিল মুখ্যতঃ এই সমস্ত গরীব কৃষকদের সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়া শিখবার জন্যেই। তাই ভুলে যাবেন না স্কুল যাদের, তাদের বঞ্চিত করার চেষ্টা বাতুলতা, ওরা আপনাদের ক্ষমা করবে না।

ঃ কি বলতে চাও তুমি?

ঃ বক্তব্য অতি স্পষ্ট। ভজার মত ছাত্রদের বিনা পয়সায় পড়বার সুযোগ দিতে হবে। আমরা ওসব আইন শৃঙ্খলার ধার ধারি না, আইন মানি ততক্ষণ, যতক্ষণ আপনারা এদের স্বার্থ দেখবেন, তার বেশী নয়। তাই, এদের বঞ্চিত করার চেষ্টা যদি আপনারা চালিয়ে যান, তাহলে আমরা বাধ্য হবো স্কুলের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিতে।

শ্যামল বেরিয়ে ভজাকে নিয়ে Teacher's Common room এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। অলকবাবু ডাক দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার, কি হয়েছে শ্যামল?

অলকবাবু Managing Committee-তে Teacher's represen-titive, তাই ভজাকে বঞ্চিত করার দায়িত্ব সরাসরি অলকবাবুর ওপর চাপিয়ে বললো, ভজাকে ও ভজার মত ছেলেদের কোন কনসেশন না করা আমরা অন্যায় বলে মনে করি, এটা অপরাধও বটে।

অলকবাবু ভজার বাবাকে ভাল করেই চেনেন। শ্যামলের সামনে
বলার হয়তো কিছুই ছিলো না। তাই দোষ স্বীকার করে বললেন,
কেস্‌টা পুরোপুরি over look হয়ে গেছে। তা ঠিক আছে, ওটা
কোন বিষয়ে মিটিং হলে সেখানে পুনর্বিবেচনার জন্যে তোলা হবে।

ঃ পুনর্বিবেচনার বিষয়তো বটেই। তবে তোলা হবে বললে আ
সন্তুষ্ট নই। আপনারা বলুন, ওটা শুধরে নেওয়া হবে।

ঃ হ্যাঁ শ্যামল, ওটাকে শুধরে নেওয়া উচিৎ এটা আমি অকপ
স্বীকার করছি। কিন্তু দুঃখিত, তোমাকে কথা দিতে পারছি না যে, শু
নেওয়া হবেই। কারণতো তুমি জানোই—এবারের Managing Co
mittee-তে আমি শুধুমাত্র একজন Teacher's represəntitive। ত
Case-টা Jenuine। ফলে, আশারাখি আমি সফল হবো।

ঃ শুধু তাই নয়, আপনিতো poor fund Sub-Committe
এর Chairman, ওর জন্যে ঐ fund থেকেও কিছু কিছু ব্যবস্থা কর
হবে। ওর এখনো বই কেনা হয়নি। ও শুধু গরীব নয়, মেধাবীও
সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি এখন হেড-মাষ্টারমশায়কে একটু ব
যাও যে, তুমি ওকে class-এ পৌঁছে দিচ্ছ; এটা একটা courtes
এটুকু না বুঝলে চলে না।

* * *

কৃষক সমিতির কথা প্রথমে নিজ গ্রামে, ধীরে ধীরে সমস্ত এলাকা
জেনে গেল। কেউ করলো তামাশা-বিদ্রূপ, কেউ কেউ স্বাগত জানালো
এ ব্যাপারে কৃষকদের মত ছাত্রদেরও আগ্রহ ও উৎসাহ প্রচুর, নতুন বি
একটা দেখে তারা সবাই খুশী।

কিছুদিন বাদে কৃষক সমিতির লোকজন গ্রামের মাঝামাঝি ঠাকুর বাড়ী
গাবতলায় একটা দো'চালা ঘর তুলে দিল। গ্রামের ছেলেরা আপ
তুললো—ওটা আমাদের ক্লাব ঘরের পোতা (ভিত্), ওখানে তোমরা কেন
তুলবে?

দীননাথ ঃ আরে তাতে কি হয়চে। আমরা কি তুগে পর—না তুরা আমাগে পর? তুগে ক্লাব ঘর যিরাম আমাগে, এ সমিতির ঘরও তুগে। ধর, ভাঙা ক্লাব ঘর আমরা ঠিক করে দিলাম; তুরাও আসবি, বসবি, আমরাও।

গ্রামের ছেলেদের দিয়ে তৈরী করানো বিরাট একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হলো ঘরটার সামনে। তাতে লেখা— "কুলটিয়া কৃষক সমিতি কার্য্যালয়" মণিরামপুর, যশোর।

এর ঠিক পরদিনই দীননাথ সম্পাদক হরেনকে পরামর্শ দিলো একটা মিটিং ডাকার জন্যে। এবার আর শান্তিরামের বাড়ীতে নয়, নতুন তৈরী অফিস ঘরে। মিটিং-এর জন্যে লিখিত কোন নোটীশ দেওয়া হলো না। পথে-ঘাটে-মাঠে, যেখানে যার সংগে দেখা হলো পরস্পর পরস্পরকে জানিয়ে দিলো। তাছাড়া, কয়েকজনের ওপর ভার দেওয়া হলো, তারা যেন নিজ নিজ পাড়ার সবাইকে ডেকে নিয়ে আসে।

মিটিং-এর শুরুতেই দীননাথ প্রস্তাব তুললো সমিতির একটা fund গড়ে তোলবার জন্যে এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে সবাইকে আহ্বান জানালো।

Fund তৈরী করার প্রশ্ন উঠতেই শান্তিরাম গলা ঝেড়ে শুরু করলো। —টাহা পয়সা সমিতির সগলের আগে দরকার। এট্টা fund না থাক্‌লি সমিতি চালু রাহা যাবে না। তাছাড়া, আমাগে দাবী-দাওয়া আদায় করতি যাবার মানেই হলো গিরেস্থ আর বাবুগে সাথে ঝগড়া লাগানে। আর তাতেই কান্‌দিক দিয়ে কত টাহা লাগবেনে আগে থাকতি কওয়া যায় না। যে-কোন দিক্‌ দিয়েই লাগতি পারে। তারজন্যি আগেরতে সাবধান না হলি চলেনা। সেইজন্যি আমাগে এট্‌টা চান্দার ব্যবস্থা করতি হবে। চান্দা মানে আমার যা মনে হয়, আমরা যদি ঠিক করি, মাসে মাসে চার আনা দুই আনা করে দিতি হবে, তালি আমরা কেউ হয়তো দিতি পারবো না। তার চাইতে আমাগে বুড়োরা স্কুল বানানের সুমায় যিরাম চাল জোগাড় করার ব্যবস্থা করিলো, সেইরাম করাই বুধায় ঠিক হবেনে। প্রত্যেকদিন মাটিরা রান্দার চালিরতে একমুট করে আলাদা একটা ভাড়ে রাহে দেবে,

মাস শেষে সব বাড়ীরতে নিয়ে আসা হবে, তাতে টাহার পরিমাণটা বেশী হবে আর কষ্টও হবে না।

গ্রামের প্রাচীন কৃষক সুদোরাম শিকারী দাঁত খিটিমিটি করে উঠলে—সাথে সাথে উল্টো দিকে শান্তিরামের হাঁ হঁা শব্দ, পুরো সভাতেই হাসি গোল পড়ে গেল। সুদোরাম এমনিতেই শান্তিরামকে সহ্য করতে পারেনা। কারণ শান্তিরামের সংগে ওর একটা মধুর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় শান্তিরাম বরাবর কারণে-অকারণে ওর পিছনে লাগে। তার ওপর শান্তিরামকে সমিতির ক্যাসিয়ার করার সংবাদ শুনেতো আগুন হয়ে আছে। সেজন্যে অপটু শরীর নিয়েও সে মিটিংয়ে চলে এসেছে শান্তিরামকে বিরোধীতা করার জন্যে, পারলে সমিতিকে দু'টো ভাল পরামর্শ দিতে। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত শান্তিরামের দীর্ঘ বক্তৃতা ও উচ্চস্বরে হাসি শিকারীর মাথায় আগুন জ্বেলে দিল। বললো, দেখলি, দেখলি, পাঁঠার কাণ্ড দেখলি, শালারে আমি খড় পিটে করবো, ওরে বানায়চে ক্যাসিয়ার; ও কোনদিন হিসেব দেবে না আমি কয়ে রাখলাম, পাঁজী খায়েই সাবাড় করে দেবে। —পাঁঠার যুক্তি শোন, একমুট করে করে, ও একমণ বানাবে—জমায় জমায় কয়ডা হোল তারপর বিটিরা যেদিন দ্যাখপে চাল নেই, ঐ কয়ডা নিয়েই রান্দে খাবেনে পাঁঠার মাথায় আছে খানিক শয়তানী বুদ্ধি, কাজের কিছু নেই।

সুদোরাম শিকারী বুড়োমানুষ, এতখানি কথা একসাথে বলে কষ্টে আর কাশীর ধমকে হাঁপাতে লাগলো। সবাই জানে সুদোরাম আর শান্তিরামকে এক জায়গায় করলে অপর্যাপ্ত হাসির খোরাক পাওয়া যায় ঠিকই; কিন্তু কোন আলাপ-আলোচনা চলতে পারে না। তাই ওর নাতি বিরুকে বললো বুড়োকে বলে কয়ে বাড়ী রাহে আয়।

বিরু বললো, ঠাহুরদা, ম্যাগ হচ্ছে, শিগ্‌গীর বাড়ী চলো, তা'না হলি ভিজতি হবেনে।

শিকারী এবার প্রকৃত শিকারীর মত নাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো শালা, বুড়ো হয়েতো মরবার জো হলাম; কেউ কোনদিন মিটিংই ডাকলো না, আর আজ আমাগে সমিতির মিটিং, নিজির মিটিং, বৃষ্টির ভয়তে বাড়ী চলে যাবো?

বললো, আমি আজ সারাদিন বাড়ী বসে শলা চাঁচিচি আর ভাবিচি তুগে কয়ডা ভাল যুক্তি দেব। সে কয়ডা না কয়ে বাড়ী চলে যাবো? তুগে ও চাল জমানে বুদ্ধিতি হবে না। স্কুল বানানের সুমায় কাজ হইলো ঠিকই, তার কারণ, আজ মানসির যে অভাব, এত খাবার অভাব তহন ছিল না। তাছাড়া, এহন বাড়ীর ছেলেপেলেগুলোও পাঁজি হয়ে গেচে। ছাওয়াল মাইয়ে যহন না খায়ে থাক্‌পেনে, তহন ঐ জমানে চালি বিটিরা হাত দেবেনে; আর তা না হলি ঐ নচ্ছার পাঁজিগুলো চুরি করে ব্যাচপেনে। এহনও করতি পারিস, যা হয় কিছু্ তা হবে। তাই বুলে ঐ আরামে নাহে সসোর তেল দিয়ে শুয়ে থাক্‌লি চলবে না। আমার কাছে শোন্ কি করতি হবে— গিরিতলারতে বিলির মধ্যি দিয়ে সোজা পাতাড়ি পর্যন্ত আঠারো হাত চওড়া এট্‌টা ভাঙাড় আছে, তাতো তুরা জানিস সগলে। আহানেতো সে ভাঙাড় মাত্তর এক বিঘেত হয়ে গেচে। যার যার সিতেনে ভাঙাড়, সেই সেই জমির মধ্যি নিয়ে নেচে। ভাঙাড় কালকেই দড়ি ধরে ভারো এরে নিয়ে নাঙল ছাড়তি হবে। তুরা, যাগে যাগে নাঙল আছে খ্যাতেরতে নাঙল ছাড়ে দিয়ে ওহেনে চলে আসপি। আমি মাপ নিয়ে আগেরতে ঠিক করে রাখপানি কোমনি কোমনি ভাঙাড়। মনে থাহে যেন, পুনারো-ষোল বিঘের বেশী হবে ঐ জমি।

আরও এট্‌টা কথা, উল্ কাটা, বিচেলী বাড়োনে, এই সব কাজ, যা জ্যাৎস্না রাত্তি-টাত্তি করা যায়, ওগুলো পালি চুহোয় নিতি হবে। এহেনে যে দৈনিক আড্ডা না মারে, হাতা-পিটি ধরে ঐসব করতি হবে। তাতে কিমিতির টাহা আসবে। আর ঐ পাঁঠাডা যেন না মারে খায়, তা তোরা যারা আছিস্, তাগে হিসেব রাখ্‌তি হবে।

সুদোরাম শিকারী যখন তার বক্তব্য শেষ করলো, শতাধিক লোকের এই সভাতে মনেই হয় না কোন জীবিত প্রাণী আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সুদোরাম শিকারী বললো, এহন তুরা বুঝে-সুঝে যা হয় কর। আমি আর বসতি পারতিচি নে, তুগে কারো কাচতে কাল সুহালে আমি শুনে নিবানি শেষ পর্যন্ত কি হলো।

সুদোরাম শিকারী লাঠি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। দাঁড়িয়েই বললো, আরাট্‌টা কথা, আমাগে মধ্যি কারো

কারো জমি আছে ভাঙাড়ের গা দিয়ে, তাগে কিন্তু সগলের আগে ছাড়ার কতা কতি হবে। যিরাম, আমার মাত্তর কয় কাটা জমি, তবুও আমার কোন অমত নেই ছাড়তি, তোরা সিটা আগেরতে ঠিক করে নিস্। না হলি যাগে বেশী জমি আছে, তারা কিন্তু দল ভাগানের জন্যি উঠে পড়ে লাগবেনে।

সবাই হতবাক হয়ে গেল সুদোরাম শিকারীর কথা শুনে। এ লোক টাকে কোন ব্যাপারে কেউ কোনদিন পাত্তা দেয়নি। অথচ আজ জীবনের শেষ সীমায় এসে উপযাজক হয়ে কত সুন্দর উপদেশ দিয়ে গেল সবাইকে। সে যা বলে গেল সবাই মিলে সারারাত ধরেও হয়তো ও কথাটা চিন্তা করতে পারতো না। ভদ্দরের চিৎকার শোনা গেল, দেখলিতো, আমি সব দিন কয়ে থাকি, পুরোনো চালি ভাতে বাড়ে।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত মিটিং চললো। সারাদিন পরিশ্রম করায় সবাই ক্লান্ত। অনেকেই ওখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ কেউ বসে বসে ঘুমোচ্ছে। বাদ বাকী সবাই আলোচনায় ব্যস্ত। অবশেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো সুদোরাম শিকারীর পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হবে fund তৈরী করার ব্যাপারে তবে, ভাঙাড়ের জমিতে চাষ দিতে যাওয়া হবে একদিন বাদে। কারণ আগের দিন সময় করে ভাঙাড়টা বের করে নিতে হবে সঠিকভাবে।

জনের দাম বাড়িয়ে দেবার জন্যে চাপ দেওয়া হবে অথবা অনুরোধ করা হবে। তবে বেশীদূর এখন অগ্রসর হওয়া যাবে না। কারণ এ ব্যাপারে আশপাশের কৃষকদের সাথে জোট না বাঁধতে পারলে যেমন বিশেষ সুবিধা করা যাবে না, তেমনি মাঠে এখন কাজের বিশেষ তাড়া নেই। তাই এ ব্যাপারে মোক্ষম চাপ দিতে হবে আউশধান কাটা শুরু হলেই। এর মধ্যে নিজেরা যেমন শক্তি সঞ্চয়ের সময় পাওয়া যাবে, আশপাশের গ্রামের গরীব কৃষকদের সাথে জোট বাঁধার একটা ব্যবস্থা এর মাঝে করা সম্ভব হবে। ঐ সময় নিজেদের জমিতে কিছু কিছু ফসল হবে, ফলে, দু'দশ দিন জন না দিয়ে নিজের জমিতে যেমন কাজ করা যাবে; না খেয়ে উপবাসের সম্ভাবনাও থাকবে না। আর কৌশলগত দিক দিয়ে ঐ সময়টা এই কারণে সব থেকে ভাল যে, আউশধান পেকে গেলে কাটতে দু'এক দিন দেরী

হলেই ওগুলি সান (আমনের গাছ) ছেড়ে দিয়ে জলের নীচে ডুব মারবে, বাড়ীতে আসবে না। ধনী কৃষক বা জোতদারেরা মরিয়া হয়ে যে কোন মূল্যে ঐগুলি নষ্টের হাত থেকে বাঁচাতে চাইবে। তাছাড়াও এক সময়ে ঝট্‌পট্‌ ধান কেটে বাড়ীতে তোলার বিপদ আছে। তাহলে বর্ষার জন্যে মাড়াই করা সম্ভব না হলে গাদার মধ্যে ধানে অংকুর বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ গুমে যাবে, খাবার অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে—যেটা সচরাচর হয়ে থাকে। তাই ওরা চাইবে যেখানে যেমন প্রয়োজন সেমত ব্যবস্থা নিতে। যার ফলে মালিক শ্রেণী এ অবস্থার মধ্যে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না, কৃষকদের দাবী-দাওয়া প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হবে।

অধিক সুদে টাকা যাতে কাউকে ধার না নিতে হয় সমিতি তার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। সমিতির মাধ্যমে যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে, যাতে ব্যাংক থেকে অল্প সুদের ও সহজ কিস্তিতে দেয় কৃষি ঋণ পাওয়া যায়। তাছাড়া, অদূর ভবিষ্যতে যদি সমিতির একটা উল্লেখযোগ্য fund তৈরী করা সম্ভব হয়, তাহলে সমিতির fund থেকে অল্প সুদে কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হবে। যারা চড়া সুদের টাকা ইতিমধ্যে ধার নিয়ে বসে আছে, তারা কোনক্রমেই অত বেশী সুদ দেবে না। তার জন্যে প্রয়োজন হলে মহাজনদের মুখোমুখি হতে পিছ্‌পা হবে না সমিতি।

প্রত্যেকটা ভাগ চাষীকে জমি চাষ করার পর রসিদ দিতে হবে এবং কোন ভাগ চাষীকে খুশীমত উচ্ছেদ করা চলবে না। নিজের হাল বলদে চাষ করলে তাকে অবশ্যই ফসলের অর্ধেক দিতে হবে, কোনক্রমেই এক-তৃতীয়াংশ নয়।

বন্ধক প্রথাই মরণের বড় ফাঁদ। এই ফাঁদে পড়েই আজ সবাই সর্বস্বান্ত। তাই, এর প্রতিবিধানও করতে হবে অত্যন্ত শক্ত হাতে। নিঃসন্দেহে এ কাজ করতে গিয়ে সব থেকে কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হবে, তাই এ কাজের বিপদ সম্পর্কেও সাবধান থাকতে হবে। প্রথমে ধনীকৃষক ও মহাজনদের সাথে আলোচনায় বসতে হবে। পাঁচ বছরের বেশী যে জমি মালিকের কাছে আছে, তা ওদের নিঃশর্তভাবে ছেড়ে দিতে হবে। অন্যান্যগুলি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কৃষকদের ফাঁকি দিয়ে

ওরা যে সমস্ত জমির মালিকানা অর্জন করেছে তা অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হবে। ওরা অনমনীয় মনোভাব দেখালে সেভাবেই তার জবাব দিতে হবে। যাকে বলে—"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। ওদের স্মরণ করে দিতে হবে সৎ ও বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে এতকালের অত্যাচার কৃষকেরা সহ্য করেছে; কিন্তু আর নয়। অন্যায় অত্যাচার রুখতে প্রয়োজনে কৃষকেরা বিশ্বাস ভংগ করবে, বিনা কাগজ পত্রে আর একটি দিনও জমিতে চাষ করতে দেওয়া হবে না। [উল্লেখযোগ্য বন্ধকী প্রথার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোন কাগজ-পত্রই থাকে না, অথবা কাউকে সাক্ষী রেখে হয়ত একটা সাদা কাগজে কোন লেখা হয়ে থাকে]

পরিশেষে সিদ্ধান্ত হলো, অল্প দামে বিক্রি করে চড়া দামে ক্রয় সমেত প্রতিটা সমস্যার সাথেই দেশের রাজনীতি জড়িয়ে। ফলে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কোন সমস্যার প্রকৃত সমাধান হতে পারে না। সে জন্যে এ সমস্ত অর্থ নৈতিক দাবী-দাওয়ার সাথে প্রত্যেকে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হবে, রাজনীতির সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। এ সমস্ত দাবী-দাওয়ার আন্দোলনের সাথে একটা রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভংগী রাখতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের প্রতিটা অংগভংগীর সাথে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই, কোন সমস্যার সমাধানই স্থায়ী হতে পারে না যদি না তার সমাধান রাজনৈতিকভাবে করা হয়।

কৃষক সমিতির সিদ্ধান্তের কথা ভোর বেলাতেই রাষ্ট্র হয়ে গেল। আপাত ভাবে ভাঙাড়ের ব্যাপারটাই আলোড়ন সৃষ্টি করলো। যাদের বেশী জমি এভাবে বেরিয়ে যাবে তারা অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল। কারণ গ্রামের সমস্ত জনসাধারণ যদি চায় ভাঙাড়ের জমি বের করে নেবে, তাহলে দু'চার জনে কি-ই বা করা যাবে। তবুও তারা প্রকাশ্যে অন্য ভাব দেখালো—হুংকার দিয়ে বললো, কার সাধ্য জমি বের করে নেয়। তারপর মনে মনে হিসাব করলো কার কার জমি বেশী বেরিয়ে যাবে এবং একত্র হয়ে জোট বাঁধলো। কৃষকরা অবস্থার উপর নজর রাখলো, প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলো, মনোযোগ দিয়ে পরিকল্পনা মত বিকেল বেলায় কুড়ি-পঁচিশ জন গিয়ে ভাঙাড়টা চিহ্নিত করে এলো।

গ্রামের চারজন জোতদার কৃষক সমিতির এই পদক্ষেপে বেশী করে ক্ষতিগ্

হচ্ছিল, তারা একত্রে বসে বিকেল বেলাতেই স্থির করে ফেললো ; লেঠেল বাহিনী ভাড়া করতে লোক পাঠিয়ে দিল।

কৃষকদের কাছে সংবাদটা গোপন রইলো না। সাজ্‌ সাজ্‌ রব পড়ে গেল। যে কোন মূল্যেই তারা সমিতির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করবে।

পাশের গ্রাম লখাইডাঙ্গা ও সুজাতপুরের কৃষকদের সংবাদটা জানানোর জন্যে লোক পাঠানো হলো। এক পাড়াতে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই তাদের রক্তেও যেন আগুন ধরে গেল। তারা নিজেরাই নিজ নিজ গ্রামের ভার নিলো এবং কথা দিলো রাতের মধ্যেই গ্রামের প্রত্যেকের কাছে সংবাদটা পৌঁছে দেবে আর ভোর রাত্রে গ্রামের অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট জন করে বাছাই করা লোক ঢাল-সড়কি-রামদা হাতে ঘটনাস্থলে পেঁৗছে যাবে।

সারাটা রাত ধরে প্রত্যেকটা কৃষকের বাড়ীতে চললো রণ প্রস্তুতি। বালি ধারায় ঘসে অযত্ন, অবহেলায় পড়ে থাকা, মরিচা পড়া রামদাগুলোকে রূপোর মত চক্‌চকে করা হলো। ঢালগুলোকে ঝেড়ে-মুছে পরিস্কার করলো, সড়কির লোহার ফলাগুলো শিলের ঘষায় হেসে উঠলো, ধনুকগুলো পরীক্ষা করে নেওয়া হলো। আর পাকা সুপারীর গাছ কেটে তৈরী করা সড়কিগুলো মরিচা পড়ার উর্দ্ধে, ওস্তাদের হাতের মোক্ষম অস্ত্র।

ভোর রাতে কৃষক সমিতির সশস্ত্র বাহিনী হরিতলার দিকে জমা হলো, সুজাতপুর ও লখাইডাঙ্গা থেকে আরও শতাধিক সশস্ত্র কৃষক এই বাহিনীতে যোগ দিয়ে তাদের কথা রাখলো, শক্তি বৃদ্ধি হলো কৃষক সমিতির সশস্ত্র বাহিনীর।

সমিতির সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে আজ প্রচুর পরিমাণে লেঠেল সর্দারের সমাবেশ। এরা সবাই লড়াই করে পোক্ত, বহু অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এরা। এতকাল ধরে এরা লড়েছে পেটের তাগিদে ; মার দিয়েছে—মার খেয়েছে। কিন্তু সে সব লড়াই আজকের লড়াই থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। এতকাল লড়েছে অন্যের জন্যে, ভাড়াটে হয়ে। আর আজ লড়ছে নিজের জন্যে, নিজের মর্য্যাদার জন্যে, নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে।

কৃষক সমিতির লোকজন সকাল বেলায় ভাঙাড়ের জমিতে লাঙল জুড়লো। একখানা-দু'খানা নয়—কম করেও পঞ্চাশখানা। কিন্তু জোতদারেরা কেউ বাধা দিতে এগিয়ে আসছে না দেখে সর্দারেরা কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লো—শেষে কি এত উদ্যোগ আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু না, রক্তখেকো ঐ জোতদারেরা অত সহজে হার স্বীকার করার পাত্র নয়। প্রায় শুকনো খালের মধ্য দিয়ে গুড়ি মেরে মেরে ভাঙাড়ের মাথায় এসে ওরা ভেড়ির ওপর উঠলো। তারপর সবাইকে ওখানে রেখে দু'জন (জোতদার) এগিয়ে এসে চাষে বাধা দিল। কৃষকেরা অগ্রাহ্য করলো। ওরা গিয়ে প্রথম হালোকে ধাক্কা মারলো। মুহূর্তে কৃষক পাঁচনি হাতে রুখে দাঁড়ালো, অপর একজন এই সুযোগে পুরুষানুক্রমে শোষণের প্রতিশোধ নিল।

ঝট্‌পট্ লাঙলের ইস্‌খানি খুলে ফেললো, পাকা, কালো রং-এর ভারী ইসের একটা আঘাতেই বীরপুঙ্গব মাটীতে লুটিয়ে পড়লো, উপর্যুপরি আঘাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয় আর কি!

বীর সহোদর, সাথীর এহেন দশা দেখে কাছা খুলে দৌড় মারলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। লেঠেল বাহিনী হুকুম পেয়ে ডাক ছেড়ে বিলে নেমে পড়লো, তারা কৃষকদের দিকে এগিয়ে এলো ব্যূহ রচনা করে। কৃষকেরা লাঙল ছেড়ে দিল, প্রত্যেকে নিজ নিজ লাঙলের ইস্ খুলে হাতে নিল।

অধীর আগ্রহে কৃষক বাহিনী অপেক্ষা করছিল। ওরা এবার তালবন ছেড়ে সিংহবিক্রমে এগিয়ে গিয়ে লেঠেল বাহিনীর মুখোমুখি হলো। প্রত্যেকের কপালে বড় বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা আঁকা রয়েছে, মাথায় পাগড়ী, বাঁ হাতে ঢালের সাথে প্রত্যেকের একটা করে রামদা, ডান হাতে সড়কি। ওদের পিছনের সারিতে প্রত্যেকের ঘাড়ে আঁটি বাঁধা সড়কি আর বস্তা ভরা ইট।

দলপতির নির্দেশে বিদ্যুৎ গতিতে গোটা বাহিনী পরিকল্পনা মাফিক দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল, সংখ্যাধিক্যের সুযোগ নিয়ে লেঠেল বাহিনীকে ঘিরে ধরার কৌশল। দলপতি চিৎকার করে লেঠেলদের সাবধান করে দিলো। বললো, জান নিয়ে বাড়ী ফিরতি চাস্‌তো ফাচো, নতুবা আজ আর এট্‌টারেও বিলিরতে ডাঙায় উঠতি দেব না।

লেঠেলরা সাধারণতঃ গুটিকয়েক লোক এমন বিরাট গ্রাম-বাহিনীকে মোকাবিলা করে থাকে। প্রায় সর্বত্রই এই একই ধরণের ছবি। গ্রামের শান্তিপ্রিয় নিরীহ জনসাধারণ শেষ পর্যন্ত লেঠেলদের সাথে প্রায়ই পাল্লা কষতে চায় না তাই আজও লেঠেলরা বিরাট বাহিনী দেখে এতটুকু বিচলিত হলো না। ওরা এগিয়ে চললো।

দলপতির নির্দেশে তীরন্দাজেরা আক্রমণ চালালো। দুই অংশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে লেঠেলদের ওপর পড়তে থাকলো। কারুর মুখে কোন শব্দ নেই, শুধু তীরের ফলা বাতাসে শিস্ দিয়ে যাচ্ছে সোঁ···সোঁ···।

ঢালের নীচে আড়াল করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো লেঠেলরা। তীরন্দাজ না থাকায় এতটা দূরত্ব থেকে আত্মরক্ষা করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। ওরা ঘাপটি মেরে বসে থাকলো। এ অবস্থায় তীর ছুঁড়ে কোন লাভ হবে না দেখে কৃষক বাহিনী ক্রমশঃ তাদের দুটি অংশের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে ওদের দু'দিক থেকে ঘিরে ধরে আক্রমণের চেষ্টা চালালো।

কৃষক বাহিনীর সু-পরিকল্পিত আক্রমণপদ্ধতি দেখে লেঠেলরা আতংকিত হলো; বুঝলো, আর দেরী করলে আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ওরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ করলো।

দলপতি বিচক্ষণ লোক। সে জানে একেবারে মুখোমুখি লড়াইয়ে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত তারা জয়ী হবে; কিন্তু ক্ষয়-ক্ষতি হবে অত্যন্ত বেশী। কারণ তার বাহিনীতে বহু অনভিজ্ঞ সাহসী যুবক। সে জয়ের জন্যে অভিজ্ঞ লড়াকুদের ওপর নির্ভর করতে পারে ঠিকই, কিন্তু ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি নিতে পারে না।

কৃষক বাহিনী আস্তে আস্তে পিছোতে থাকলো। আর তীব্র ভাবে তীর ধনুকের সাহায্যে আক্রমণ চালালো। তীরের আঘাতে কয়েকজন আংশিক জখম হলো, ওরা ভয়ংকর ঘাবড়ে গেল কৃষক বাহিনীর অভিনব কৌশল দেখে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিলম্ব হলো না দলপতির। তার নির্দেশে বাহিনীর অভিজ্ঞ ও পারদর্শী যুবকেরা এগিয়ে গিয়ে- ভীমবেগে আক্রমণ চালালো। অপূর্ব সব কলা-কৌশল। যেমন বিচিত্র আক্রমণ, তেমনি সুনির্দিষ্ট আত্মরক্ষা। সড়কির ফলা কখনও আকাশে উঠে গিয়ে উঁচু থেকে নেমে আসছে মাথার উপর, সাথে সাথে পায়ে ছোড়া সড়কিগুলো মাটি ঘেসে আঘাত করার জন্যে ছুটে যাচ্ছে। সড়কিগুলো ঢালের ওপর জমেজমে ঢালখানাকে ভারী করে ফেলেছে, আবার ঐ গুলোকেই ছাড়িয়ে নিয়ে বিপক্ষের ওপর ব্যবহার করছে। উপরের সড়কিগুলোকে ঠেকাতে ঢালখানা উঁচু করতেই, নীচ্ দিয়ে ছুটে এলো অপর একটা, হাতের হাড় আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে পড়লো।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এর মাঝেও প্রত্যেকে নিজেকে রক্ষা করে লড়ে যাচ্ছে।

উভয় পক্ষের কয়েকজন সামান্য আঘাত পাওয়ায় তাদের পিছনে সরিয়ে নেওয়া হলো। ইতিমধ্যে বৃষ্টির মত ইঁট পড়তে শুরু করলো লেঠেলদের ওপর। লেঠেলরা প্রমাদ গুনলো; বুঝতে পারলো আজ আর রক্ষা নেই, স্বয়ং আজরাইলের পাল্লায় পড়েছে। অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে লেঠেলরা ঢাল-সড়কি মাটিতে ফেলে আত্মসমর্পণ করলো।

কৃষকেরা দৌড়ে গিয়ে ওদের অস্ত্র-সস্ত্রগুলো হস্তগত করলো। ইস্ যে এ অবস্থায় দু'চার খানা পড়লো না এমন নয়; কিন্তু অন্যেরা ওদের রক্ষা করলো। এর মাঝে দেখা গেল, ভাড়াটেদের এহেন দুরবস্থা দেখে প্রভুরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্ছে। আর যাবে কোথায়—মৌমাছির মত কৃষকেরা ছুটলো ওদের পিছনে; শুরু হলো গণ-ধোলাই, সে কি মার! মারের চোটে সংজ্ঞাহীন মেদবহুল দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ভাড়াটে লেঠেলদের চুল-দাড়ি যথেচ্ছভাবে কেটে তাতে আঁকুচোক করে ছেড়ে দেওয়া হলো।

কোন রকমে একটা চাষ শেষ করে কৃষকেরা যার যার মত কেটে পড়লো সবার মনে আতংক, কে জানে কিভাবে ওরা প্রতিশোধ নেবে।

★

বিনয়বাবুকে চিরাচরিত নিয়মে তাড়াতে গিয়ে শক্ত বাধা পেয়ে কৌশলে পিছিয়ে এলেন মধুবচনবাবু। বললেন, বিপন্মুক্ত, এভাবে আমাদের আর এগোনো ঠিক হবে না—তাহলে আগামীতে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়বে। আমাদের অন্যপথের খোঁজ করতে হবে।

ঃ শোনেন দাদা, এ সবের মধ্যদিয়ে একটা কথা জলের মত পরিস্কার হয়ে গেছে যে, এ সবই সত্যি সত্যি বিনয়বাবুর সৃষ্টি, যেটুকু সন্দেহ আমাদের ছিল এখন নিশ্চয়ই তা কেটে গেছে। ফলে, যে কোন প্রকারে, by hook or by crook ওকে তাড়াতেই হবে; যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল।

ঃ হ্যাঁ, ও যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে স্কুলের কোন ব্যাপারে আমাদের আর একটি কথাও বলার উপায় নেই। একটু কি করো বা বলো, সাথে সাথে মুখে হাত চেপে ধরবে, আর না হয় ধর্মঘট; এ যেন একেবারে মগের মুল্লুক।

ঃ মাষ্টারী না করলে যাঁর পেট চলে না তাঁর মাতব্বরি হজম করা যায় না; কিভাবে ওর একটা মোক্ষম ব্যবস্থা করা যায় তাই ভাবুন।

ঃ শোন বিপন্মুক্ত, বিনয়বাবুকে অত সহজভাবে বিচার করলে চলবে না আজ বিনয়বাবু যে কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে তার ফল হবে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী

আজ এই সমস্ত ছেলেরা রাজনীতি শিখে ভোটের সময় যদি ঝামেলা পাকায়, তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। আমরা যদি প্রমাণ না করতে পারি যে, এ অঞ্চলে আমরা যা বলি তাই ঠিক এবং আমাদের Candidate কে যদি পাশ না করাতে পারি, তাহলে উপরের দিকে আমাদের কোন হাতই থাকবে না। আর হাত না থাকলেই কুপোকাত। হাত না থাকলে সে স্কুলই হোক, আর ইউনিয়ন কাউন্সিলের নামেই হোক, কোন বড় দান মারা সম্ভব হবে না। আর এই দানই হোল আসল চাবিকাঠি। ওটা না হলে দৌড়াদৌড়ির জন্যে প্রয়োজনীয় পয়সাগুলো যেমন পাওয়া যাবে না; তেমনি অঞ্চলের লোকেও অকর্মণ্য-অপদার্থ ভেবে আর আমাদের ভোট দেবে না; এসব ভাবতে হবে। আর এ অবস্থা চলতে থাকলে দু'পয়সা এদিক ওদিক হলেই এ ধরণের ছেলেরা পকেটে হাত দিয়ে বের করে নেবে।

ঃ দাদা আরেকটা কথা, ক্ষেতে যারা জন খাটায় ঐ সমস্ত ধনী কৃষকরা কিন্তু বিনয়বাবুকে তাড়াতে সব এক কাট্টা। ওরা ভয় পাচ্ছে, ছাত্রদের পরে উঁনি যদি কৃষকদের ক্ষ্যাপান, বিশেষ করে এই যে সমিতি হয়েছে, ওর পিছনে ইন্ধন দেন, তাহলে ফ্যাসাদ বাঁধতে পারে। অনেকে আমার কাছে বিনয়বাবুর সব কথা শুনে সন্দেহ করে বসলো কৃষক সমিতিও হয়তো উঁনিই করেছেন। ওদের খুব ইচ্ছা বিনয়বাবুকে দূর করে দেওয়া হোক।

ঃ তাছাড়া আরও ব্যাপার আছে। শ্যামলের বাবার দাপটে গ্রামে এতকাল আমরাতো প্রায় একঘরে হয়ে ছিলাম। তোমরাতো কেউ তখনও এতদূরে এসব করতে আসতে না। শ্যামল যা শুরু করেছে তা যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে তোমার-আমার ছেলে-মেয়েদের ঐ একই দশা হয়ে পড়বে। শ্যামলের উপর দিয়ে কথা বলার ক্ষমতা কারুর থাকবে না। সুযোগ মানুষের জীবনে বারে বারে আসে না। আমাদের এখন এই সুবিধেজনক অবস্থা কাজে লাগাতেই হবে। শ্যামলকে এমনভাবে জব্দ করতে হবে যেন জীবনে ওর আর কিছুই করার অবস্থা না থাকে। তাতে আমাদের বর্তমান আর ভবিষ্যতের পথ পরিস্কার হয়ে থাকবে। ফলে, এখন একটাই কাজ, বিনয়বাবুকে তাড়াও, শ্যামল আর ওর দলবলকে কায়দা করে জালে ফেল।

পাকিস্তানের জংগী শাসকেরা কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করার পর কমিউনিষ্টরা NAP (National Awami Party)-এর পতাকাতলে এসে জমায়েৎ হন। রুশপন্থী NAP (মোজাফফর)-এর পিছনে সংশোধনবাদীরা

আর চীনপন্থী বলে কথিত NAP (ভাসানী)-এর পিছনে অন্যান্যরা এসে জমায়েৎ হয়ে কাজ করবার প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু বিপ্লবীরা বেশীদিন বাহাদুরের পেঁচোয় ধরা নেতার পিছনে নিজেদের আটকে রাখতে পারলেন না। মার্কসবাদের সাথে ইসলামিক সমাজতন্ত্রকে গলাধঃকরণ করতে গিয়ে বিপ্লবীদের গরহজমের সৃষ্টি হলো।

সাচ্চা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নেতা আবদুল হক সাহেব (যিনি অতি সম্প্রতি মাও-সে-তুং-এর তিন দুনিয়া তত্ত্বের বিরোধী আলবেনিয়ার প্রেসিডেণ্ট মিঃ হোজ্জার নির্দেশিত ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন) এ সমস্ত জগাখিচুড়িকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। গোপনে তিনি সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হক সাহেব ও তাঁর সংগঠনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৫২ সালের তেভাগা আন্দোলনের পীঠস্থান নড়াইলের এগারোখান ও ঝিনাইদহের বিপ্লবী জনগণ তখনও ক্ষমতাসীন সরকারের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তাই, জংগী সরকার যশোর নিয়ে উদ্বিগ্ন, বজ্রকঠিন মনোভাব এখানকার কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে।

পুলিশের দালাল মধুবচনবাবুর এসব তথ্য নখদর্পণে। বললেন, তুমি টাকা জোগাড় করো—কিছু চেয়ারম্যানের কাছে পেয়ে যাবে। আমি বলে দেব। বাকিট তোমাকে ঐসব জোতদার-মহাজনদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। চিন্তার কোন কারণ নেই—বিনয়বাবু সম্পর্কে একটু বাড়িয়ে বললেই দেখবে কেল্লাফতে। —এগুলি জোগাড় করো, তারপর তোমাকে নিয়ে আমি যাবো—দেখে আসবে কোথায় কি করতে হয়। তবে সাবধান, টাকা দিয়ে কোথায় কি হবে সে সব ব্যাখ্যা করে বলতে যেও না, গোপন রাখতে হবে।

টাকা-কড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিপন্মুক্তবাবুকে সঙ্গে করে মধুবচনবাবু সোজা (ডি) এস, বি অফিসে। ডি, আই (১) সাহেবকে স্লিপ পাঠাতেই উনি ডেকে পাঠালেন। চ্যালাকে সঙ্গে নিয়ে উ'নি জড়সড় হয়ে ঢুকে পড়লেন।

: সঙ্গে ইনি কে? —আপনি kindly একটু বাইরে গিয়ে বসুন। আমাদের কিছু confidential কথা আছে।

: না-না স্যার, ও ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই। আমি আজকাল আর একা পারিনে—বুঝতেই পারছেন। বয়স হচ্ছে আর তাছাড়া ব্যাটাদের উৎপাতটাও বাড়ছে, তাই সংগী একজন না হলে আর চলে না। আপনার

সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে সংগে এনেছি।

ঃ **All right, brave gentle man,** আপনার নামটা কি জানতে পারি?

ঃ আমি বিপন্মুক্তবাবু, উনার অঞ্চলেই আমার বাড়ী, স্থানীয় কলেজে প্রফেসারী করি।

ঃ নমস্কার, এতো একেবারে সোনায়-সোহাগা, safe position, সন্দেহের অনেক উর্দ্ধে, তাছাড়া চাকরীটা এমন information collect করাও খুব সহজ।

ডি, আই, সাহেবকে উৎফুল্ল দেখে মধুবচনবাবু হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, সেজন্যেই স্যার অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ওকে select করেছি। আর আপনার সাথে আলাপ করাতে সংগে নিয়ে এলাম।

অতঃপর মধুবচনবাবু আরম্ভ করলেন, —মশিয়াহাটী স্কুলের শিক্ষক বিনয়বাবু পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম, এল,)-এর একজন সক্রিয় কর্মী। ইতিমধ্যে স্কুলের ছাত্র শ্যামল বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটা শক্তিশালী দল তিনি ছাত্রদের মধ্যে গড়ে তুলেছেন। যারা মশিয়াহাটী অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু তাই নয়, আমি মনে করি ছাত্রদের মধ্যে এই যে অশুভ বীজ বপন করা হয়েছে এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। তাই, সরকারের উচিৎ অংকুরে এই দুষ্ট-ক্ষত বিনষ্ট করে দেওয়া। শুধু তাই নয়—এই বিনয়বাবু কৃষকদের নিয়ে এক কৃষক সমিতি গঠন করেছেন। যারা ইতিমধ্যে বে-আইনী-ভাবে জমি দখল শুরু করেছে। আপনাদের কানে পৌঁছেছে কি-না জানিনে কিছুদিন আগে এ ধরণের ঘটনা নিয়ে একটা বড় রকমের হাঙ্গামা হয়ে গেল। চার-পাঁচজনকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরা সবাই নিরীহ ভূস্বামী। কৃষক সমিতি এদের জমি জবরদখল করেছে। বিনয়বাবুর হুমকিতে ভয়ে এরা থানাতেও information দিতে সাহস করেনি। অবশ্য আমি গোপনে O. C. সাহেবকে report করেছিলাম।

ঃ এতকিছু ঘটনা ঘটেছে আমাকে এর আগে report করোনি কেন?

ঃ এতো মাত্র দু'চারদিন আগের ব্যাপার। তাছাড়া, যে অবস্থা আমরাও তো সাহস পাচ্ছিনে। ওরা আমাদের উপর নজর রেখেছে কি-না কে জানে!

ঃ আসামীদের পাবো কোথায়?

ঃ স্যার, ধরতে বেগ পেতে হবে না। যে কোন একদিন স্কুলের সময় ঘেরাও করলেই সবাইকে পাওয়া যাবে, একটাও পালাতে পারবে না।

ঃ ঠিক আছে, আপনারা এবার আসুন, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।

সদর দপ্তর থেকে সোজা থানাতে। কেমন আছেন দারোগাবাবু, খবর টবর সব কুশল তো? —মধুবচনবাবু ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করলেন।

আরে বসেন বসেন। আপনাদের ওপর নির্ভর করেই তো আমরা আছি যেমন রাখেন তেমনি থাকি। তা বেশ কয়েকদিন হলো এদিকে পায়ের ধূলো দিচ্ছেন না যে? —বলে দারোগাবাবু নড়ে-চড়ে বসলেন।

মধুবচনবাবু আর কথা বাড়ালেন না। এক শ' টাকার একটা নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, যা বলার ডি, আই, (১) সাহেবকে বলে এসেছি। উনিই সব ব্যবস্থা করবেন। এটা হলো শ্যামল সমেত ঐ চ্যাঙড়াগুলোর ঠ্যাং-এর দাম। ঠ্যাং যে কটা ভাঙতে পারবেন, সে ক'খানা নোটই আপনি পাবেন। —বলে ওদের নামের একটা তালিকা দারোগাবাবুর হাতে দিলেন।

দারোগাবাবু নোটখানা ভাঁজ করে পকেটে পুরতে পুরতে বললেন, চিন্তা করবেন না, ডি,আই, (১) সাহেব আজকালের মধ্যেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন। তারপর যা করার আমি করবো। আপনিতো জানেনই, নিমক্হারামী আমি করিনে

বিপন্মুক্তবাবু অবাক না হয়ে পারেন না। মধুবচনবাবুর আগাগোড়া সবই পরিচিত। এমন কি-Special branch-এর ডি, আই, সাহেব পর্যন্ত। অথচ তিনি M.A. পাশ করে এসেছেন। এস, বির নাম শুনলেও তিনি এদের কাজ সম্পর্কে জানতেন না, অফিসটা পর্যন্তও তিনি কখনও চেনেন না, অথচ এ অফিসের পাশেই তিনি তিন বছর হোস্টেল জীবন কাটিয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, এবার কি হবে?

মধুবচনবাবু তাঁর দাঁতশূন্য গালখানা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, অপেক্ষা করো চোখেই দেখতে পাবে। —অতঃপর মুখখানা গম্ভীর করে পকেটে হাত দিয়ে টাকাগুলি বের করলেন। একটা ছোট অংশ বিপন্মুক্তবাবুকে দিয়ে বললেন, রেখে দাও, পরে প্রয়োজন হলে ওর থেকেই খরচ করা যাবে।

বিপন্মুক্তবাবু ব্যাপারটা বুঝে গেলেন। এ টাকার সবটাই তাঁরই সংগৃহীত। তাই মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে তো অনেক টাকা রয়ে গেল!

ঃ দারোগাবাবুকে আরও কিছু দিতে তো হবেই; তাছাড়া কোথায় কি

াগে তার কি কোন ঠিক আছে ? তুমি একটু পোক্ত হও, তারপর সবই ানবে, এখন বোকার মত প্রশ্ন করো না। সাথে সাথে ঘুরে শিখে নাও, ারপর নিজেই বুঝতে পারবে কিভাবে টাকার শ্রাদ্ধ করতে হয়।

* * *

এদিকে আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন পর্যায়ে তার সংগঠন ছড়িয়ে দিয়েছে। ৪নং কুলটিয়া ইউনিয়ন কাউন্সিল তার ব্যতিক্রম নয়। অলকবাবু এই ংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

পার্টির কাজ করতে গিয়েই তিনি লক্ষ্য করলেন কর্ম্মীর বড় অভাব। গ্রামে কান ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে নেই। কিছু কিছু লেখাপড়া শিখে চাক্‌রী-বাক্‌রী বা জোগাড় করতে পারেনা, তারা অপেক্ষা না করে ক্ষেতের কাজে লেগে ায়। ফলে, দেওয়াল লিখন, পোষ্টার মারা আর কোন মিটিং এর প্রচারের ন্য মাইক ফুঁকানোর প্রয়োজন হলে একমাত্র ভরসা ছাত্রেরা। তারা তো আওয়ামী লীগের নামই শুনতে পারে না।

পার্টির উপর মহলের নির্দেশ ও নিজেদের আঞ্চলিক প্রয়োজনে অলকবাবুরা ঠে-পড়ে লাগলেন একটা ছাত্রলীগের সংগঠন গড়ে তোলবার জন্য। কিন্তু াকে নিয়ে তাঁরা ছাত্র সংগঠন গড়বেন! —সবাইতো ছাত্র ইউনিয়নের দস্য। ফলে, দল থেকে ভাগিয়ে আনাই একমাত্র রাস্তা।

অলকবাবুর অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিলনা। নেতা একজন তিনি খুঁজে পেলেন। াত্র ইউনিয়নের মশিয়াহাটী আঞ্চলিক সংগঠনের সহ-সভাপতি সুজয় বিশ্বাস। শিয়াহাটীর প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে খুলনা সিটি কলেজে B.Com. অধ্যয়নরত।

পাশ করে বেরোলেই মশিয়াহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার লোভনীয় টোপ, আর আগামীতে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা চন্তা করে নিজেকে সামলাবার মত অঘটন সে ঘটায়নি। ছাত্র ইউনিয়ন দস্যদের আনন্দ দিয়ে সে বিদায় নিলো।

ছাত্রনেতা সুজয় বিশ্বাস যে একাই দল ছাড়লো এমন নয়, তার সাথে বেরিয়ে গেল আরও জনা দশ-বারো আগাছা। ঐ আগাছা নিয়েই মশিয়াহাটীর কে ছাত্র লীগ নামে বিষ বৃক্ষের চারা রোপন করা হয়েছিল।

অতঃপর সদস্য যোগাড় করার জন্যে শুরু হলো অভিনব অভিযান।

প্রথমে মোড়লদের বাড়ীতে ছাত্রদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হলো, ছাত্রদে লজিং থেকে তাড়িয়ে দেবার হুমকি দেওয়া হলো। পুলিশের ভয় থেকে না খেতে দেবার ভয়; পড়াশুনা বন্ধ করে দেবার হুমকি থেকে পূজোতে জাম কাপড় না দেবার শাসানি। এভাবে অপরিণত বহু স্কুল ছাত্রকে জঘন্য উপায় ছাত্র লীগের সদস্যতে রূপান্তরিত করা হলো। ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, কখনো কখনও ছাত্র ইউনিয়নের ভুল পদক্ষেপের ফলে, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে কিছু সংখ্যক ছাত্র পুরোপুরি ছাত্র লীগের সদস্য বনে গেল

এভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগঠনকে দ্বিধাবিভক্ত কর হয়, ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতাকে ম্লান করে দেবার পরিকল্পনা রচিত হয় একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা নিজেদের ফায়দ লোটার পথ সুগম করে।

বিনয়বাবুকে তাড়াতে গিয়ে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি তথা এতদঞ্চলে জাঁদরেল জাঁদরেল মাতব্বরেরা মান-সম্মান খুইয়েছে, সে ঘটনা বেশ কিছুদি হলো। বিনয়বাবুর শুভাকাঙ্খী ও ছাত্রেরা সে ঘটনা ভুলে যায় নি, তারা আজ উৎফুল্ল। কিন্তু বিনয়বাবু জানেন এটা যেমন তাঁদের একটা সত্যিকারের জয় তেমনি এর সাথেই জড়িয়ে আছে তাঁর বিদায় নেবার কারণ।

বিনয়বাবু একদিন শ্যামলকে ডেকে বললেন, শ্যামল, তুমি আমার সব থেকে প্রিয় ছাত্র, বন্ধু ও সহকর্ম্মী। তোমাকে কতকগুলি কাজের ভার দেব আশাকরি তুমি তা যথাযথ পালন করার কোন ত্রুটি করবে না।

শ্যামল তাঁর ছাত্র ঠিকই, কিন্তু তাকে বন্ধু ও সহকর্ম্মী বলে সম্বোধন করা সে অবাক হয়ে গেল। কি বলতে চান বিনয়বাবু!

শ্যামল বললো, স্যার আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন।

বিনয়বাবু: আমি তোমাকে যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবো যেটা বলতে চাইবো না, আশাকরি তা নিয়ে তুমি পীড়াপীড়ি করবে না তোমাকে বন্ধু ও সহকর্ম্মী বলায় তুমি হয়তো অবাক হয়ে থাকবে। কি অবাক হবার কিছু নেই। —তোমাদের পাঠ দান করা হলো আমার একটা প্রধান কর্তব্য। আমি তা যথাসাধ্য চেষ্টা করি। সে দিক দিয়ে তোমাদে

সাথে আমার সম্পর্ক ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক। এর সাথে সাথে আমি মনে করি আমার অপর একটা প্রধান কর্তব্য তোমাদের কিছুটা রাজনীতি সচেতন করে তোলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই করার শিক্ষাদান। আমি সে চেষ্টা করতেও কখনও অলসতা করিনি। সে ব্যাপারে তুমি আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছ, আমার নিজ দায়িত্বের অংশ নিয়েছ, আমার আদর্শকে নিজের আদর্শ বলে মেনে নিয়েছ—একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে সেদিক দিয়ে তুমি এবং তোমরা অনেকেই আমার বন্ধু ও সহকর্মী।

যাই হোক, তারপর আসল কথায় আসা যাক। আমি সম্ভবতঃ আর বেশীদিন তোমাদের মাঝে নেই। যদিও আরও কিছুকাল তোমাদের মাঝে থাকবার একান্ত ইচ্ছা আমার আছে; কিন্তু জানিনা সে আশা আমার সফল হবে কি-না। সেজন্যে কয়েকটা কথা তোমাকে আগাম বলে রাখছি। —তুমি তোমাদের পাড়ার শান্তিরামকে চেন?

ঃ হ্যাঁ, ও আমার কাকা হয়।

ঃ লোকটা কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান। কৃষকদের মাঝে প্রায়ই এমনটি পাওয়া যায় না। তুমি ওদের সাথে একটু যোগাযোগ রেখে চলবে, আর সম্ভব হলে যোগাযোগটা একটু গভীর করার চেষ্টা করবে।

ঃ কাকার সাথে যোগাযোগ রেখে আমি কি করবো? ওদের নিয়ে আমার কি করার আছে?

ঃ ওরা একটা কৃষক সমিতি করেছে সেতো তুমি জানোই। তাই, ওদের সাথে যোগাযোগ রেখে, প্রয়োজনে ওদের তোমার সামর্থ্যানুযায়ী বুদ্ধি, পরামর্শ আর সাহস দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।

কতকগুলি জায়গা আছে সেখানে ওদের বোঝানো বেশ শক্ত, অথচ তুমি বেশ সহজেই বুঝতে পারবে। আমি তোমাকেই সেগুলি বলতে চাই, তুমি প্রয়োজনমত ওদের সেগুলি শিখিয়ে দেবে।

ঃ বলুন, আমি চেষ্টা করবো।

ঃ বলুন মানে ওদের তোমার কোন সংবাদ দিতে হবে না। ব্যাপারটা হলো, এই সমস্ত কৃষক-আন্দোলন সম্পর্কে তোমার একটা Idea রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে ওদের সংগে অংশ গ্রহণ করতে হবে। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি

দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলার প্রয়োজন।

ঃ ওরাতো কিছু দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। ভাঙাড়ের পনের-কুড়ি বিঘা জমি দখল করে সমিতির সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

ঃ হ্যাঁ, আমিও শুনেছি এবং তুমিও যে এর সাথে সক্রিয়ভাবেই আছ, সেটাও আমি জানি; ভাল কথা, খুবই ভাল কাজ। কিন্তু সমিতি কি পারবে এই সমস্ত দাবী-দাওয়া আদায় করতে, আর আদায় করতে পারলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ?

ঃ সে আমি আগে থাকতে নিশ্চিতভাবে কি করে বলবো !

ঃ সেটা তোমাকে জানতে হবে, তুমি যাতে আগে থেকেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারো তার জন্যে তোমাকে আমি কতকগুলি সাধারণ কথা শিখিয়ে দেব। আর বিস্তারিত জানতে হলে প্রচুর পড়াশুনা করতে হবে। কেন ব্যর্থ হতে হয় এবং কিভাবে জয়যুক্ত হতে হবে—এসব প্রশ্নের জবাব ও পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন মার্কস্, এঙ্গেল্স প্রভৃতি মনীষীরা। লেনিন, ষ্টালিন তাকে আরও বিকশিত করেছেন ও তার প্রয়োগ করে পরীক্ষিত সত্যে পরিণত করেছেন, বাস্তবে রূপদান করেছেন। মহান শিক্ষক ও নেতা মাও-সেতুং লড়াই এর আরও নতুন নতুন কায়দা সংযোজন করেছেন, আমাদের মত কৃষি নির্ভরশীল আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা উপনিবেশিক দেশে লড়াই এর অভিনব পথের সন্ধান দিয়েছেন। এসব জানতে হলে এঁদের দর্শন পড়তে হবে, জানতে হবে রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লবের দীর্ঘ ইতিহাস। ধৈর্য্য নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে, আগ্রহ রাখতে হবে, আর বুঝতে হলে বাস্তবে কাজ করতে হবে। পুথিগত বিদ্যের এখানে পাই পয়সা মূল্য নেই। হ্যাঁ, আর এর সাথে তোমাকে জানতে হবে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ব্যর্থতার দীর্ঘ ইতিহাস, সে সমস্ত ভুল থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

আজ যদি তুমি জানতে পারো কেন শান্তিরামেরা ব্যর্থ হবে, অথবা আংশিক সাফল্যলাভ করলেও করতে পারে। পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করলেও কেন তাদের জীবনে স্বচ্ছন্দ ফিরে আসবে না, তাহলে তুমি সে ভুল সংশোধন করে সঠিক পথের নির্দেশ পেতে পারো। তাই নয় কি ?

ঃ সেতো ঠিকই; ভুল বুঝতে পারলে তা সংশোধন করা যায়।

ঃ হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিকই। কিন্তু ওখানেও প্রশ্ন থেকে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল ধরতে পারলে সংগে সংগে তা শুধরে নেওয়া যায়। কখনও কখনও দীর্ঘ সময় লেগে যায়। আর কোন কোন ক্ষেত্রে ভুলের খেসারত দিতে হয় অত্যন্ত মারাত্মকভাবে। ইতিহাসে এমন নজির আছে। এই নক্‌শাল বাড়ীর সশস্ত্র আন্দোলনের কথাই ধরো না—সে সব পরে জানতে পারবে। তবে এক কথায় ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা যায় এবং সেটাই উচিৎ।

কৃষক সমিতির এই আন্দোলন কখনও সফলতা অর্জন করতে পারে না। তার কারণ, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার বড়লোকের সরকার। জোতদার-মহাজনদের স্বার্থ দেখবার জন্যেই এই সরকার ও তার পুলিশ-মিলিটারী রয়েছে। এই অবস্থায় তোমরা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করবে এটা সরকার বরদাস্ত করবে না। এই আন্দোলন নস্যাৎ করে দিতে প্রয়োজনে তারা বর্বরোচিত অত্যাচার চালাবে।

তাছাড়াও এইসব আন্দোলনের মধ্যদিয়ে কিছু কিছু দাবী-দাওয়া আদায় করা সম্ভব হলেও তাতে কৃষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারো — আজ বন্ধকী জমি ফেরৎ নেবার জন্যে ওদের আন্দোলনের পথে নামতে হচ্ছে কিন্তু একদিন তো ওদেরই ছিল ঐ জমি। কেন সেদিন বন্ধক দিতে হয়েছিল—তাহলে ফিরে পেলেও আগামীতে আবার বন্ধক দিতে হবে না তার গ্যারান্টি কি? —আসল ঘটনা হলো অর্থনীতির সাথে দেশের রাজনীতির নিকট সম্পর্ক। রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না, আর দেশের মানুষের অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আসবে এটা কখনও হয় না। আজ গ্রামে একজন বা দু'জন শাসন ও শোষণ করে সমস্ত গ্রামবাসীকে, তেমনি দশজন অথবা পনেরোজনে শাসন ও শোষণ করে সমগ্র দেশবাসীকে। যদি গ্রামের লোকে পেট ভরে খাবার চায় তাহলে ঐ এক-দু'জনের প্রভাবমুক্ত হতে হবে, ওর কাছ থেকে শোষণমুক্ত হতে হবে, ওর ক্ষমতাকে নস্যাৎ করেই একমাত্র সেটা সম্ভব। এই একজন বহাল তবিয়তে থাকবে, আর গ্রামের মানুষ খাবার পাবে, এটা হয় না। তেমনি দেশের মানুষকে খাবার

পেতে হলে, অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসক ঐ দশ-পনেরোজনকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে হবে, ওদের প্রতিপত্তি নস্যাৎ করে দিতে হবে, ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে, খাবার তো তারপরেই পাওয়া সম্ভব, তার আগে তো নয়! তুমি কি সমিতির সেদিনের সভায় যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তার শেষাংশের অর্থ বুঝেছ? —ভাল করে দেখে নিও।

তাই, কৃষক সমিতির এইসব আন্দোলনের পরিণতির জন্যে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এইসব আন্দোলনের মধ্যদিয়েই গড়ে তুলতে হবে জংগী গণ-সংগঠন, ঐক্যবদ্ধ করতে হবে কৃষকদের, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি নিতে হবে।

অবশ্যই সাথে সাথে এ ভাবলে অতি মারাত্মক ভুল হবে যে, তাহলে এইসব সমিতি, সংগঠন ও আন্দোলন করে কোন লাভ নেই। এ চিন্তা মোটেই সঠিক নয়—কিছু কিছু অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায় করতে পারলে কৃষকদের কষ্ট সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা লাঘব হবে। কৃষকেরা এইসব আন্দোলনের মধ্যদিয়েই লড়াই করার মেজাজ ফিরে পাবে, লড়াই করতে অভ্যস্ত হবে, অত্যন্ত বাস্তবভাবে ধরতে পারবে শোষণের মূল জায়গাটিকে, চিনতে পারবে শত্রু ও মিত্রকে, এর মধ্যদিয়েই বেরিয়ে আসবে সত্যিকারের যোদ্ধা ও শিক্ষিত হয়ে উঠবে শ্রেণী চেতনায়।

তোমাকে এইসব কাজের দায়িত্ব নেবার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বর্তমান অবস্থায়। তুমি হয়তো জানো না, এইসব কৃষক আন্দোলন তথা গণ-আন্দোলন সমূহের সঠিক নেতৃত্ব যারা দিতে পারতো সেই কমিউনিষ্ট পার্টি অত্যন্ত দুর্বল, নিয়ামক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। তারপরেও ইতিমধ্যে তাঁদের প্রায় সমস্ত নেতাই কারান্তরালে অন্তরীণ হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায়, স্থানীয়ভাবে হলেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে কৃষকেরা তাদের ন্যায়সংগত আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। সম্ভব হলে কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে একটা যোগসূত্র সৃষ্টি করা কৃষকের সাথে শ্রমিকের একটা যোগাযোগ গড়ে তোলা, যাতে করে কৃষক আন্দোলনের সাথে শ্রমিকেরা ও শ্রমিক আন্দোলনের সাথে কৃষকেরা একাত্ম বোধ করে। একে অপরকে বুঝতে শেখে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে যৌথভাবে

নৈতিক আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। তুমি লমানুষ হলেও এ কাজে আমি একমাত্র তোমার ওপরেই ভরসা করতে রি।

আরও একটি বিষয়ে তোমাদের বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে। মানে আওয়ামী লীগ জনগণের মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে ওদের কায়েমী র্থ চরিতার্থ করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। তাদের সম্পর্কে জনগণকে র্ক করা এক গুরুদায়িত্ব। আমি জানি, তোমরা জনগণকে নিবৃত্ত করতে রবে না। কিন্তু মনে রাখবে, কমিউনিষ্ট পার্টি তথা সচেতন মানুষ নৈতিকভাবে অজ্ঞ জনসাধারণের সাথে আবেগের স্রোতে গা ভাসিয়ে য় না বরং তাদের সঠিক পথে পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করে। ি, আওয়ামী লীগ যে প্রকৃত শত্রুকে জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করবার খ্য উগ্র জাতীয়তাবাদের ফাঁকা বুলি তুলে পশ্চিম পাকিস্তানকে আসল ত্রু বলে জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে চাইছে এটা পরিস্কারভাবে তুলে তে হবে। স্বায়ত্বশাসন আর পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ করে নয়, মন্তভান্ত্রিক আর ঔপনিবেশিক শোষণ থেকেই মুক্তি যে প্রকৃত মুক্তির একত্র পথ এ সত্য তাদের বোঝাতে হবে। আওয়ামী লীগের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রিয়া-কলাপ যে সর্বহারা বিপ্লবের একমাত্র নেতৃত্ব দানকারী মহান চীনকে মরিকভাবে ঘিরে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশ এটা বোঝাবার ন ব্রত পালন করতে হবে।

তোমার জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। সম্ভবতঃ তোমাদের ত্র সংগঠন, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), ছাত্র ফ্রন্ট থেকে নিজেদের গুটিয়ে চ্ছে। ছাত্র-রাজনীতি থেকে নিজেদের গুটিয়ে সরাসরি রাজনীতিতে অংশ বার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাদের নেতৃবৃন্দ। আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য ন করি এটা একটা বিপজ্জনক ঝুঁকি। তাই, তোমাদের সংগঠন নিশ্চয়ই ভেঙে দেবার নির্দেশ আসছে। আমি তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দেব, গঠন ভেঙে গেলেও ছাত্রদের মাঝে কাজ করতে ভুলে যেও না। নিজেদের ধ্য সর্বদা যোগাযোগ রেখ, আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেও।

তোমাকে এবংবিধ কাজের দায়িত্ব দেবার অর্থ এই নয় যে, তুমি পড়াশুনা

শিকেয় তুলে রাজনীতি করো, সে নির্দেশ তোমার সংগঠন দেবে। এগুলে তোমাকে এ সব বলছি এই কারণে যে, এখানে তোমাদের একটা আঞ্চলি সুবিধা আছে। সাথে সাথে তোমার আছে ব্যক্তিগত সুযোগ — এগুলে M.M. বা B.L.College-এর ছাত্রদের নেই—যা তারা পেতে চাচ্ছে

এটুকুই আজ তোমাকে আমার বলার ছিল। পরবর্তীকালে যতদি আমি থাকছি, সময় ও সুযোগ পেলে বুঝিয়ে বলবো। তুমিও তোমার ঘনি বন্ধুদের বোঝাতে চেষ্টা করো। আর বিশেষ কোন প্রশ্ন এসে পড়লে প্রয়োজ মনে করলে আমাকে জানাবে, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা বুঝিয়ে দিতে।

শ্যামল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনলো। এ লাইনে বি কিছু তার আগেই জানা ছিল, তাই মূল বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হলো না মাথা নেড়ে বললো, ঠিক আছে স্যার, আমি অবশ্যই কাজ করবো—আম এ কাজ এমনিতেই খুব ভাল লাগে।

* * *

শ্যামলের বাবা প্রতিদিন নির্দিষ্ট জল চৌকিতে বসে থাকবেন সন্ধ্যা হ যতক্ষণ ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করে। তাঁর আসনখানি পড়ার টেবিে একেবারে সামনাসামনি। চৌকিতে বসে হেলান দেন কাঠের বেড়াটা মাথার তেল লেগে লেগে জায়গাটা একেবারে কাল হয়ে গেছে। টেবি প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের ওপর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখেন তিনি। পড়াশুনায় ফাঁ দেবার কোন সুযোগ তিনি ছেলে-মেয়েকে দেন না। রাত্রিবেলা কোন লেখ কাজ চলবে না—ওগুলো সকালে। মনে মনে পড়া নিষিদ্ধ—রাতে খা পরতো একেবারেই নয়। তার কারণ, উনার ধারণা শব্দ করে না পড় মনোযোগ থাকবে না, বাইরের কথাবার্তা কানে যাবে, আর ঘুম আসে ঘুমের চোখ কারুর দেখলেই আদেশ হবে উঠে গিয়ে মুখে-চোখে জল দি আসার, ঘুম পালাবে। পারতপক্ষে বাবার তাড়া খেয়েই ওদের ঘুম পালি যায়। জলের প্রয়োজন গৌণ হয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে একমাত্র শ্যামলের জন্যেই তাঁর এত সতর্কতার প্রয়োজ ফাঁকি দিতে পারলে কখনও সে পড়াশুনার ধার ঘেষবে না। অন্যান্যগুলো

নিয়ে অতটা চিন্তা করতে হয় না উনার।

শ্যামল বাবার তাড়া খেয়ে গুন্ গুন্ করে পড়া আরম্ভ করে, আবার কখন সে থেমে যাচ্ছে নিজেই বুঝতে পারছে না ওর বাবা বুঝতে পারলেন শ্যামল অন্যমনস্ক। তাই হুংকার ছাড়লেন, শ্যামল, পড়াশুনার সময় অন্যমনস্ক কেন? —এদিকে এসো। ওকে সংগে নিয়ে রান্না ঘরের পাশে এসে মাকে ডেকে বললেন, শ্যামল স্কুল থেকে ক'টায় ফিরেছে?

মা : আজ ও অনেক দেরীতে বাড়ী ফিরেছে।

বাবা : শ্যামল, ছুটির পর তুমি কোথায় ছিলে?

শ্যামল : কই মা, আমিতো আজ বেশী দেরী করিনি।

মা : তুই তো আজ সন্ধ্যার একটু আগে বাড়ী এসে খাবার চেয়েছিস্, তার বন্ধুরা তো অনেক আগে এসেছে।

মা মাঝে মাঝে সত্যি-মিথ্যা বলে শ্যামলকে বাবার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়, আজও সে ঐ ভরসাতেই মাকে সাক্ষী মেনেছিল, সাক্ষী বিগড়োতে দেখে হতাশ হলো, বললো, ছুটির পর বিনয়বাবুর কাছে Biology-এর কয়েকটা প্রশ্ন দেখে নিলাম তাই একটু দেরী হলো।

শ্যামলের বাবার আর বুঝতে বাকী রইল না — কেন সে অন্যমনস্ক। বললেন, বিনয়বাবুর কাছে Biology দেখে নেবে সেতো ভালই। কিন্তু তুমি যে পড়াশুনার কোন ব্যাপার নিয়ে শিক্ষকদের কাছে যাবে, এটা আমি বিশ্বাস করিনে। বিনয়বাবুর সাথে যুক্তি করে নিশ্চয় কোথাও কোন গোলমাল পাকানোর ফন্দী করেছ। বিনয়বাবু ভাল শিক্ষক, সবার শ্রদ্ধার পাত্র, তুমি তাঁর সাথে পড়াশুনা নিয়ে আলাপ করবে, তাতে আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তুমি তা আদৌ করো না। সেজন্যে তোমাকে নিষেধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি আর বিনয়বাবুর সাথে বিশেষভাবে মিশবে না। ভদ্রলোকের ক্রিয়াকলাপ আমাদের মনে এখন সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

ছেলেবেলায় তুমি যে জ্বালাতন করেছ, তাতে অন্য যেকোন বাড়ীতে হলে তোমার লেখাপড়া আদৌ হতো না। কখনও কখনও তোমাকে টাকা দিয়ে জন কিনে তাদের দিয়ে তাড়িয়ে ধরে তারপর স্কুলে পাঠাতে হয়েছে। স্কুল, যাবে না বলে, তালগাছের মাথায় চড়ে বসে থেকেছ, তোমার মেঝদা

একদিন তোমাকে গাছ থেকে নামাতে গিয়ে অতটা উঁচু থেকে পড়ে গেল, আর আমাকে যা ছুটতে হয়েছে তার বর্ণনা আর কিভাবে দেব! চামড়ার পা বলেই আছে, অন্যকিছু হলে এতদিনে ক্ষয়ে যেত। কিন্তু তবুও আমরা, আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যাতে তোমার লেখাপড়ার আগ্রহ জন্মায়। তখন তুমি ছোট ছিলে, এ অসহ্য আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু এখন তুমি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছো—তোমার বোঝা উচিৎ। আজ তুমি বিনয়বাবুর যুক্তিমত নিশ্চয় এমন কিছু করবে না — যারজন্যে তোমাকে পুলিশে ধরবে, জেল খাটবে, শাস্তিভোগ করবে এবং সেই সাথে সাথে আমাদের ভোগান্তির একশেষ হয়। আর আমাদের বাধা-নিষেধ, আমাদের কথা যদি তুমি না শোন আমাদের করার কিছুই নেই। তবে এটা ঠিক যে, এ বাড়ীতে থাকতে হলে, এখানে দু'বেলা খেতে হলে আমার কথামত চলতেই হবে; নতুবা এ বাড়ী ছাড়তে হবে — এর কোন বিকল্প নেই, সেটা তুমি নিশ্চিত জেনো।

শ্যামল তার বাবাকে ভাল করেই চেনে। তাই, একান্ত নিরুপায় না হয়ে পড়লে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চায় না। বাবার এ নতুন কায়দায় শাসানিতে সে কিছুটা ঘাবড়ে গেল। বুঝতে পারলো ভিতরে ভিতরে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটেছে অথবা ঘটতে চলেছে। পুরোপুরি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আস্তে আস্তে কেটে পড়লো।

শ্যামলের মা বিনয়বাবুকে খুবই স্নেহ করেন। ছাত্রদের তিনি যেমন শাসন করেন, পড়া আদায় করেন, তেমনি যত্নও করেন। যারজন্যে ছাত্রেরা তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। ব্যবহার খুবই ভাল, বিনয়ী, পরিপাটী, কথা বলেন ধীরে ধীরে একেবারে গুছিয়ে, বয়স্কদের তিনি সম্মান করতে জানেন—এ সবেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা শ্যামলের মার নিজের আছে। তাই, শ্যামলকে বিনয়বাবুর সাথে মিশতে বারণ করায় তিনি অবাক না হয়ে পারেননি। স্বামীকে বললেন, আমাদের গার্ল'স্ স্কুলের প্রত্যেকটা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এমনকি ছাত্রীরাও বিনয়বাবুকে ঐ স্কুলের সব থেকে ভাল শিক্ষক ও ভদ্রোলোক বলে জানেন। এইতো গতকালও কথা হচ্ছিল আমাদের Common room-এ, তুমি ছেলেকে ওর 'সাথে মিশতে বারণ করলে? —আমিতো ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না!

শ্যামলের বাবা রাগতস্বরে বললেন, বুঝবে, দুদিন বাদেই সব বুঝবে

-যখন কোমরে দড়ি দিয়ে পুলিশে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। আর ঐ সাথে নিজের ছেলেটাকেও যেন এক দড়িতে না গাঁথে তারজন্যে সময় থাকতে সজাগ হও।

শ্যামলের মা একেবারে অবাক; কিছুই বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা, কিন্তু ওর বাবার মেজাজ দেখে তখনকার মত চুপ করে গেলেন।

তারপর মাত্র কয়েকদিন কেটেছে। ভোর বেলায় পাশের গ্রামের একটা ছোট ছেলে শ্যামলকে একটা চিঠি এনে দিল। চিঠিতে লেখা—

প্রিয় শ্যামল,

তুমি ও তোমার কয়েকজন বন্ধু যাদের স্কুল কর্তৃপক্ষ ও মোড়লেরা প্রীতির চোখে দেখে না, তারা আজ স্কুলে আসবে না; আসলে কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে আমি খবর পেয়েছি।

তোমাদের সাথে আর কতদিনে দেখা হবে জানিনে, তবে আমি আশাবাদী, নিশ্চয়ই আগামীতে কোন এক সময় দেখা-সাক্ষাৎ হবে।

মধুবচন, বিপন্মুক্ত, অলকবাবু সমেত আরও কয়েকজন মোড়ল সম্পর্কে সতর্ক থেকো। প্রথম দু'জন আজ সব থেকে মরিয়া।

আশাকরি, তোমরা তোমাদের দায়িত্ব যথাযথ পালনে ত্রুটী করবে না।

ধন্যবাদান্তে ইতি—

তোমাদের সাথী

বি, বিশ্বাস।

চিঠি পড়ে শ্যামল স্তম্ভিত হয়ে গেল। বুঝতে পারলো সোজা কাজের প্রত্যুত্তর আসছে পিছনের বক্রপথে। তাই কৌশলে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। কিন্তু নিজকে আজ অত্যন্ত অসহায় মনে হলো। এতদিন বিনয়বাবু ছিলেন, উনার কাছে গিয়ে ভরসা পাওয়া যেত, বুদ্ধি, সাহস সবই মিলতো; আজ বিনয়বাবু তাদের ছেড়ে চলে গেলেন!

বিনয়বাবুকে চিরাচরিত পথে তাড়াতে না পেরে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে ওরা। নিশ্চয় থানা প্রভৃতি স্থানে বিনয়বাবুর নামে মিথ্যা কেস্ করেছে—যার চাপে তিনি পালাতে বাধ্য হন। সেই সাথে হয়তো আমাদেরও কয়েকজনকে ওরা জড়াতে পারে। কারণ, ওরা আমাদের হাতে অপদস্থ হয়েছে

বহুবার — শ্যামল এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিলো।

যাহোক, শ্যামল সাইকেলটা বের করে নিয়ে দ্রুত চলে গেল বন্ধুদের বাড়িতে বাড়িতে। সবাইকে সংবাদটা জানিয়ে আবার বাড়ি ফিরে এলো। তখন স্নানের সময় হয়ে গেছে। পুকুর পাড়ে গিয়ে তার হঠাৎ খেয়াল হলো — ওরাতো জেনে যেতে পারে কৃষক সমিতি তৈরী করার পিছনে বিনয়বাবু আছেন, আর তাহলে শান্তিরাম কাকা, দীনদারও বিপদ হতে পারে ও ছুটলো। শান্তিরামের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলো সে দূরের হাটের পথে বেরিয়ে গেছে। দীননাথকে পেয়ে বললো, দাদা, খেয়াল রেখো, আজ হয়তো পুলিশ আসবে। কিন্তু তোমাদের সমিতির নেতাদের ধরবার জন্যে, না অন্য কোন কারণে তা বলতে পারবো না, তাই তোমরাও একটু সাবধান থেকো।

দীননাথ : খিডা কয়চে তোরে, আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমাগে ধরবার জন্যি ৮ মাইল শুতোয়ে পুলিশ আসপে — বলে হাসলো।

শ্যামল : হয়তো একেবারেই আসবে না। কিন্তু বলাতো যায় না। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওরা তোমাদের খোঁজেই এসেছে। তোমরাতো জোট বেঁধে স্থির করেছ জোতদারদের সংগে লড়বে, ওরাতো সে কথা জেনে যেতে পারে। পুলিশ ওদের পোষা, তোমাদের জব্দ করার জন্যে ওদের ডাকতেও পারে, মোটেই অসম্ভব নয়। আসলে ঘটনা হলো, সময়টা বেশী ভাল যাচ্ছে না, একটু সাবধান হলেতো কোন ক্ষতি নেই, না কি?

দীননাথ : তুই ভাইডি আবার একটা চিন্তা বাধায়ে দিলি। এহন ঘোন ঘোন ক্ষেতের দিরি চাতি হবেনে।

বিনয়বাবুর সংবাদ নির্ভুল। বেলা তখন ১টা, দু'গাড়ী ভর্ত্তি পুলিশ স্কুলের সামনে নেমে চট্‌পট্‌ স্কুলটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো। স্কুলের ছেলেরা তখন সবাই ক্লাসের মধ্যে। প্রথমেই দারোগাবাবু হেডমাস্টারের কাছে জানতে চাইলেন বিনয়বাবু কোথায়? হেডমাস্টার জানিয়ে দিলেন — তিনি অনুপস্থিত স্কুলে আসেননি। দারোগাবাবু অতঃপর পনেরোটি ছেলের নামের একটা তালিকা বের করে হেডমাস্টারের হাতে দিয়ে বললেন, ডাকুন ওদের।

হেডমাস্টার দপ্তরি পাঠিয়ে প্রত্যেকের খোঁজ নিলেন, কাউকেই পাওয়া গেল না। দারোগাবাবু বিশ্বাস করলেন না। হেডমাস্টার হাজিরা খাতা এনে মেলে ধরলেন কিন্তু দারোগাবাবু নাছোড়বান্দা। বললেন, হতেই পারে না, আমরাই খোঁজ নেব।

হেডমাস্টার কাউকে না পেয়ে ঘাবড়ে গেছেন। দারোগাবাবুর অনমনীয় মনোভাবে একেবারে হতভম্ব। কে জানে কার কোমরে দড়ি উঠবে—কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোলো না।

গট্‌গট্‌ শব্দে তারা ঢুকে গেল স্কুলের ভিতরে। ছাত্রেরা আগেই টের পেয়েছিল, এবার ওদের ঢুকতে দেখে সবাই পালাবার চেষ্টা করলো। শুরু হলো চিৎকার চেঁচামেচি, ছুটোছুটি, হৈ-হুল্লোড়। বেশ কয়েক জনকে ওরা ধরলো। শিক্ষকের কোন অনুমতি না নিয়েই পুলিশ ক্লাসের মধ্যে ঢুকে বেছে বেছে দু'চারজনকে ধরেছে; দোতলা বাড়ির আশেপাশের গাছ বেয়ে নেমে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লো অনেকে। দৌড়ে পালানো ছেলেদের সন্দেহ করে তাড়িয়ে ধরছে।

দারোগাবাবু সদলবলে বাধা পেলেন মৌলভী সাহেবের কাছে। উনি দশম শ্রেণীতে পড়াচ্ছিলেন। বললেন, ক্লাসে ঢুকবেন না কেউ।—বজ্র কঠিন নির্দেশ। মৌলভী সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে দারোগাবাবু কাবু হয়ে গেলেন। মৌলভী সাহেবকে চিনতে দারোগাবাবুর অসুবিধা হলো না। উনি ইত্তেফাকের একজন রিপোর্টার সে কথা একবার ভেবে নিলেন। নিজেকে সংযত করে বাধ্য ছেলের মত বললেন, আচ্ছা, আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।

ধৃত কাউকে দারোগাবাবু তার তালিকার কোন সদস্য বলে সনাক্ত করতে পারলেন না। দারোগাবাবু বুঝলেন, সংবাদ আগেই ফাঁস হয়ে গেছে। কতকগুলো দুধের শিশুর কাছে হেরে গিয়ে দুর্দান্ত প্রতাপ দারোগাবাবু মাথা চুলকাতে চুলকাতে গাড়ীতে উঠলেন — হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল কতকগুলো সবুজ রং-এর কড়্‌কড়ে নোট।

পুলিশের গাড়ী, ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। রাস্তার ধুলো তখনও আকাশকে ভারী করে রেখেছে; শ্যামল সদলে এসে হাজির হলো। স্কুলের

ছেলেরা ততক্ষণে ভয় কাটিয়ে উঠেছে, মাঠের এদিকে ওদিকে জটলা করছে, আর নিজ নিজ বাহাদুরী আর কৃতিত্বের ব্যাখ্যা করছে।

শ্যামলের ডাকে সবাই এগিয়ে এলো। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সে আক্রমণ করলো সরকার ও তার পুলিশ বাহিনীর গণবিরোধী চরিত্র, আর নপুংসক হেডম্যারের অকর্মণ্যতাকে—তাঁর পদত্যাগ দাবী করা হলো। মৌলভী সাহেবের ন্যায়পরায়ণতা, সাহসিকতা ও ছাত্র-প্রেমকে স্বাগত জানানো হলো, জানানো হলো আন্তরিক অভিনন্দন।

শ্যামল উপস্থিত ছাত্র ও জনতার প্রকাশ্য সভায় অত্যন্ত সঠিকভাবে এতদঞ্চলের কিছু কিছু তথাকথিত মোড়লদের ঘৃণ্য চরিত্র উন্মুক্ত করে তুলে ধরলো। সভায় শেম্ শেম্ আওয়াজ উঠলো। সে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলো ওরা কিভাবে সবার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিনয়বাবু ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র পূর্ব থেকে শুরু করে আজও চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সমস্ত কিছু কিছু তথাকথিত মোড়লদের মশিয়াহাটীর কলঙ্ক বলে আখ্যা দেওয়া হলো এবং তাদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে নিন্দা করে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে, ন্যায়সংগত আন্দোলন ও ছাত্র-শিক্ষকের ওপর এই বর্বরোচিত আক্রমণকে মশিয়াহাটীর জনসাধারণ বরদাস্ত করবে না, ষড়যন্ত্রকারীদের এর বিনিময়ে চরম মূল্য দিতে হবে।

সেদিনের মত স্কুল ছুটি হয়ে গেল। ছাত্রেরা একে একে বাড়ী ফিরে গেল। শ্যামল তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে মাঠের শেষ প্রান্তে গিয়ে বসলো। বললো, বিনয়বাবু হয়তো আর স্কুলে কোনদিন আসবেন না, আমাদের সাথে আর কখনও দেখা হবে কি না তা কেউ বলতে পারি না। কিন্তু আজ আমাদের কাছে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে গেছে, বিনয়বাবুকে এখানকার মোড়লদে একটা অংশ অত্যন্ত ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে তাড়িয়ে দিল, এই গুটি কয়েক মাতব্বরকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, তাদের উচিৎ পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করতে হবে। তা যদি আমরা না পারি, তাহলে আমরা প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হবো আমরা বিনয়বাবুকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি তার আদর্শকে।

আমাদের নিজেদের বিপদটাকেও ছোট করে দেখলে চলবে না। বিনয়-বাবু বাইরের মানুষ, শিক্ষক, অন্য কোথাও তিনি চলে যেতে পারেন, সেখানে

তুন করে নিজের কাজ শুরু করতে পারবেন কিন্তু আমাদের সে পথটাও বন্ধ। আমাদের কথাই ধরো না; যদি কোন অঘটন আজ ঘটে যেত, তাহলে অবস্থা করে দেখতো যার যার নিজের অবস্থা! তাছাড়াও আজ আমাদের এভাবে বন্দ করার অর্থ হলো, মশিয়াহাটীর ন্যায়সংগত আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া, মশিয়াহাটীকে আরও কয়েকটা বছর ওদের লীলানিকেতনে রূপান্তরিত করা। এটাকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। সবার আগের কর্তব্য হবে, আমাদের মধ্যের মোড়ল নামধারী পুলিশের দালালগুলোকে খুঁজে করে বের করা ও তাদের স্বরূপ জনগণের সামনে তুলে ধরা, ওদের নিরস্ত না করতে পারলে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা মশিয়াহাটীর মানুষ, মশিয়াহাটী আমাদের প্রাণ, লড়াই করেই আমরা মশিয়াহাটীতে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাস করবো, মাথা উঁচু করে চলবো।

মহেন বললো, তোর ওসব লম্বা লেক্চার এখন থামাতো। মোড়ল-গুলোকে ধরে আচ্ছামত ধোলাই দেওয়া যায় কিভাবে তাই চিন্তা কর; ওসব প্যান্প্যানানি সব সময় ভাল লাগে না।

শ্যামল: না, তুই যা বলছিস্ সেটা ঠিক হবে না। তোর মত্ মত বললে বা করলে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ আমাদের ধরে ঠ্যাঙাবে। আগে সবাইকে বোঝাতে হবে ব্যাপারটা, তাদের সামনে ওদের চরিত্র ফাঁস করে দিতে হবে। জনগণ থেকে ওদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। দেখবি, ঠ্যাঙানি আমাদের দিতে হবে না, সাধারণ লোকেই ঠ্যাঙাবে। আর তা না করে আজ যদি আমরা ধরেই ঠ্যাঙানি শুরু করি বা রাতের অন্ধকারে মাথা ফাটাই, সেটা হবে গুণ্ডামী—সেটা করলে ওদের সাথে আমাদের পার্থক্য রইলো কোথায়? তাতে লোকে আমাদের ঘৃণা করবে, আমরা আস্থা হারাবো; পরোক্ষে ওদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে সাহায্য করা হবে।

: কিন্তু পুলিশে যদি আজ আমাদের ধরতে পারতো?

: আমাদের এ ধরণের নির্যাতন সহ্য করার জন্যে সব সময় নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে। ত্যাগ ছাড়া কিছু গঠন করা সম্ভব নয়। তবে ধরতে যাতে না পারে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে। আর ধরতে যখন পারেনি, আমাদের সামনে একটা মস্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এটাকে আমাদের ব্যবহার

করতে হবে। প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী গিয়ে বোঝাতে হবে ওদের ঘৃণ্য ক্রিয়াকলা হাতে নাতে ফল পাওয়া যাবে আমার বিশ্বাস। আর অবস্থা যদি শেষ পর্য তেমনি হয় যে অন্য কোন উপায় নেই, প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থাতো নিতে হবে, সেটাও মাথায় রাখতে হবে।

ঃ কিন্তু কে করলো সেটাতো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

ঃ বিনয়বাবু চিঠিতে স্পষ্ট লিখেছেন মধুবচন আর বিপন্মুক্তবাবু এ করেছেন, উনি নিশ্চয়ই জানেন।

ঃ তা না হতেও তো পারে!

ঃ তোর মাথায় গোবর পোরা। তুই ভাত খাস্, না ঘাস খাস্, তা নি আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিনয়বাবু যদি না জানবেন কে করেছে তাহ কি করে জানবেন যে ওরা আজই ধরতে আসবে?

মহেন এবার বিজ্ঞের মত মাথা নাড়লো, বললো, বিনয়বাবু না লিখলে আমি জানি এ কাজ করার মত লোক এ তল্লাটে ওরাই আছে আর বিনয়বা ওপর আমরা অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে পারি, তিনি অত ফালতু লোক নন সঠিক না জেনে একটা যা-তা খবর লিখে দেবেন। তাহলে আর দেরী ক যায় না, কি কি করতে হবে কাল থেকে শুরু কর। তারপর ও দুটোর ঠ ভাঙার দায়িত্ব আমার, ওদের এমন অবস্থা আমি করে দেব যাতে বারা থেকে আর নামবার ক্ষমতা না থাকে।

শ্যামল ঃ কাল থেকেই টিফিনের পর আর কোন ক্লাস নয়, স্কুলের সম ছাত্রেরা মিলে এক একটা দিনে একটা করে গ্রাম ঘুরতে হবে। দাবী রাখ হবে ওদের বিচারের ব্যবস্থা করার জন্যে নতুবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আম কেউ স্কুলে ক্লাস করতে যাব না। ওদের বিচারের দাবী যাতে জোরদার হ ওঠে তার জন্যে প্রচার চালাতে হবে।

★

সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সমিতির অফিস ঘর ছাপিয়ে সামনের ফাঁ জায়গাটুকু ভর্ত্তি হয়ে গেল কৃষকদের ভিড়ে। আজকের মিটিং-এ শুধু কুলটিয়া গ্রামের কৃষকেরাই হাজির হয়নি, আসে পাশের সাত-আটটি গ্রা কিছু কিছু করে নেতৃস্থানীয় কৃষক এই মিটিং-এ হাজির হয়েছে। সুজাত

াখাইডাঙ্গা, মহিষদিয়া, আলিপুর, পোড়াডাঙ্গা, হাটগাছা, বাজেকুলটিয়া, নহালপুর প্রভৃতি সমস্ত গ্রাম থেকেই কৃষকেরা হাজির হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কাল বেলার ঘটনা সর্বত্র বিদ্যুতবেগে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রত্যেকের মনে ালোড়ন সৃষ্টি করেছে। সবার মনে প্রশ্ন এরপর কি?

অনেক কৃষকের জমায়েৎ। বসে বসে কথা বললে সবাই শুনতে পাবে া। তাই দীননাথ সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললো, আজ আমাগে ইচে ছিল জমিতি দখল নেব। সগলের মিলিত চেষ্টায় তা আমরা করিচি। এতে প্রমাণ হয়ে গেচে আমরা জোট বান্দে অনেক শক্ত কাজও সহজে করে ফলাতি পারি। যাই হোক, একাজে আমরা জিতে গিচি, এহন কালকে চয়ালেই ধান বুনে দিতি হবে, দেরী করা ঠিক হবে না—কি কও তুমরা সগলে? বাই চিৎকার করে দীননাথের কথায় সম্মতি জানালো। কিন্তু বীজ ধান নতি চালিই বুনা হয়ে যাবেনা—বীজির দরকার—তা জুগাড় করতি হবে। কি এরে তা জুগাড় হবে তা যুক্তি করার ব্যাপার। তবু আমার মনে হয় গেলের কাচতে যে যিরাম পারে, নিয়ে, এক জাগায় জমাতি হবে। সে গেল, কিন্তু তার আগে, অন্য গ্রামের মেলা মানুষ হাজির হয়চে আজ। উরা ধায় কিছু কতি পারে, উগে কথা আগে শুনা দরকার—উরা আমাগে সাথে যাগ দিয়ে সুহালে মেলা কষ্ট করেচে। সে দায় শান্তিরাম কাহা তুমি কিছু ও কি দিয়ে কি করা যাবে।

শান্তিরাম দাঁড়িয়ে বললো, তুমরা সগলে জানো, কয়দিন হলো আমাগে লির মাষ্টের বিনয়বাবু আর পুনারো-ষোল জন ছাত্রর-বাত্তররে পুলিশি ধরতি াসে—কিন্তু ধরতি পারেনি। তার পরেরতে প্রায় দৈনিক পুলিশ আস-তছে উগে-ধরতি। উগে পুলিশ কেন ধরতি আসে, আর উগে নামে কস্ই বা কেন করলো, তাকি তুমরা কেউ জানো? —না, আমরা তা ঠিক ঠক কেউ জানিনে। তা আমরা ইডাতো জানি উরা কেউ চোরও না া ডাহাতি করেও বেড়ায় না। আর আমাগে মধ্যিরতে কেউ উগে নামে কস্ না করলি পুলিশি উগে নামই বা জানবে কি এরে! —তাই ইডা ঝা যাচ্চে ন্যায়-অন্যায় বড় কথা না। মোড়ল-মাতব্বর আর এইসব জোতদার-হাজনগে সাথে যারা গণ্ডগোল করবে, দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করবে, াগে জব্দ করার জন্যি এই সরকার আর তার পুলিশ-মিলিটারী আছে।

তা না হলি চুরি-ডাহাতি দিন দিন বাড়েই যাচ্ছে, এট্টু রাত হলি আর হাট-ঘাটেরতে বাড়ী ফেরা মুশকিল হয়ে গেচে, তাতে পুলিশির মাথা ব্যথা নেই, ডাকলিউ পাওয়া যায় না। আর এহন দ্যাহ কাদা ঠাঙায়ে চলে আসতেচে আট-দশ মাইল। আর এইসব ছেলে-পুলেগে জন্যি যে সব মাতব্বরগে স্কুলির টাহা, ইউনিয়নের সাধারণ মান্ষির টাহা পকেটে পুরতি ঝামেলা হচ্চে তারা করতেচে পুলিশির দালালী, ইগে সব ধরায় দিতি উঠে-পড়ে লাগেচে।

তাই, আমরা যা করতিচি তারজন্যিও পুলিশ আমাগে ধরবার জন্যি তাড়া শুরু করতি পারে। আজ হোক, আর তুইদিন পরে হোক তা করবেই। এই ধর আমরা আজ হ্যানে মিটিং করতিচি, পুলিশ যে আহানে আসে পড়তি পারে না একথা আমরা কেউ জোর দিয়ে কতি পারিনে। সেইজন্যি আমার মনে হয়, রাস্তার তুইদিকি তুই-চারজন থাহা ভাল, যাতে পুলিশ আসতেচে খবর পালি আমরা সরে পড়তি পারি।

শান্তিরামের যুক্তিমত কয়েকজন অল্প বয়স্ক কৃষক পাহারা দেবার জন্যে তুইদিকে রাস্তা ধরে অনেকদূর এগিয়ে গেল। সভার কাজ আবার শুরু হলো—শান্তিরাম পাশের গ্রামের কৃষকদের সমিতির উদ্দেশ্য, দাবী ও নীতি এবং দাবীগুলো আদায়ের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বোঝালো। সমিতির দাবী-দাওয়া যে শুধুমাত্র একটা গ্রামের কৃষকদের দ্বারা আদায় করে নেওয়া সম্ভব নয়, তা ব্যাখ্যা করে পরামর্শ দিল প্রত্যেকটি গ্রামে কৃষক সমিতি গড়ে তোলবার জন্যে এবং অবশেষে প্রত্যেক গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা আঞ্চলিক সমিতি গড়ে তুলে যৌথভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে।

প্রত্যেকটি গ্রামের কৃষকেরা কৃষক সমিতিকে স্বাগত জানালো। তারা কথা দিলো তু'-চার দিনের মধ্যেই নিজ নিজ গ্রামে সমিতি করে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করবে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিলিতভাবে ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্যে, নিজেদের বাঁচবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অন্যান্য গ্রামের কৃষকদের উৎসাহ আর আগ্রহে সমিতির মনোবল আরও বেড়ে গেল। মিটিং আর দীর্ঘ না করে সবাই বীজ ধান জোগাড় করবার জন্যে গ্রামে বেরিয়ে পড়লো।

জমিতে বীজ দেবার আগে এখানকার কৃষকদের যথেষ্ট চিন্তা করতে
া, সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। খুপনি, নাতোল, বাহোই, হাসা, নড়োই
ভৃতি আউশ ধানের বীজ; আমন ধান হলো বয়রা, খ্যাসাল, বীরপালা,
লবিড়ে, আন্ধারমানিক প্রভৃতি। এদের গাছগুলোর চেহারা যেমন আলাদা,
ন্ন ভিন্ন এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন রকমের পরিবেশ প্রয়োজন এদের
ধিক ফলনের জন্যে। সেজন্যে, আসছে বছর কোন্ সময়ে কি ধরণের
াকৃতিক পরিবেশ বর্তমান থাকবে তা অনুমান করেই কৃষকদের জমিতে
জ দিতে হবে—প্রকৃতিকে অনুশীলন করার এ এক কঠিন সাধনা!

নড়োই আউশ ধানের বীজ, এটা একটা অগোতি ধান। অন্যান্য
কোন আউশ ধান থেকে এটা পাঁচ-দশ দিন আগে ফুলে বেরোবেই।
লে, এগুলোকে বপন করতে হবে অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে; যেখানে একটু
ৰ্ষা হলেই জল জমবে। এছাড়া নড়োই ধানের বীজ সে বছরই জমিতে
ড়ানো হবে, যে বছর বছরের শুরু থেকেই প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।
ভুবা শুকনো জমির ওপর গাছগুলো হু-হু করে বেড়ে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে
ধাড় হয়ে ফুলে বেরোবে, বর্ষার জন্যে অপেক্ষা করবে না। ধানের গোড়ায়
ল নেই, ফলে ধানে হবে প্রচুর পরিমাণে চিটে, পুষ্ট হবে না, বাল (শীষ)
বে ছোট, ফলন একেবারে কমে যাবে।

ঠিক এর উল্টো, যে বছর প্রথম দিকে বর্ষা বেশী হবে, সে বছর
দি ভুল করে জমিতে খুপনি ধান বপন করা হয়, তবে ডুবে মরবে।
কারণ, নাবি (যেগুলো দেরীতে হয়) ধানের বীজ বলে এর চারা বাড়বে ধীরে
ধীরে, ফলে ছোট থেকে যাবে এবং সহজেই অতি বর্ষণে ডুবে যাবে।

এতদঞ্চলের বেশীর ভাগ জমিতে আউশ ও আমনের বীজ মিশিয়ে বপন
করা হয়, এটাকে সানানো বলে। সমস্ত বীজের দুই-তৃতীয়াংশ আউশের বীজ ও
বাকী এক-তৃতীয়াংশ হলো আমনের বীজ। এর কারণ হলো, আউশের বীজ
অল্প সময়ের মধ্যে বেশীতে পরিণত হবার স্বল্প সুযোগ পায়। কিন্তু পর্যাপ্ত
সময় ও জায়গা পাওয়ার জন্যে বীজ এক-তৃতীয়াংশ হলেও আউশ কেটে
নেবার পর আমন বড় বড় গোছায় পরিণত হয়ে জমিটাকে ভরিয়ে তুলতে
সম্পূর্ণ সক্ষম হয়। অংকুরোদগমের পর হতে আউশ-আমন একান্ত

প্রতিবেশীর মত বাড়তে থাকে। কিন্তু বীজের সহজাত প্রবৃত্তির বশবর্তী হ কোন কোন আমনের চারা কিছু কিছু আউশের চারাকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্র করে, ফলে এ জাতীয় মিশ্রণ সম্পর্কে কৃষককে সাবধান হতে হবে এ বীজগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে যত্নে রক্ষা করতে হবে।

প্রাকৃতিক প্রভাব আমন ধানের ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে প্রযোজ্য যে বছর মোট বৃষ্টিপাত বেশী হবার সম্ভাবনা সে বছর কৃষকেরা বয়রা অথ খ্যাসালের বীজ বুনবে। কারণ, এরা প্রচুর জল ভাঙতে পারে, অতি বর্ষা ডুবে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু হিসাব যদি ভুল হয়ে যায় অর্থা বৃষ্টিপাত যদি কম হয়, তাহলে ধানের বদলে গাছপালা হবে বেশী, বাস্ হয়ে যাবে। প্রচুর পল হবার জন্যে গরুর খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে কি ফলন বলতে যা বুঝি তা নৈব নৈব চ। বিপরীতক্রমে, অল্প জলে বীরপাল পলবিড়ে প্রচুর ফলন দেবে কিন্তু অতি বর্ষণে শল্যুরে খোকার মত জল খে মরবে।

অপর আর একটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার প্রতি অত্যন্ত সজা দৃষ্টি রাখতে হবে, তার নাম ঝরা। অন্যান্য অঞ্চলের জমিতে আগাছা হিসা দেখা যায় দূর্বাঘাস, ভাদ্‌লা, শামা ইত্যাদি। কিন্তু এখানকার জমিতে অত বিভিন্ন ধরণের আগাছার বালাই নেই। এক আছে চেঁচো, যা ফসলে জন্যে যেমন অত্যন্ত ক্ষতিকারক নয়, পরিস্কার করাও সহজ; অন্যটা হলো ঝরা

ঝরা আর কিছুই নয় এক ধরণের ধান। সবই হুবহু এক, পার্থ হলো পরিপূর্ণভাবে পাকার মুহূর্তে স্যমান্য ঝাঁকাতে ঝরে পড়ে যায়, শীষে কংকালটা ভারমুক্ত হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় নিল মেয়েদের মত।

এগুলোর জন্ম হয় একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। চাষের সময় কিছু কি বীজ কোন কোন সময়ে মাটির একটু বেশী নীচে চলে যায়। এবং স্বাভাবি পরিবেশ না পাওয়ায় গজিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। এভাবে ওগুলো মাটি নীচে দুই-তিন-পাঁচ বছর অথবা আরও বেশী সময় পড়ে থাকায় পর কো কারণে ওরা কিছুটা উপরের দিকে উঠে আসবার সুযোগ পেলেই স্বাভাবি পরিবেশ পেয়ে গজিয়ে উঠতে সমর্থ হয়। কিন্তু ততদিনে সমাজচ্যুৎ হ

ওরা ওদের স্বাভাবিক, সহজাত ধর্ম খুইয়ে ফেলেছে, কবরে দীর্ঘদিন শুইয়ে রাখার প্রতিবাদে ওরা মালিকের ঘরে আসতে অস্বীকার করে। এবং ওদের বংশধরেরা রক্তের চিরন্তন সম্পর্ক ছেদ করতে পারে না। এদের বর্ণ এক, (ধানের সংগে) স্বভাব আলাদা।

এরা কৃষকদের সামনে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। খুব ভাল কৃষক না হলে এদের চারাগুলো ধানের চারা থেকে পৃথক করতে ব্যর্থ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ সম্ভব নয় অথবা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করায় ওদের পৃথক করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ তথা ব্যয়সাধ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

সেজন্যে অন্ততঃ বিগত পাঁচ-সাত বছর কোন্ কোন্ ধানের বীজ কোন্ কোন্ জমিতে বোনা হলো, তার হিসাব রাখতে হয়। পর্যায়ক্রমে এমন বীজ জমিতে বুনতে হবে, যা বিগত বছরগুলোতে বোনা বীজের কোন চারা গজালে এক নজরে ধরে ফেলা সম্ভব হয়। মোদ্দাকথা ধানের চারার চেহারা আর ঝরার চেহারা হবে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের—এটা এমনিতে হবে না, ভাগ্য, কপাল বা নিয়তির দ্বারা নয়—হবে কৃষকের নিবিড় অনুশীলনের ফলে।

কিন্তু আজ কৃষকদের অত সব ভাববার সূত্র, উপায়, সময় বা সুযোগ নেই। যে বীজ যতটা জোগাড় করা সম্ভব হবে, তাই বুনতে হবে।

রাতের বেলাতেই প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বীজ সংগ্রহ শুরু ও শেষ করা হলো। যার বাড়িতে যে বীজ পাওয়া গেল তাই নেওয়া হলো, সে যত অল্পই হোক। কেউ দিল বীরপালা, পলবিড়ে, কেউবা বয়রা, খ্যাসাল, কালাজিরে, যার যত উদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্ত হবার সম্ভাবনা। আলাদা আলাদা ধামাতে সেগুলো সংগ্রহ করা হলো।

আউশ ধানের বীজ নেওয়া হলো না। কারণ, তাহলে কাটবার জন্যে দু'বার ঝামেলা করতে হবে। আমনের বিভিন্ন জাতের বীজ জমিটার এক একটা অংশে বুনে দেওয়া হলো।

একে একে দশ-পনেরোটি গ্রামে কৃষক সমিতি গঠন হলো। সমিতিতে গ্রামের অধিকাংশ গরীব কৃষকেরা যোগদান করলো। কুলটিয়া গ্রামের কৃষকদের মতই, প্রত্যেকটা গ্রামের কৃষকেরা ভাগাড় ও খাস জমিগুলো দখল করে চাষ করে ফেললো। কোথাও কোথাও জো না থাকায় বীজ দেওয়া

সম্ভব হয়নি, তাই অপেক্ষা করা হচ্ছে বর্ষার জন্যে, জমিতে অল্প জল জম
সাথে সাথে আগাছা সাফ করে বাওড়া (ধানের চারা) এনে রোপন করা হবে
আগামীদিনের লড়াই-এর জন্যে জোর প্রস্তুতি চললো।

সমিতিতে যোগদান করলো নেহালপুরের বাবুদের শেষাংশ, যারা বংশে
শিক্ষিত সাহেবদের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করে কলকাতায় পাড়ি জমায়নি
সরলপ্রাণ নিরীহ লোকগুলো সাহেবদের প্রতারণায় আজ সর্বস্বান্ত ; তারা আপ
করে পেয়েছে দীননাথদের মত নিঃস্বদের। নেহালপুরের বহু মুসলমান কৃষ
সক্রিয় ভূমিকা নিলো সমিতিতে। হিন্দু-মুসলমান, উঁচু জাত, নীচু জাতে
কোন প্রভেদ এদের মনে নেই। সবার একই সমস্যা, তাই কাঁধে কাঁ
মিলিয়ে লড়াই করার সংকল্প, সবাই যেন ভাই ভাই।

কৃষকদের মধ্যে এই জাগরণ দেখে ধনী কৃষক, জোতদার আর মহাজনে
ভীত হয়ে পড়লো। তারাও গোপনে ষড়যন্ত্র করে চললো, কিভাবে এ
আন্দোলন ভেঙে দেওয়া যায়, জব্দ করা যায় নেতাদের।

সন্ধ্যার অন্ধকারে শুরু হলো মন্ত্রনাসভা। কয়েকটি গ্রামের রুই-কাতল
সব একত্র হলো।

ঃ আমাকে সেদিন পিটিয়েতো মেরেই ফেলতো, কপাল জোরে বেঁ
আছি। তাই, আমি এর উপযুক্ত প্রতিশোধ না নিয়ে কোনমতেই ছাড়ব
না। যদি আমার সর্বস্ব খোয়াতে হয়, তবুও আমি পিছ্‌পা হবো না।

ঃ জব্দ করতে গিয়ে ঐ রকম উল্টে পিটুনী খাবার দলে আমি নে
টাকা-পয়সা লাগবে তা আমি দেব, কিন্তু সামনে যাবো না। এইতো সে
দিনও বিনয়বাবু না কি একটাকে তাড়াতে একশ' টাকা দিলাম, ভুর হ
গেছে সে, চ্যালাগুলোকেও ধরবে, বেশী দেরী নেই।

ঃ আমি কি আর সামনে যাবো ভেবেছ, ও বাবা! ন্যাড়া আ
বেলতলায় যায় না। বেঁচে গেছি, আর না। ওরা এখন সব এক কাট্টা। অ
কিভাবে কি করা যায়, তাই ঠিক করতে হবে।

ঃ শোন বেয়াই, জনের দাম যদি বাড়াতে হয়, তা একটু বাড়া
পারো, আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু বন্ধকী জমি ছাড়তে হলে একেবারে সর্বনাশ

ঃ দেখ, আমার একটা কথা আছে। তোমরাতো জানো তোমা

ত ঐ ধূলো ঘ্যাটাঘ্যাটি আমার সহ্য পায় না, ধানের ধূলো নাকে গেলে ড়ড কাশি হয়। সেজন্যে ঐ বন্ধক-টন্ধকের মধ্যে আমি নেই। তাই বলে ানের দাম বাড়াবে, আর জমি ছেড়ে দেবে তাতে আমার আপত্তি আছে। ামরা ওদিক দিয়ে টাইট দেবে, আর আমি চড়া সুদে ধার দেবো, সুদের রিস্কার চক্‌চকে ধান বাড়িতে পৌঁছে দেবে, ওসব ধূলো উড়োবার কারবার র। তোমরা একটু একটু ছাড়বে, আর আমার ব্যবসা যাবে; ঐ সব হবে । আর ঐ ব্যাংকের টাকা যাতে না পায়, তারজন্যে তোমরা যদি কোন ষ্টা না করো, তাহলে এর মধ্যে আমি নেই।

ঃ হ্যাঁ, তা বুঝলাম, কিন্তু ওরা যদি জমিতে এসে লাঙল জোড়ে, তোমার ছু করার আছে? —কিচ্ছু করার নেই, আমরাতো সব ঠুঁটো জগন্নাথ। ড়িতে পাল পাল ছেলে-পুলে, কিন্তু লাঠি ধরবার কেউ না। এসব আগে কতে ব্যবস্থা নিতে হবে। দেখছো তো, স্কুলের কতকগুলো চ্যাঙড়া খুব াফালাফি করতো, এখন আর স্কুলেই যেতে পারছে না। দু'দিন গ্রামে ামে খুব ঘুরলো, মিটিংও একটা আট গ্রামের লোক নিয়ে ডেকে দিল, ন্তু আগে থাকতেই পুলিশ হাজির, সব ভেস্তে গেল। মধুবচন আর বিপন্মুক্ত-র লেজের কাছেও যেতে পারলো না।

কিন্তু বিয়াই, ওরা যদি আর মিটিং না ডেকে বাড়ি চড়াও হয়েই লাই শুরু করে, তখন কি হবে? মিটিংতো না হয় পুলিশ এনে ভেস্তে ওয়া গেল, সব সময়তো আর হাতের কাছে পুলিশ পাওয়া যাবে না! আর শুনলাম, ওরা এখন সেই রকমই ভাবছে, সবাই জেনে গেছে এসব কাজ-কুকাজ সব ঐ দু'জনের।

ঃ বাড়ি চড়াও হবে? —তাহলেতো লুট কেসে পড়ে যাবে! একেবারে লায় বড়শী আটকে যাবে, চার-পাঁচ বছরের কমতো নয়ই।

ঃ না বিয়াই, অত লাফিও না, এখনও সাজা হয়নি। সাজা হয়তো ব, কিন্তু তুমি-আমি দেখে যেতে পারবো কি-না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; দিনের হরিতলার ঘটনাতো চোখে দেখনি!

ঃ তোমরা সব চুপ করোতো। ওসব পাঁজিগুলোকে কিভাবে জব্দ তে হয়, তা তোমাদের মাথায় খেলবে না, আমার যুক্তি শোন—সন্ধ্যেবেলায়

নিজেদের কারুর কোন একটা ছোট ঘরে আগুন লাগাতে হবে ; সকাল বেলাতেই ঘর পোড়ানো কেস্, নির্ঘাত বিশ বছর। তাতে একদিকে যেমন কারুর ওপর চড়াও হবার ভয় থাকবে না—আর চার-পাঁচ নয়, একেবারে বিশ বছর। —বলে তারিফ পাবার জন্যে সকলের মুখের দিকে তাকালো।

কিন্তু গোল বাঁধলো কার ঘরে আগুন ধরানো হবে। পরে যদি জানাজানি হয়ে যায় যে, নিজেরাই আগুন লাগিয়ে মিথ্যে কেস্ দেওয়া হয়েছে, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। ঘরওয়ালার পরেই আসবে প্রথম আঘাত, ফলে ঘণ্টাটি বাঁধবে কে!

কিন্তু পুরনো ঘি মাখিয়ে টানলেও কুকুরের লেজ কখনও সোজা হবার নয়। এত ভীতি সত্ত্বেও পরজীবিগুলি একপা পিছোতে প্রস্তুত নয়, কৃষকদের জব্দ করতে দৃঢ় সংকল্প। উপায় উদ্ভাবন সম্ভব হলো না, তাই স্থির হলো—নাটের গুরু মধুবচনবাবুর শরণাপন্ন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি নিশ্চয় কোন ত্রুটিমুক্ত পথের সন্ধান দিয়ে কার্য সিদ্ধি করতে পারবেন।

পুলিশের চাপ এতদিনে ধীরে ধীরে কমে এসেছে। শ্যামল ও তার বন্ধুরা খাকী পোষাকের দুর্ব্বলতা কাটিয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে রাত কাটানোর সাহস ফিরে পাচ্ছে। নিজেদের কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে তারা মধুবচনবাবু ও তাঁর সাগরেদদের একটা আঘাত করার চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে।

পুলিশের সন্ত্রাস ধীরে ধীরে দূর হবার সাথে সাথে অঞ্চলের সমুদয় ভীতি ক্রমে ক্রমে এসে কেন্দ্রীভূত হলো মধুবচনবাবু আর বিপন্মুক্তবাবুর অন্তরে। বিপন্মুক্তবাবু পূর্ব বাংলার হিন্দুদের তীর্থ, ভারত ভূমিতে স্থায়ীভাবে চলে এসে পিঠ বাঁচালেন।

এদিকে গ্রামের প্রত্যেকটি লোককে মধুবচনবাবুর সন্দেহ, সবাই বুঝি তাঁর অপকীর্তিকে জেনে গেছে, সবাই হয়তো তাঁকে ঘৃণা করে, তাঁর দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকায়। এ যেন ঠিক চোরের মন "হয় ভাঙা বেড়ায়, নতুবা পুলিশ পুলিশ" তদনুরূপ।

মধুবচনবাবুও নিজের ওপর আস্থা রাখতে অক্ষম হলেন। অনুকরণ করলেন অনতিপূর্ব শ্যামলদের অবস্থাকে। কিন্তু শিষ্য যেন গুরুদের বড্ড বেশী অতিক্রম করে গেলেন!

বিকেল হতে না হতেই মধুবচনবাবু চলে যান কিছু দূরের মুসলমান গ্রামে

যেখানে তার কিছু পুরোনো ছাত্রের বাড়ী—ওখানে রাত কাটিয়ে সকাল বেলায় আবার ফিরে আসেন।

এভাবে কর্মব্যস্ত নিয়মমাফিক দিনগুলো তাঁর ভালই কাটছিল। ইতিমধ্যে তাঁর উপর অর্পিত হলো কৃষক সমিতির আন্দোলনকে ভেঙে দেবার ও নেতাদের নিশ্চিহ্ন করার মহৎ দায়িত্ব।

মধুবচনবাবুর পায়ের তলায় ব্যথা, আর পারছেন না সকাল-সন্ধ্যে পুরোনো ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করে, ছাত্রেরাও তিক্ত-বিরক্ত। উনি চিন্তা করলেন, এ বাজীটা যদি মাৎ করা যায় তাহলে রথ দেখাও হবে, কলা বেঁচাও যাবে।

একবার চিন্তা করলেন, মনাবাবুর হাত থেকে বাজার রক্ষা করতে গিয়ে মাসের পর মাস টাকা গুনতে হচ্ছে, অথচ সন্ধ্যের আগেই গ্রাম ছেড়ে পালাতে হয়। বয়সটাও এসবের জন্যে বড্ড তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে, যৌবনের সময়-সীমা গুটিয়ে আসছে যেন বিদ্যুৎ গতিতে। ফলে, পাঁজীগুলোকে জালে আটকে তুলতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর যদি একান্তই ফসকে যায়, তাহলেও পুলিশের উৎপাতে ওরা পালাবে, অস্থায়ী ভাবে হলেও পায়ে একটু মাটিতো মিলবে! অন্য দিকে Two paise income-এর একটা রাস্তাও তৈরী হবে। শুরুতেই মিলবে মোটা অংকের সেলামী। তাছাড়াও মাঝে মধ্যে পুলিশ তো আসবেই, ধরবে গ্রামের নিরীহ লোক। তখন একমাত্র ভরসা এই মধুবচন। দু'পক্ষের মধ্যে দর কষাকষির সুযোগে কিছুতো মিলবেই। আর গ্রামের লোকের কাছে নিজের ইমেজটাও বড় হবে।

মধুবচনবাবু এ ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হলেও বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। বললেন, দেখ, একাজের ঝুঁকি অনেক, জানাজানি হয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। কিন্তু তোমরা যখন বলছো, না বলতে পারিনা, মাতব্বরি করার এইতো অসুবিধা! তাছাড়া থানা থেকে এত দূরের কেস, আজকাল আর দারোগাবাবু নিতেই চায়না, নিলেও তেমন গুরুত্ব দেয় না। বড়বাবুও নতুন, সহজে লাইনে আসতে চায় না; ফলে, কতদূর কি করতে পারব বলতে পারছি না।

সবাই খুব অনুরোধ-উপরোধ শুরু করলো, তোষামোদেরও অন্ত নেই। বললো, আপনি চেষ্টা করলে হয় না এমন কাজ কি আছে কিছু? আপনি নিশ্চয় পারবেন। তবে হ্যাঁ, টাকা-কড়ির জন্যে আপনি ভাববেন না, ওজন্যে আমরা আছি। গোলায় ধান যতক্ষণ আছে, আর আছে পৈত্রিক সম্পত্তি—আমরা

পিছোবো না। এই নিন আগাম—বলে একটা নোটের তোড়া গুঁজে দিল। ম
বচনবাবুর মুখে অবশেষে হ্যাঁ শব্দ বেরোলো এবং সবাই নিরস্ত হয়ে বাড়ি ফিরা

মধুবচনবাবু আশাতীত অংকের দানটা হাতে পেয়ে কোন সংগী রাখার
বোকামী করলেন না। সুযোগের জন্যে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকলে
বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না, সুযোগ মিলে গেল ; একেবারে সুবর্ণ সুযো

পাশের গ্রামে এক ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেল। যথাসর্বস্ব নিয়ে গে
ডাকাতরা, বেদম মারপিট করেছে ছেলে, বুড়ো ও মেয়েদের। টাকার খোঁ
বলতে অস্বীকার করায় গৃহস্বামীকে গায়ে পাট জড়িয়ে তাতে কেরোসিন ঢে
পুড়িয়ে মেরেছে। বাড়ির মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করার সংবাদও শেষ প
গোপন রাখা সম্ভব হয়নি।

চেঁচামেচি শুনে কয়েক গ্রামের লোকজন ছুটে আসে। মধুবচনবাবুও জানে
মস্ত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও রাতের বেলা বের হবার সাহস দেখাতে তিনি রা
ছিলেন না। ফলে, ভোরবেলায় একেবারে হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে হাজির হলেন
একটা বড় আসন পেলেন। পুলিশ, কেস্ ও কোর্ট-কাচারী সম্পর্কে তাঁর
বিজ্ঞজন আর কেউ নেই এতদঞ্চলে অথবা অন্যকেউ এসব নিয়ে চর্চা ক
না। ফলে, তিনিই প্রধান উপদেষ্টা।

এমতাবস্থায় বাড়ির লোকজনের মানসিকতা কি হতে পারে সহজে
অনুমেয়। চিন্তা-শক্তি তাদের একেবারে লোপ পেয়ে গেছে, সবার ক
থেকে পেতে চাচ্ছে আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা।

পুরুষানুক্রমে পাশাপাশি বাস করে গ্রামের লোকের সামাজিক বন্ধন
অত্যন্ত দৃঢ়। একের সাহায্যে অন্যে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করে না, এরে
দুঃখে অনেকেই দুঃখবোধ করে, মর্মাহত হয়, বিপদে জান-প্রাণ দিয়ে এগি
আসতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে গ্রামে
ছেলেরা ডাকাতদের বাধা দিতে এগিয়ে আসে। একজন গুলিবিদ্ধ হ
আশংকাজনক অবস্থায়, অনেকেই ছোট-খাট আঘাত পেয়েছে। উপস্থি
মেয়ে-বুড়োদের চোখে জল, যুবকেরা নিজেদের অক্ষমতার জন্যে লজ্জি
প্রতিকারের কোন উপায়ের জন্যে উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু মধুবচনবাবুরা প্রকৃতির ব্যতিক্রম সৃষ্টি। স্বার্থান্ধ, হীন এই লোকগু

অলৌকিক ক্ষমতার (?) অধিকারীও। প্রত্যেকেই এদের চেনে, চরিত্র জানে, স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, আবার প্রত্যেকেই এদের ফাঁদে পা দেয়।

এ অবস্থায় যা কিছু করার দায়-দায়িত্ব পড়লো মধুবচনবাবুর ওপর। তিনি গৃহস্বামীর ভাইকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিভৃতে—এসব ব্যাপার প্রকাশ্যে আলোচনা করলে শত্রুদের সুবিধা হয়ে যাবে। প্রশ্ন করলেন, চিনতে পারলে কাউকে?

ঃ না, সবার মুখ ঢাকা ছিল, চেনার কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া, ঐ সময় চেনাও সম্ভব নয়।

ঃ তোমার নিশ্চয় কাউকে কাউকে সন্দেহ হয়।

ঃ দেখুন মধুবচনবাবু, গ্রামে শত্রুর সংখ্যা আমাদের নিতান্ত কম। তবে, নিজের স্বার্থে কেউ কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারে না এমন নয়, কিন্তু, সেগুলো কি আর সন্দেহ করে বলা যায়?

ঃ তা ঠিক, কিন্তু একটু চিন্তা করলে মোটামুটি একটা idea করা যায়, আর ঐ idea টুকু অন্ততঃ পুলিশকে দিতে না পারলে দোষী খুঁজে বের করা যায় না।

ঃ কেন, আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?

ঃ দেখ, তোমাদের মত সরলপ্রাণ মানুষকে ফাঁকি দেওয়া যত সহজ, আমাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া ততটা নয়। আমার ওপর যদি আস্থা রাখতে পারো, দোষীকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করে দেব।

মধুবচনবাবু ডাকাতদের অত্যাচারের বর্ণনা নিজের রসে সিক্ত করে, কথার ফাঁকে ফাঁকে ব্যবহার করে ওকে চাঙা করে তোলবার সফল প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। মেয়েদের ওপর অত্যাচারের ইংগীত দিতেই ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল—এটাও তাহলে লোকে ধরে ফেলেছে! আর এরপর ঐসব নিয়ে একটা এস্‌ফার-ওস্‌ফার না করলে লোকে আমাদের পুরুষত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। তিনি বললেন, আপনি কি করতে বলেন? —আমার সব লুঠ হয়ে গেলেও জমিজমাতো আর নিয়ে যায়নি!

ঃ তোমার কিছুই করতে হবে না, সন্দেহজনক কয়েকজনের নাম টুকে দেবে, বাকীটুকু পুলিশে করে নেবে। তবে তো জানোই, আজকাল দু'চার পয়সা না ছাড়লে পুলিশের গায়ের ব্যথা কমে না, নড়তে-চড়তে চায় না।

ঃ সেজন্যে আপনার চিন্তা করতে হবে না; আপনার কাকে কাকে সন্দেহ হয়?

ঃ এটা সন্দেহের ব্যাপার নয়, আমি নিশ্চিত। আমি জানি এটা কারা করেছে।

ঃ বলুন কে কে করেছে, তাদের ভিটেতে আমি ঘুঘু চরাবো।

মধুবচনবাবু এতক্ষণে সমস্ত কথা খুলে বলার সাহস পেলেন। বললেন, কৃষক সমিতি হয়েছে তুমিতো জানো। ওদের এখন একটা fund-এর দরকার। একটা বড় রকমের fund করতে পারলে ওরা আর চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নেবে না, ঐ fund থেকেই নেবে অল্প সুদে। তাছাড়া, বন্ধকী জমিও কিছু কিছু ঐ টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবার ওদের plan আছে এবং ঐ জমি সমিতি এক বা তু'বছর চাষ করে টাকা তুলে নিয়ে যার যার জমি তাকে ফিরিয়ে দেবে। এসব কথা ওদের সমিতির কাগজপত্রে লেখা আছে—তোমরা দেখতে পারো।

ঐ fund তৈরী করার জন্যে ওরা নানা plan নিয়েছে। কয়েকদিন আগে ভাঙাড়ের অজুহাত দেখিয়ে কয়েকজনের জমি ওরা চাষ করলো। বাধা দিতে গিয়ে গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক কিভাবে বদ্‌মাইসগুলোর কাছে মার খেয়েছে সে তো শুনেছোই।

এ সবই ওদের কাগজপত্রে লেখা আছে—আর এভাবে ডাকাতি করে যে fund তৈরী করবে সে সংবাদও গোপনে আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু কবে, কার বাড়িতে ডাকাতি করবে তাতো আর বলা যায় না, নতুবা তোমাদের আগেই সাবধান করে দিতে পারতাম। তবে তুমি কিন্তু এসব কাউকে বলবে না, আর ওদের মধ্যে কে যে আমাকে এসব গোপন সংবাদ দেয়—সে সব আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তাহলে সব ফাঁস হয়ে যাবে।

কৃষক সমিতির দাবী-দাওয়ার খবর শুনে ভদ্রলোক আগে থেকেই ওদের ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন। তারপর কয়েকদিন আগে নিজের গ্রামেও ঘটা করে সমিতি হয়েছে, হরিতলার কাজিয়ার খবরতো জানেন-ই। মধুবচনবাবুর কথা শুনে তাই তাঁর বিশ্বাস হলো, হয়তো এদের সহায়তায় এসব কাজ হতে পারে। বললেন, ঠিক আছে চলুন, থানাতে গিয়ে নাম উল্লেখ করে কেস্ দেব।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। সমিতির কাজ পূর্ণোদ্যোমে এগিয়ে চলেছে। তেমন কোন বাধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না দেখে সবাই উৎফুল্ল। ইতিমধ্যে

াঞ্চলিক সমিতি গঠন হয়েছে, দীননাথ আর শাস্তিরাম আঞ্চলিক সমিতির কর্ণধার

হঠাৎ একদিন গভীর রাতে পুলিশে বাড়ি ঘিরে ফেললো। কর্মক্লান্ত দীন-নাথ বারান্দাতেই ঘুমিয়ে ছিল। পুলিশের রাইফেলের গুতো খেয়ে সে লাফিয়ে উঠলো, পুলিশ দেখে হতভম্ব!

দীননাথের স্ত্রী ভয়ে চিৎকার শুরু করলো। পাড়ার লোকজন দৌড়ে এলো। কিন্তু পুলিশ দেখে ও তাদের তাড়া খেয়ে ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল।

দীননাথের স্ত্রীর কান্নাকাটি, অনুনয়-নিবেদন দু'পায়ে মাড়িয়ে তাকে বিশ্রী ভাষায় গালাগাল করতে করতে দীননাথকে বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

রাতের অন্ধকারে বিদ্যুৎগতিতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। ফলে, শান্তি-রাম, হরেন প্রভৃতি আরও কয়েকজনের বাড়িতে পুলিশে হানা দেওয়া সত্ত্বেও কাউকে ধরতে পারলো না।

রাতের বাকী সময়টুকু শ্যামল আর ঘুমোতে যায়নি। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে—এমতাবস্থায় সবার উচিৎ একটা মিছিল নিয়ে থানা ঘেরাও করা, মুক্তি দাবী করা, একটা লিখিত প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু কারুর কাছে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, থানায় যেতে কেউই রাজী নয়। ছাত্রদেরও রাজী করানো গেল না। কারণ সামনের সারিতে যাদের থাকতে হবে তারা প্রত্যেকেই আসামী, পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে একাজের কোন মূল্য নেই—থানা অভিযান সম্ভব হলো না।

অগত্যা D.C. কে একটা লিখিত পত্রে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে মুক্তি দাবী করা হলো এবং চার-পাঁচশ' লোকের স্বাক্ষর করিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, একটা কপি দেওয়া হলো O. C. কে।

দীননাথের স্ত্রী দুপুর বেলায় খাবার নিয়ে যায়। খাবার খাওয়াতে গিয়ে দীননাথকে এক নজর দেখে ওখানেই সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থাতেই একটা গরুর গাড়ী করে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তার মাঝে ওর জ্ঞান ফিরে আসে, ছেলেকে কোলে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করতে করতে বাড়িতে পৌঁছায়।

দীননাথের স্ত্রীর কাছে সবাই জানলো—দীননাথের একটা চোখ উপড়ে

ফেলেছে, পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দিয়েছে, বাঁচবে কি-না কেউ বলতে পারে না। মাটিতে আছড়ে পড়ে আর্তনাদ আর অনুনয়-বিনয় করতে থাকে—ওরে তুর সগলে যা, ওরে ছাড়ায়ে নিয়ে আয়, ও কোনদিন ডাহাতি করতি পারে না ওরে মারে ফ্যালবেনে।

ডাকাতি কেসে নিরীহ দীননাথকে ধরে নিয়ে গেছে, চোখ তুলে ফেলেছে পিটিয়ে মেরে ফেলছে, দীননাথের স্ত্রীর আর্তচিৎকারে সমস্ত গ্রাম যেন সরীসৃপে মত নড়ে উঠলো, চাপা উত্তেজনায় গ্রাম তখন থর্ থর্ করে কাঁপছে।

অনিদ্রা আর ছুটাছুটির ক্লান্তিতে শ্যামলের শরীরটা অবসন্ন হয়ে আসছিল তাই ভাবলো, একটু গড়াগড়ি দিয়েনি কিন্তু নিজের অজ্ঞাতে কখন গভীর ঘু অচেতন হয়ে পড়লো।

শ্যামলের বাবা গ্রামের অবস্থা দেখে ভীত হয়ে পড়েন। চারিদিকে স সড়্কি, রামদা হাতে ছুটে বেড়াচ্ছে। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা জানেন চণ্ডালের (কথিত) দেহের রক্ত মাথায় জমা হলে কি কাণ্ড এরা ঘটাতে পারে! যা করবে তাতেই এদের নিজেদের ক্ষতি হবে। শ্যামলকে টে তুললেন, ব্যাপারটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করে বললেন, ছোট্ নতুবা একটা অঘট ঘটবে, শেষে সবশুদ্ধ মরবে!

দীননাথের অবস্থা শুনে শ্যামল ক্রোধে কাঁপতে থাকে। বললো, ঠিকইতে মিথ্যা কেসের বদলা নিতেই হবে, একটার বদ্লা দশটা, ওদের ঠেকাতে হবে কেন

গর্জে উঠলেন শ্যামলের বাবা—এই বুদ্ধি নিয়ে মাতব্বরি করে বেড়াও! ডাকাতি হয়ে যাবার পর লোকগুলো এমনিতেই মরে গেছে, যেটুকু আছে তোমরা শেষ করে দাও। তারপর উল্টো reaction যখন শুরু হবে তখ তোমরা সব মরবে। মাঝে আসল শয়তানগুলো নিরাপদ দূরত্বে বসে মজ দেখবে। দৌড়া, সবাইকে শান্ত কর।

ঃ তা আসল শয়তানটা কে, কে করলো ওদের নামে এই মিথ্যা কেস্?

শ্যামলের বাবার এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে গেল। গলাধাক্কা দিয়ে বললেন, আমি কি জানি, ওদের বাড়ী গিয়ে শোন্ কে ওদের এই যুক্তি দিল, গাধা কোথাকার!

শ্যামল রাস্তায় গিয়ে দেখলো, বাঁধ ভাঙা জলের মত গ্রামবাসী ছুটছে। যুবক-বৃদ্ধ-কিশোর সবাই, মেয়েরাও কেউ কেউ কোমর বেঁধে হাতে বটী অথবা

ঝাঁটা নিয়ে বীরঙ্গনার মুর্ত্তিতে পর্যায়ক্রমে হাটছে আর দৌড়োচ্ছে। শ্যামল ছুট্‌তে ছুট্‌তে সবার সামনে গিয়ে থামলো। চিৎকার করে সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করলো। তারপর উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নেতৃত্ব দিয়ে গৃহস্বামীর বাড়িতে ঢুকে পড়লো। বাড়ির লোকজন ভয়ে বলীর পাঁঠার মত কাঁপতে লাগলো। প্রকাশ করে দিল—কে তাদের এ জঘন্য কাজে প্ররোচিত করেছে।

ইতিমধ্যে হাপাতে হাপাতে শ্যামলের বাবা এসে পড়লো। হাতের কাছে দু'চারটাকে ধরে যথেচ্ছ কিল-চড় বসালো। অন্যসময় হলে একবার অন্ততঃ আক্রমণকারীকে দেখে তারপর সব কেটে পড়ার চেষ্টা করতো; কিন্তু সে সময় এখন আর নেই। একেবারে about turn, double march. মৌমাছির মত সশস্ত্র জনস্রোত ছুট্‌তে লাগলো, উদ্দেশ্য মধুবচনবাবুর বাড়ি। কিন্তু বৃথা। বাড়িতে কোন জন-প্রাণী নেই। উত্তেজিত জনসাধারণকে শান্ত করা কঠিন। বাড়িতে সব তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেল। এর মাঝে কে একজন রান্নাঘরের খড়ের চালে আগুন লাগিয়ে দিল।

ঘন বসতিপূর্ণ পাড়া। চালের সংগে চাল ছুঁয়ে আছে। প্রায় প্রত্যেকটিই খড়ের ঘর। একটা ঘরে আগুন লাগলে ধীরে ধীরে তা পুরো পাড়াটাকেই ছারখার করে দিতে পারে—তা হতে দেওয়া যায় না। সবার প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হলো, ছড়িয়ে পড়ার অবকাশ পেল না।

★

শ্যামল অসুখের জন্যে Annual পরীক্ষায় বসতে পারেনি। ফলে সে এবার দশম শ্রেণীতে Promotion পেল না। অবশ্য শিক্ষকরা বলেছিলেন—শ্যামল ইচ্ছা করলে তাকে ক্লাসে তুলে দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু ওর বাবা আপত্তি করলেন। বললেন, না, এবার তুমি ক্লাসে থেকে যাও, আর ভাল করে পড়াশুনা করো, যাতে আগামী বছর result ভাল হয়।

মশিয়াহাটী স্কুলে শুধু ছেলেরাই পড়ে; পাশেই কুলটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ওখানে মেয়েরা পড়াশুনা করে। অবশ্য কোন কোন বছর নবম শ্রেণীতে দু'একজন ছাত্রী এসে ভর্ত্তি হয়; যারা Science পড়তে আগ্রহী। Science পড়তে চাইলেই স্কুল থেকে Transfer Certificate পাওয়া যায় না। কারণ, সহজে মেয়েদের ছেড়ে দিলে ভাল ভাল ছাত্রীগুলো সবাই চলে যাবে। তাতে

স্কুলের ক্ষতি হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ পরিবারের বেলায় এসব নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে থাকে।

শ্যামলদের সহপাঠিনী এবার দু'টি ছাত্রী। ওরা পড়াশুনায় খুবই ভাল, ভাল ছাত্রদের ভয়ের কারণ। শ্যামল ওদের দু'জনকেই চেনে, ওরাও শ্যামলকে জানে এবং একটু বিশেষভাবেই জানে; কারণ শ্যামলের মা ওদের দিদিমণি। অবশ্য ওদের মধ্যে বাক্যালাপ নেই।

রীতাকে প্রথম দিন দেখে শ্যামলের অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বাড়ি গার্লস্ স্কুলের পাশেই, মা শিক্ষয়িত্রী ও দু'তিনটি বোন স্কুলে পড়ে; যারজন্যে ওদের বাড়িতে মেয়েদের অবাধ যাতায়াত—সে ছোট হোক আর উঁচু ক্লাসের মেয়েরাই হোক। তাছাড়াও বাড়িতে ঢ্যাবা-ঢ্যাবা কুল আর তেঁতুল গাছের আকর্ষণ মেয়েদের পাগল করে তোলে।

একটা লজেন্স, দেষ্টখাটে বা মিঠেছালের (দারচিনি) লোভে বাড়ীর অথবা পাশের ছোট ছোট ছেলেরা ওদের কুল আর তেঁতুল পেড়ে দেয়। ঝাল-লবণ ওদেরই রান্নাঘরে, বাড়িতে বুড়ীর এসব অসহ্য।

সেদিনটা ছিল শ্যামলের পালা। কতকগুলো বড় ক্লাসের মেয়েরা ওকে আগাম দক্ষিণা দিয়ে কুল গাছে চড়ালো, ঠাকুরমা তখন স্নান করতে গেছে সীতানাথের বাঁধানো পুকুর ঘাটে। শ্যামল ঝাঁকি দিয়ে কুল পাড়ছে; আর ধাড়ী মেয়েগুলোই সব দৌড়াদৌড়ি, কাড়াকাড়ি করে কুড়িয়ে নিচ্ছে। প্রতিযোগিতা ছোট মেয়েগুলো একেবারেই হেরে যাচ্ছে; কিন্তু ধাড়ীগুলোর একটুও মায়া নেই। গাছ থেকে শ্যামল লক্ষ্য করলো একটা মেয়ে একেবারে বোকা, একটাও পাচ্ছে না; ওর মায়া হলো। হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওর কাছে ফেললো কতকগুলো, সেগুলো মেয়েটা ধরে নিল। কয়েকটা পেয়েই পকেটে পুরে লবণের জন্যে রান্নাঘরে ঢুকলো। এর মাঝে ঠাকুরমা এসে পড়লো মেয়েরা সব হাসতে হাসতে ছুটে পালালো।

রান্নাঘরের দরজা খোলা দেখে বুড়ী তার হাতের লাঠি নিয়ে মেয়েদে ধাওয়া করেনি। স্বভাবসুলভ মিঠেকড়া ঠুকতে ঠুকতে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শিকল টেনে দিল। খুব সতর্ক, একবার কুকুর ঢুকলে মেটে হাড়ি মরে যাবে, শেষে সবই পাল্টে আবার নতুন করে কিনতে হবে।

বেচারী মেয়েটা যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো তখন বুড়ীটা একেবা

।জার সামনে, ফলে, আর সাহস করেনি নড়াচড়া করার। ভয়ে কাঠ
.য় ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো. কাঁদতেও বোধ হয় ভুলে গেল।

শ্যামল বেছে বেছে কয়েকটা কুল পেড়ে হাতে করেই নেমে এলো।
ী তখন গোলার সামনে তুলসী তলায় জল ঢালছে। লবণের জন্যে রান্নাঘর
লে ঢুকে গেল। আবছা অন্ধকারে কাউকে কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে
চকিয়ে গিয়ে কে কে বলে উঠলো। আর্তনাদের মত মনে হলো তার
শ্নটা। এতক্ষণে ভয়ে মেয়েটা কেঁদে উঠলো, সুড়সুড় করে বেরিয়ে
দেতে কাঁদতে স্কুলের দিকে চলে গেল।

সেদিনের সেই বোকা মেয়েটা অনেক বড় হয়েছে। এখন দেখতে আর
াগের মত বোকা বোকা মনে হয় না ; বরং রীতাকে দেখতে এখন বেশ চটপটে।

রীতাও সেদিনের সে ঘটনাটা আজও ভোলেনি। উপরন্তু মাঝে মাঝে
টনাটি মনে মনে চর্চা করেছে, স্মরণ করেছে, যাতে ভুলে না যায়। সেদিন
কেই সে দিদিমণির এ ছেলেটাকে চেনে। পরবর্তীকালে লোকের মুখে
ামলের সুনাম-দুর্নাম যখন শুনেছে, আনন্দ ও দুঃখ পেয়েছে, কোন বিপদের
থা শুনলে ভয়ে রাতে ঘুম হয়নি, মনটা ভয়ংকর খারাপ হয়ে গেছে।
র বেশী সে কোনদিন চিন্তা করেনি, হয়তো ভাববার সাহস পায়নি।

এক সংগে বসে ক্লাস করে, দেখতে ভাল লাগে, তাই অপরকে লুকিয়ে
দখবার চেষ্টা করে, কোন কোন সময় চোখাচোখি হয়ে যায়, লজ্জা পায়, আনন্দও
য হয় তা বোধ হয় দু'জনের কেউ বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারবে না।

শ্যামলের এ যাবত মশিয়াহাটী স্কুলে একটা রেকর্ড ছিল ; স্কুল কামাই
ও স্কুল পালানো ; কিন্তু কি আশ্চর্য পরিবর্তন! সে অপর আরেকটি
রকর্ড করার জন্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে—সেটা স্কুল কামাই না করার
রকর্ড। শ্যামল এতদিনে স্কুলে যাবার একটা আকর্ষণ বোধ করে, সেটা লেখা-
পড়ায় মনোযোগ, না প্রিয় সহপাঠিনীকে দর্শনাকাঙ্ক্ষা—সে নিজেই পুরোপুরি
বুঝে উঠতে পারলো না। কিন্তু শিক্ষকরা জেনে গেছেন—শ্যামলের এতদিনে
লেখাপড়ায় মতি ফিরেছে, ক্লাসের সেরা ছাত্র সে এখন।

শিক্ষক ও অভিভাবকেরা বুঝলেন, শ্যামল অন্যান্য বহু কাজের সাথে
পড়াশুনাতেও মনোযোগ দিয়েছে। প্রথমে সবাই ভেবেছিল স্বাভাবিকভাবেই

তার জীবনে এ পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের কানে গেল প্রেরণার মূল উৎস কোথায়, তবে কেউই তেমন গুরুত্ব দিলো না, গুরুত্ব দেবার মত কোন ঘটনাও নয়।

পড়াশুনার বিভিন্ন সূত্র ধরে রীতার সংগে শ্যামলের আলাপও হোল; কিন্তু সে আলাপ অত্যন্ত সীমিত। স্কুলের গণ্ডীর বাইরে দেখাশুনা হলে কেউ কখনও আলাপও করেনি।

তাদের চাল-চলনে কি প্রকাশ পেত শ্যামল বা রীতা কখনও বুঝতে পারেনি; কিন্তু তবুও একমুখ হতে অন্যমুখে, সত্যি-মিথ্যে জড়িয়ে ব্যাপারটা অঞ্চলের ছেলেদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। শ্যামল এ অঞ্চলের বিতর্কিত ছাত্র, হয়তো কিছুটা সেজন্যেও কাল্পনিক কাহিনীটা (?) অনেকটা গুরুত্ব পেয়ে থাকবে।

এ নিয়ে যারা বেশী মাতামাতি করলো এবং বিকৃতভাবে প্রকাশ করলো, তারা হলো ছাত্র লীগের কতকগুলো সদস্য। শ্যামলের নির্মল, সংগ্রামী চরিত্রের ওপর কালি লেপনের চেষ্টা করে ওরা সাংগঠনিক ফায়দা লুঠবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে কি তারা সফল হলো? না, তা পারেনি, মিথ্যেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব! হিটলারের নাজী পার্টির প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলস্ বলতেন—মিথ্যা কথাটি একশ'বার বললে মিথ্যাই সত্যে রূপান্তরিত হয় এবং সত্য মিথ্যাতে পরিণত হয়। নাজীরা এই নীতিকে ব্যবহার করে সাময়িক সাফল্য অর্জন করলেও, সত্যকে গোপন রাখতে পেরেছে কি?

ধীরে ধীরে কথাগুলো রীতার বাবার কানে গেল। তিনি কোন রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মেয়েকে যশোর Govt. Girls High School-এ পাঠিয়ে দিলেন এবং ওখানকার Hostel-এ থেকেই রীতা শেষ পর্যন্ত School Final দেয়।

রীতা চলে যাবার পর শ্যামল বুঝতে পারলো ক্লাসে একমাত্র আকর্ষণ-ই ছিলো রীতা। ওর অনুপস্থিতে বন্ধু-বান্ধব ঠাসা ক্লাসটিকে ওর একেবারে শূন্য বলে মনে হয়। মনের এ সমস্ত দুর্বলতা শ্যামল প্রকাশ হতে দেয়নি, ঐ সময়ে তা প্রকাশ করা সম্ভবও ছিল না। কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ওদের নিন্দুক প্রমাণিত করলো, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলো।

Test পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। Result out

হবার সময় হয়ে এলো। কর্মশূন্য দিনগুলো আর শ্যামলের কাটতে চায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, রীতার সংগে যোগাযোগ রাখলে হয়তো একটু ভাল লাগতো; কিন্তু উপযাজক হয়ে তার সাথে যোগাযোগ করতে লজ্জা লাগে। মধ্যে মধ্যে চিন্তা করে, রীতা হয়তো তার কথা মনেই করে না, এমনও হতে পারে সে হয়তো অন্য কাউকে ভালবাসে—যদি তাই হয়, কি ভাববে তাকে! এসব চিন্তা করে নিজেকে বেঁধে রেখেছে।

বাজে চিন্তাগুলি যাতে মনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধতে না পারে তারজন্যে অলস দুপুর বেলায় শ্যামল স্কুলের দিকে একবার যাবেই। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা হলে গল্প করে, না হলে নীচের ক্লাসের ছাত্রদের সাথে Laboratory তে গিয়ে ওদের একটু সাহায্য করে, নিজেও শিখে নেয়। অথবা কোন কোন দিন শুধুমাত্র খবরের কাগজটা পড়ে, ঘুরে ফিরে সময় কাটায়।

শ্যামল গতকাল আভাস পেয়েছিল আজ Result out হবে, সেজন্যে সকাল সকাল স্কুলে গিয়ে দেখলো Notice Board-এ Result টাঙিয়ে দিয়েছে। ১১৩ জনের মধ্যে allowed হয়েছে মাত্র ৮০ জন। সফল ছাত্রেরা পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে, বাকীদের এক বছর থমকে থাকতে হবে। আগামী বছর Test পরীক্ষাতে allowed হলে ওদের পরীক্ষা দেবার অনুমতি মিলবে, ব্যর্থ হলে অন্যত্র যেতে হবে।

পাশাপাশি আরেকটা নোটীশ—পরীক্ষার Fee বাবদ প্রত্যেক ছাত্রকে ১৪২.৫০ টাকা দিতে হবে। উপরন্তু যারা কোন বিষয়ে Fail করে বিশেষ বিবেচনায় allowed হয়েছে, তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা এবং নির্দিষ্ট তাং-এর মধ্যে মিটিয়ে দিয়ে Form fill up করতে হবে।

এই সময়ে Final Exam nee-দের কোন ক্লাস হতো না, তাছাড়া পড়াশুনার চাপ, Final সামনে, যারজন্যে ওরা স্কুলের দিকে বড় একটা আসে না। কিন্তু Result out-এর সংবাদ শুনে একে একে এসে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে চাইলো।

যারা allowed, resul -এর জন্যে তারা খুশী কিন্তু Fee-এর দাপটে তাদের সে আনন্দ ঘোমটা মেলার অবকাশ পেলো না, অন্যান্যদের অবস্থাতো

শাঁখের করাত।

শ্যামল নোটিশ দু'টি পড়ে অবাক হয়ে গেল। এমনটি তারা আশা করতে পারেনি। তার বুঝতে বাকী রইলো না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উপহার হিসাবে ওরা এগুলো তাদের গলায় পরিয়ে দিতে চায়।

শ্যামলের মাথায় আগুন লেগে গেল। সোজা ঢুকে গেল হেডমাস্টারের চেম্বারে। উনি হয়তো এজন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, বললেন, শ্যামল, একটাতে Fail করে B Group-এ পাশ করেছ, এমনটি আমরা আশা করিনি। যাহোক, Total marks ভালই পেয়েছ, হামিদের থেকে মাত্র সাত-আট কম পেয়ে Total marks-এর দিক দিয়ে 2nd হয়েছ, এখন থেকে মন দিয়ে পড়াশুনা করো।

শ্যামল হেডমাস্টারের প্রলেপ দেওয়া কথার কোন জবাব না দিয়ে সরাসরি আপত্তি জানিয়ে বললো, এখন ছাটাই-এর কোন প্রশ্নই ওঠে না; আর যে Fee ধার্য করেছেন তা একেবারেই অযৌক্তিক—তাই Notice টা তুলে নিয়ে নতুন করে Notice দিন।

ঃ তার মানে, তুমি কি বলতে চাও?

ঃ আমরা বেশী মানে বুঝি না, এ সময় ছাঁটাই দেওয়া শুধুমাত্র অনুচিত নয়, আমরা মনে করি অন্যায়ও এবং অত টাকা Fee হতেই পারে না। আপনি Notice টা প্রত্যাহার করে নিন, নতুবা এ নিয়ে আপনাকে যথেষ্ট ভুগতে হবে, এবং এর ফল হবে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, তারজন্য আপনিই দায়ী থাকবেন।

ঃ তুমি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ?

ঃ আপনাকে ভয় দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়, তাতে আমার কোন লাভও নেই। আমি এসেছি সবাই যাতে পরীক্ষায় বসতে পারে তারজন্যে অনুরোধ করতে, দাবী জানাতে। আপনাদের ভুল সিদ্ধান্তের বলী হয়ে কতকগুলো ছাত্রকে যাতে আমরণ ভুগতে না হয় তার দরবার জানাতে।

ঃ আমরা Managing Committee-এর অনুমতি নিয়ে সমস্ত শিক্ষক একমত হয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাই Board-এ টাঙিয়ে দিয়েছি। ওটা আমরা স্কুল ও ছাত্রদের ভালোর জন্যেই করেছি, ওর কোন রদবদল হবে না।

ঃ তাহলেও আমি বলবো, আপনারা আরেকবার বসে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা রুন। অসুবিধা না থাকলে দু'একজন ছাত্রকেও ডাকতে পারেন, আপনাদের সিদ্ধান্ত ত্রুটীমুক্ত নয় বলেই আমরা মনে করি।

ঃ তুমি এতগুলো শিক্ষককে—শুধুমাত্র শিক্ষক নন্, এতদ্‌ঞ্চলের গণ্যমান্য লাকগুলোকে আহম্মক বলতে চাও ?

ঃ আমি কাউকে আহম্মক বলতে চাচ্ছিনা, তা বলার ক্ষমতা ও ইচ্ছা মামার নেই। তবে আপনারা যে আমাদের ও অভিভাবকদের আহম্মক াউরেছেন তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। গণ্যমান্য মোড়লদের Can-lidate ক'জনকে যদি পুরো টাকা Payment করতে হতো, তাহলে এ সিদ্ধান্ত তো না ; যাহোক, ছাত্রদের অসুবিধার কথা আপনাকে জানালাম, সে অধিকার াশাকরি আমাদের আছে।

শ্যামলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেডস্যার বললেন, কি আর কিছু বলার াাছে ?

ঃ হ্যাঁ, আজ আপনাকে আমাদের অনেক কিছুই বলার আছে।

ঃ তাহলে বলো তাড়াতাড়ি। এসব বাজে জিনিষ নিয়ে তোমার সাথে গড়া করার মত সময় আমার নেই।

ঃ এ সমস্তই যদি আপনি বাজে কথা বলে মনে করেন তাহলে আপনাকে ানাদের কিছুই বলার নেই, এর পর আপনার সাথে কোন কথা হতে পারে না।

ইতিমধ্যে অলকবাবু, বীরেনবাবু সমেত আরও দু'একজন শিক্ষক হেড-ারের চেম্বারে ঢুকলেন। বললেন, কি ব্যাপার, এত ঝগড়া কিসের ?

শ্যামল হেডস্যারকে লক্ষ্য করে বললো, স্যার ওটাই তাহলে আপনার ষ কথা ?

বীরেনবাবু তাঁর গম্ভীর গলায় বললেন, দাঁড়াও, বলো কি হয়েছে, য়েছেটা কি এত চেঁচামেচি করার ?

শ্যামল বললো, হয়েছে অনেক কিছুই, বলতে শুরু করেছিলাম ; কিন্তু হডস্যার আমাদের বক্তব্যকে বাজে কথা বলে উল্লেখ করলেন। তাই, এই টবিলে বসে আপনাদের আর বাজে কথা শোনাবার ধৈর্য্য আমাদের আর নই ; কাজে জবাব পাবেন কি আমাদের বক্তব্য এবং সে বক্তব্য বাজে

কথা—না একান্ত প্রয়োজনীয় !

আরে বলোনা আরেকবার, আমরা একটু শুনি—বীরেনবাবু বললেন।

বীরেনবাবু বহুবছর মশিয়াহাটী স্কুলের শিক্ষক ; প্রধান শিক্ষক পদেও তিনি ছিলেন কয়েক বছর ; কিন্তু তিনি B.Sc. পাশ এবং B.Ed. ট্রেনিং না থাকায় তাঁকে প্রধান শিক্ষক পদে রাখা সম্ভব হয়নি। তিনি এখন যুগ্ম-প্রধান শিক্ষক। উনি ধার্মিক, সৎ ও জ্ঞানী বলে সবার শ্রদ্ধার পাত্র। ঠুনকো মান-সম্মানবোধের অনেক উর্দ্ধের লোক তিনি ; কিন্তু বড় উদাস।

হেডস্যার বললেন, ঐ ছাঁটাই-এর ব্যাপার নিয়ে বলছে – ছাঁটাই চলবে না, সবাইকে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দিতে হবে ; ফি বেশী, এইসব যত যা-না-তাই আরকি !

ভিতরে যখন কথা হচ্ছিল, শ্যামলের সহপাঠী আরও কিছু ছাত্র এসে বাইরে জড়ো হয়েছিল। ওরা হেডস্যারকে দ্বিতীয়বার যা-না-তাই উচ্চারণ করতে শুনে চিৎকার করে উঠলো—আয় শ্যামল বেরিয়ে আয়, এরপর আর কোন কথা চলতে পারে না। —শ্যামল বেরিয়ে যেতে এগিয়েছিল ; কিন্তু হলো না।

অলকবাবু বাঘের মত চেয়ার ছেড়ে দরজার সামনে লাফিয়ে পড়লেন। হুংকার দিয়ে বললেন, সবার মাতব্বরি আমরা শুনতে চাই না। প্রতিনিধি দু'একজন পাঠাবি, আমরা তার সাথে কথা বলবো।

অন্যেরা সবাই দৌড়ে পালিয়েছিল, একজন পালাবার সুযোগ না পেয়ে সামনে পড়ে যায়, অগত্যা সাহসে ভর করে বললো, তাহলে বাজে কথা বলছেন কেন আমাদের সবার মতামতকে — কান্নাভেজা ক্ষীণ ধ্বনি বেরিয়ে এলো।

অলকবাবু ওর মুখের অসহায় ভাব দেখে নিজেই যেন লজ্জা পেলেন। স্নেহের সুরে বললেন, আমরা সবাই তো বলিনি, যা ওদিকে গিয়ে অপেক্ষা কর, গোলমাল করিস্নে।

শ্যামল দাঁড়িয়ে আছে দেখে, ফিরে এসে উনি বললেন, কালিপদ শ্যামলকে একটা বসার দে। দপ্তরী কালিপদ একটা চেয়ার নিয়ে ঢুকলো। শ্যামল বললো, কালিপদদা লাগবে না।

অলকবাবু বললেন, বসো, অনেক কথা আছে তোমার সাথে।

শ্যামল বসতে ইতস্ততঃ করছিল, শিক্ষকদের সামনে চেয়ারে বসতে ওরা অভ্যস্ত নয়। অলকবাবু বুঝতে পারলেন। বললেন, আরে বসো, কি আছে! —আমরাতো বসতে বলছি। এবং শ্যামলকে প্রশ্ন করলেন, কি তোমাদের problem? —একে একে গুছিয়ে বলো, আমি নোট করে নিচ্ছি।

শ্যামল কিন্তু বেঁকে বসলো, স্যার এ অবস্থায় আমাদের প্রথম কথা, হেডস্যার আমাদের বক্তব্যকে পুনঃ পুনঃ 'বাজে কথা' আর 'যা-না-তাই' বলে উল্লেখ করেছেন -- সবার আগে উনাকে ঐ উক্তিগুলো প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

বীরেনবাবু বললেন, কি সব ঝামেলা করছো শ্যামল, ওসব প্রসঙ্গ আর না তুলে, তোমাদের বক্তব্য আমাদের প্রথম থেকে বলো।

ঃ দেখুন স্যার, তা হতে পারে না, আমাদের দাবী সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টিভংগী একটা বড় প্রশ্ন। আপনারা যদি ছাত্রদের বক্তব্যকে 'বাজে কথা' বলে ধরে নেন, তাহলে আপনাদের সাথে কোন আলোচনাই চলতে পারে না। নীতিগতভাবে আমাদের বক্তব্যের গুরুত্ব স্বীকার করলে তারপর আপনাদের সাথে আলোচনার প্রশ্ন আসতে পারে, অন্যথায় নয়। আমরা আপনাদের ছাত্র হলেও, আমরা মনে করি, এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আমাদের যৌথ বক্তব্যকে আপনাদের সম্মান করা উচিৎ।

ঃ হেডস্যার এতক্ষণে বুঝতে পারলেন, অবস্থা জটিল। এ ছেলে যখন বেঁকে বসেছে, তখন আর সহজে সোজা হবেনা। তাই বললেন, ঠিক আছে শ্যামল, তুমি বলো আমরা শুনছি।

ঃ দেখুন স্যার, আমি সমস্ত ছাত্রের মতামত নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি, আমি মনে করি এখানে আমার ব্যক্তিগত মতামতের কোন মূল্যই নেই, ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের কোন অধিকারও আমার নেই। অসম্মান-জনক কোন পরিস্থিতি বা পরিবেশের সাথে আপোষ করার এক্তিয়ার আমার নেই। তাই, আমি, আমাদের তরফ থেকে অসহায়তার কথা জানাচ্ছি। আশাকরি এর জন্যে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করবেন না।

অলকবাবু বিচক্ষণ লোক, তাড়াতাড়ি বললেন, ঠিক আছে শ্যামল, হে মাষ্টার মশায় যদি কোন ভুল বা অন্যায় কথা বলে থাকেন, তাহলে উনার হ আমি appology চেয়ে নিচ্ছি. আশাকরি এরপর আর তোমাদের কোন বক্ত থাকতে পারেনা।

: স্যার, আপনি কথার মধ্যে একটা 'যদি' শব্দ জুড়ে দিয়ে তবুও প্রশ্নটাবে পাশ কাটাতে চেষ্টার ক্রুটি করলেন না। যাহোক, পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলে আসল উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়ে এ ঘটনাকে আপাততঃ আমরা এড়িয়ে যে চাই। আপনাদের কাছে আমাদের প্রথম দাবী ছাঁটাই দেওয়া চলবে না।

হেডস্যারের ফর্সা মুখ মেটে হাড়ির তলার বর্ণ ধারণ করলো। মাথা নী করে বসে রইলেন, মুখ্য ভূমিকা বরাবরের মত অলকবাবু গ্রহণ করলেন।

: দেখ শ্যামল, স্কুলের স্বার্থ নিশ্চয়ই তুমি আমি-আমরা সমানভা দেখবো। কারণ, আমি যেমন শিক্ষক, তাছাড়া স্থানীয়। স্কুলের সাথে আমা সম্পর্ক শুধুমাত্র শিক্ষক হিসাবে নয়। তেমনি তুমি ছাত্র হলেও পড়াশু শেষের সাথে সাথে স্কুলের সাথে তোমার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে না তোমার বাবা ঠাকুরদা, আমার বাবা-কাকারাই এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তারা সবাই এ স্কুলের ছাত্র। আমাদের সন্তান তোমরা যেমন এই স্কু পড়াশুনা করে মানুষ হতে যাচ্ছ, তেমনি তোমার ছেলেমেয়ে, এতদ্‌ঞ্চলে সমস্ত ছেলে-মেয়ে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই বাড়ির খেয়ে মানুষ হতে পারবে তাই, বর্তমানে তোমরা আছ—আমরা আছি, আমাদের ওপরই এই প্রতিষ্ঠানে সার্বিক দায়িত্ব। একে রক্ষা ও উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি আমাদের করতে হবে, না হলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের নিন্দা করবে, আমরা কলংকি হবো।

যশোর বোর্ডে গিয়ে মশিয়াহাটীর নাম বললে এক ডাকেই সবাই চেনে সবাই জানে এ সেই স্কুলটি যার Result কখনও খারাপ হয় না। মশিয়া হাটীর নাম বললে সমগ্র দেশের প্রত্যেকটি এলাকায় যার পরিচিতি এমন কোন জাতীয় নেতা নেই, মন্ত্রী নেই, ভাল শিল্পী নেই, যে মশিয় হাটীকে একবার দেখতে আসেনি; কিন্তু কিসের জন্যে মশিয়াহাটী আ

সবার মনে রেখাপাত করেছে? —সেতো এই স্কুলের জন্যে, এ স্কুলের অতীতের সব Glorious Result এর জন্যে। তাই, সবাইকে পরীক্ষা দেবার সুযোগ করে দিয়ে একটা যা-তা Result হয়ে গেলে সে বড় দুঃখের হবে; এটা আমরা হতে দিতে পারি না।.

এতবড় একটা বক্তৃতা ঝেড়ে অলকবাবু হাঁপাতে লাগলেন—হাঁপাবেন না কেন, এতো আলোচনা সভা নয়, যেন বিরাট জনসভা। ঘরের মাঝে পাঁচ-সাতজনের সামনে যেভাবে বললেন, ময়দানে পঞ্চাশ হাজার লোকের কানে বিনা মাইকে পৌঁছে যেত।

শ্যামলের বিরক্তি লাগছিল। ও জানে কর্তৃপক্ষের এসব অন্যায় কাজের সমর্থনে ঐ একটাই অজুহাত আছে—যা বছরের পর বছর ওদের সাফল্য এনে দিয়েছে। এসব আবেগভরা বক্তব্যে স্থানীয় স্কুল প্রাণ জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া যায় ঠিকই; কিন্তু হিসাব-নিকাশ করলে এ বক্তব্য ধোপে টেকে না। প্রত্যুত্তর শ্যামলের জানা আছে।

: ছাত্রদের ভবিষ্যৎ চিরতরে নষ্ট হয়ে যাক, শিক্ষক হয়ে এটা আপনারা নিশ্চয়ই চান না। প্রত্যেকটা স্কুলে এখন Test পরীক্ষা হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে বাদ পড়া ছেলেগুলো অন্য কোন স্কুল থেকে নিশ্চয়ই পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে না। তাহলে তারা করবে কি? —আপনারা বলবেন, স্কুল থেকে তো তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন-ভাব-প্রবণতা ছেড়ে বাস্তবে আসুন। আজ ত্রিশ-বত্রিশজন ছাত্র, যারা ছাঁটাই হয়েছে, তাদের ক'জনের সামর্থ্য আছে আরেকটা বছর স্কুলের পুরো খরচ চালাবার?—কারুরই নেই। তাছাড়া গ্রামের অশিক্ষিত অভিভাবকদের আপনারা ভাল করেই জানেন। পরীক্ষা দিতে না পারলে এত বছরের খরচের কথা স্মরণ করে আচ্ছা করে ঠ্যাঙাবে, তারপর কাউকে ক্ষেতে টেনে নিয়ে যাবে, দু'মাস পরে বিয়ে দিয়ে পাকাপোক্ত সংসারী করে দেবে। কারুর কারুর হয়তো বাড়ীতেই জায়গা হবে না। আর দু'একজনকে হয়তো পড়াবে, তার ফলটা কি হবে? পৈতৃক সম্পত্তির দশকাঠা খোয়াতে হবে—আপনারা কি তাই চান?

: তোমার কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তাই বলে সবাইকে তো পরীক্ষা

দিতে দেওয়া যায় না!

ঃ আপনাদের সাথে আমি একমত হতে পারছি না, আপনি জেনে রাখুন—আমাদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বইজন থেকে একশ'জন পাশ করবে; আর ছাঁটাই করা ছাত্রদের নুন্যতম পঞ্চাশ শতাংশ 2nd Division পাবেই।

ঃ কিন্তু শ্যামল সতের-আঠারো পেয়ে সব ফেল করেছে; সেটাতো একটু ভাবতে হবে। আমরা আর গোটা দশেক ছাত্রকে allow করার জন্যে চিন্তা করতে পারি, তাও এই মুহূর্তে কথা দিতে পারবো না।

হেডস্যার বললেন, ঠিক, তার বেশী অসম্ভব। বীরেনবাবু মুচ্‌কি হাসতে লাগলেন।

ঃ আপনাদের প্রশ্ন আর খাতা দেখায় পনেরো মার্কস্ যারা পায় Final-এ তারা কখনও ফেল করে না; বিশ যারা পায় তারা নির্ঘাৎ 2nd Division মার্কস্ পায়। আপনারা পুরোনো নথিপত্র বের করে রেকর্ড দেখুন।

শুধু প্রশ্ন আর খাতা দেখা নয়। তার আরও কারণ আছে; যেটাকে আমরা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। সেটা হলো, পড়াশুনার সুযোগ। আপনারা জানেন আমাদের স্কুলের ছাত্রদের গড় হাজিরা মাসে তের-চোদ্দ দিনের বেশী হয় না। কেন এটা?—ইচ্ছে করেই কি ছাত্রেরা স্কুল কামাই করে?—না, আমি বলবো, মোটেই তা নয়।

তুমি কেন এত বেশী কামাই করতে? —একজন শিক্ষক প্রশ্ন করে হাসতে লাগলেন।

ঃ আমার মত ছাত্র আমাদের মধ্যে আমি একাই— যে ইচ্ছা করে স্কুল কামাই করে। প্রত্যেকটা ছেলের ওপর থাকে পরিবারের সবার জন্যে প্রয়োজনীয় মাছ ধরার দায়িত্ব, পাঁচ-সাতটি করে গরুর সার্বিক তদারকির দায়িত্ব। এমনকি আপনারা প্রতিনিয়তই দেখে থাকেন ছাত্রেরা স্কুলে আসবার সময় গরুগুলোকে সংগে করে আনে, মাঠের এদিকে-ওদিকে বেঁধে রাখে, ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে তাদের দিগেড় দেয় (অন্যত্র সরিয়ে বাঁধা); ক্ষেতে বাবার ভাত পৌঁছে দেওয়া, মইতে ওঠা, (জমি সমান করার জন্যে, বাবার অধিক ওজন দুর্বল গরুতে টানতে পারে না), ভারা তোলা (ধান বোঝাই নৌকা মাঝে মাঝে এসে

খালাস করে যাওয়া), বাবা-দাদার সাথে জমিতে নিড়ানো, হুড়ো বাছা। বাড়িতে কখনও শব্জী কিনবে না, তা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। নাড়া কাটা, সকাল-বিকাল গাছ (খেজুর গাছ) পাড়া, রস জ্বালানো, ধান, পাট, তিল ঘাট থেকে বয়ে নেওয়া ও তা মাড়াই-এর কাজে সহায়তা প্রভৃতি ক'টা আর মনে করে বলবো—এ সবই প্রত্যেকটা ছেলের অবশ্য করণীয়।

তাছাড়া আছে স্কুল কামাই করে শনি-মঙ্গলবারে মণখানেক ঘাড়ে করে নওয়াপাড়ার হাটে যাওয়া। আপনারা মিলিয়ে দেখবেন ঐ দু'দিনেই ছাত্র হাজিরা সব থেকে কম। তারপরেও বোঝার ওপর শাঁকের আঁটি হয়ে চেপেছে ইদানীং তরমুজের চাষ। তিন-চারটি মাস প্রচণ্ড খাটতে হচ্ছে ছেলেদের। সকাল-বিকাল জল দেওয়া, আর ঐ সময়তো জলের অভাব আরব দেশগুলোর মত, দূর থেকে বয়ে আনতে হবে। গোঁড়া খোঁচানো, সার দেওয়া, পোকা মারা ইত্যাদি। দিনের বেলায় বসে চৌকি দেওয়া যাতে কাকে নষ্ট না করে, রাতের বেলা চোর আর শিয়ালের উৎপাত—বসে বসে পাহারা দাও। আপনারাও কেউ কেউ এর সংগে জড়িত, জানেনতো কি শক্ত ব্যাপার!

আপনারা বলুন ছাত্রদের ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ কোথায়! কিন্তু এখন থেকে আড়াই মাস-তিন মাস ওদের সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দেওয়া হয় —এ অঞ্চলের ট্রাডিশন এটা। অভিভাবকেরা মনে করেন এটাই হলো ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হলে পড়াশুনার সময়। সেজন্যে এসব কোন ঝামেলাতো করেনই না বরং পড়াশুনায় যাতে ছেলেরা ফাঁকি দিতে না পারে তারজন্যে সতর্ক নজর রাখেন। আপনারা জানেন, এ সময় চালের অভাবে উনোনে হাঁড়ি না চড়লেও, কেরোসিন অভাবে রাতের পড়া বন্ধ হয় না; কিন্তু সারাটা বছর কি হয়? —তেল পুড়িয়ে কেউ ভাত খাবেন না, সন্ধ্যের আগেই সব শেষ করার জন্যে ব্যস্ত থাকেন। —আপনারা দেখবেন, আমাদের ব্যাচের ছেলেরা result ভাল করবে।

অলকবাবু বোধহয় এমন base less যুক্তি নিয়ে আর কখনও তর্কে জড়িয়ে পড়েননি। অসহায় বোধ করলেন নিজকে। বললেন, তুমি যেসব যুক্তি হাজির করেছ তা অস্বীকার করতে চাচ্ছি না কিন্তু তবুও আমাদের

অভিমত হলো, সবাই পাশ করতে পারবে না। আমরাতো তোমাদের শিক্ষক —আমাদেরও নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে একটা ধারণা আছে। না শ্যামল, আমরা আর মাত্র কয়েকটি ছেলেকে consider করার জন্যে বিবেচনা করতে পারি; তাও আগামী বুধবার মিটিং-এর আগে কথা দিতে পারছি না।

ঃ আমি আপনাদের কখনই বলিনি সবাই পাশ করবেই। তাছাড়া, প্রতি বছর মশিয়াহাটী থেকে সবাই পাশ করে এমনও নয়; কিন্তু আপনারা বাস্তবকে অস্বীকার করে যে রকম অনমনীয়তার মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন, তাকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি না। আমার মনে হচ্ছে আপনারা পরিকল্পিতভাবেই আমাদের ওপর একটা আঘাত করতে বদ্ধপরিকর। এ অবস্থায় আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না; তবুও আমাদের সব বক্তব্যই আপনাদের বলতে চাই।

গত বছর আপনাদের সাথে agreement হয়েছিল Test-এ কোন ছাঁটাই চলবে না, বাছাই পর্ব ক্লাস 'টেন'-এ প্রমোশনের সময়ই সারতে হবে। —আজ আপনারা এই চরম মুহূর্তে ছাঁটাই-এর প্রশ্ন তুলছেন কেন?

ঃ একটা কথা তোমাদের সাথে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তোমাদের কাছে সমস্ত কাজের জবাবদিহি করতে আমরা বাধ্য নই।

ঃ তাহলে আমাদের কথাও আপনারা জেনে রাখুন—সমস্ত ছেলেকে পরীক্ষায় বসবার সুযোগ দিতে হবে, এটা আমাদের প্রথম দাবী।

দ্বিতীয়তঃ এত বড় বিপর্যয়ের পর যখন এতদ্ঞ্চলের মানুষের একমাত্র ভরসা ক্ষেতের ফসল, তা অতিবর্ষণে নষ্ট হয়ে গেছে। প্রচণ্ড আর্থিক-অনটন জনগণের সামনে থাবা মেলে আসছে, এ দুরবস্থার মধ্যে। ১৪২.৫০টাকা Fee দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভব তো নয়ই, তাছাড়া, এ সম্পর্কে আমাদের নীতিগত মতামত হলো, এটা অন্যায়-অত্যাচার। এটাকে আমরা মেনে নিতে পারি না।

অন্যান্যবারের ৯০ টাকার স্থলে অঞ্চলের জনসাধারণের তথা অভিভাবকদের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থার কথা খেয়াল রেখে, Development Fee ইত্যাদি কতকগুলো বাবদ টাকাগুলো কাট্-ছাট্ করে ৭৩ টাকা করতে হবে এবং আমরা হিসাব করে দেখেছি এটাই যথাযথ।

উত্তেজিত অলকবাবু এবার চিৎকার করে উঠলেন, তোমরা তাহলে

্রলের স্বার্থ একেবারেই উপেক্ষা করার পক্ষপাতী ?

শ্যামল সহজ ভংগীতে জবাব দিলো, আমি প্রকৃতই যা Fee তাই দবার পক্ষপাতী। আমি মনে করি স্কুল তৈরী হয়েছিল ছাত্রদের সুবিধার ন্যে, সে প্রয়োজন স্কুল যতদিন আছে, ততদিন শেষ হয়ে যেতে পারে না। াত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে স্কুল বাঁচানোর নামে আপনারা যা করতে চাচ্ছেন া যুক্তিহীন, ওটা ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয়—আমরা এ মনোভাবের ীব্র নিন্দা করি। ছাত্র প্রতিনিধি হিসাবে আমার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব াত্রদের ন্যায্য স্বার্থকে সংরক্ষণ করা, স্কুলের উন্নতির নামে ঘৃণ্য ব্যবসায়ের রিবর্ধন নয়।

আরেকটি বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। আপনি বলেছেন স্কুলের ীবৃদ্ধি করা, নতুবা ভবিষ্যতেরা আমাদের নিন্দা করবে, আমরা লংকিত হবো—আপনারা শ্রীবৃদ্ধি বলতে কি বোঝাতে চান ? স্কুলের মোটা াংকের fund তৈরী করা, বড় বড় বিল্ডিং গড়ে তোলা, আর অনেকের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে গুটিকয়েক মূলতঃ ভাল ছাত্রকে পরীক্ষায় বসতে দিয়ে াল Result করলেই স্কুলের তথা মশিয়াহাটীর শ্রীবৃদ্ধি হলো ! আমরা নে করি মোটেই তা নয়। মশিয়াহাটী স্কুল যদি আজ এলাকার সর্ব শ্রেণীর ানুষকে আকর্ষণ করতে ও তাদের এগিয়ে দিতে সক্ষম হয়, মশিয়াহাটীর াত্রেরা যদি সমাজের বিকাশের ইতিহাসকে জানতে সক্ষম হয় বা তারজন্যে াদের আগ্রহের জন্ম হয় ও সমাজের বিকাশে সহায়তা করার শিক্ষা পায়, াত্রেরা যদি আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে সমষ্টিগত চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়, ন্যায়-অন্যায়কে পৃথক করার জ্ঞান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শিক্ষা পায়, াতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার সাথে নিজেদের পরিচয় ঘটাবার অনুপ্রেরণা ায়—আমরা মনে করি তাহলেই মশিয়াহাটীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো ; এটাই মুখ্য িক। আর আপনারা যেটাকে মুখ্য ও একমাত্র বলে মনে করেন তাকে ামরা গৌণ উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করি।

তাই, যদি ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে কলংকিত হবার, নিন্দিত হবার ভয় থাকে তাহলে আপনাদের চিন্তা-ভাবনার মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। আজ আমরা আপনাদের সাথে আপোষহীন সংগ্রাম করতে বাধ্য হচ্ছি আর

আমাদের পরের generation আপনাদের মতবাদ, ক্রিয়া-কলাপকে আস্তাকুঁড়ে
নিক্ষেপ করবে।

অলকবাবু উঠতে উঠতে বীরেনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মাষ্টারমশা
আপনি কিছু বলেন ?

বীরেনবাবু ধীরে ধীরে উঠে গেলেন, বললেন, কি আর বলার আছে
বুধবারের মিটিং-এ যা হয় ঠিক হবে।

শ্যামল বেরিয়ে দেখলো, তার সহপাঠীরা ত্রিশ-চল্লিশজন এসে জটলা পাকি
দাঁড়িয়ে আছে, ওদের বেশীরভাগই অকৃতকার্য দলের, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে সবা
এগিয়ে এলো। শ্যামল মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বললো, তোদের জ
বেশী কথা শুনতে হয়, পরীক্ষার খাতায় কি লিখেছিস্ যা-তা ? স্যাররাতে
বললেন ক্লাস টুর বিদ্যেও অনেকের পেটে নেই—এমন একটা বাজে ব্যাচ্ না
এ স্কুলে এর আগে কখনও আসেনি !

ঃ ক্লাস টুর বিদ্যে না থাকলে পাঁচ-সাতটি প্রমোশন দিয়ে পর পর ক্লা
তুলে দেবার সময় খেয়াল ছিল না ; এখন এই অসময়ে কেন ? ওদের কা
আমরা বাজে ব্যাচ্ পড়াশুনায় খারাপ বলে নই, অন্য কারণে, সেতো তুই জানিস্

ঃ ঠিক তাই, ওরা চাচ্ছে যেটুকু বাকী আছে যাবার মুহূর্ত পূর্ণ করে দি
যাই—হবেও তাই।

ঃ ওরে এখানে তো ঐ বীরেনবাবু আর অলকবাবুর জন্যে টুকতে পারিনি
ধরা পড়লে পরীক্ষাতো গেলই, ঠ্যাঙানির মাফ নেই। তারপরেও দাদার কাছে
আর না হয় বাবার কাছে নালিশ ; ভাত বন্ধ, বাড়িতে ঢোকা বন্ধ, আর প্যাদানে
তো পাছা লাল ; Final-এ ঠিক মেরে দেব দেখিস্।

ঃ আগে final পর্যন্ত যাবি, তারপরতো বাহাদুরী ? সে সুযোগ
তো জুটলো না !

ঃ তুই থাকতে আমাদের আটকাতে পারবে না, ঐ ব্যবস্থাটুকু যেভাবে হয়
করে দেনা, পড়ে হোক আর টুকে হোক ফেল আমরা করবো না।

ঃ ধরা না পড়লে তোদের ঐ Plan অবশ্য মন্দ নয় ; ঠিক আছে
অলকবাবুকে আমি বুঝিয়ে বলব, কেন তোরা ফেল করবি না।

ঃ তোর বুকের পাটা আছে, তুই পারবি, বলে দিস্। তা নামটা বাদ

৷খে বলবি ; আর বলবি, allowed না করলে অন্ধকারে ঠ্যাং ভেঙে দেব।

ঃ রাতের অন্ধকারে কারুর ঠ্যাং ভাঙা এমন কিছু বাহাদুরী নয়, অনেকেই । করতে পারে। কিন্তু তবুও একথা তোদের মুখে শোভা পায় না। খনই বলবে, গোলদার, তোকে allowed করে দিচ্ছি, আর টাকাও কিছু ম করে নেব, কাউকে বলবি না ; আর ওদের দলে যাবি না —তোদের ার খুঁজে পাওয়া যাবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে Form fill up করে মামার াড়ি গিয়ে বসে থাকবি। আসলে তোদের নিয়ে, তোদের ওপর ভরসা করে ঁকি নেওয়া বিপজ্জনক। চল্, শিশুতলার ওদিকে যাই, সবাই মিলে ালোচনা করা যাবে।

★

তৃতীয় দিনে দারোগাবাবুর ভয় কেটে গেল। কচ্ছপের প্রাণ দীননাথ ত্যুর সংগে একটানা দু'দিন লড়াই করে জয়যুক্ত হলো। অবস্থা একটু ভাল দেখে দারোগাবাবু ওকে কোর্টে চালান করে দিলেন। ভাবটা যেন, শেষ পর্যন্ত দি মরতেও হয়, ওদিকে গিয়ে মরো —আপদটাকে এখান থেকে সরাও।

গাড়ী থেকে ধরাধরি করে ওকে কোর্টে হাজির করলো। অবস্থা সংকটা- ন্ন দেখে ম্যাজিষ্ট্রেট সংগে সংগে জেলে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

ডাকাতি-মার্ডার কেসের আসামী আসছে, জেলখানায় আগেই খবর পৌঁছে গেল। অনেক দাগী আসামী বন্ধুর শুভ আগমনের জন্যে অধীর াগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কোথায়, কোন্ ওয়ার্ডে তার শোবার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে, তাও মোটামুটি স্থির হয়ে রইল।

জেলখানায় নতুন আসামীদের বন্দীরা এক অভিনব উপায়ে আপ্যায়ণ করে থাকে। আসামীর status বিচার করা হয়ে থাকে তার case অনুযায়ী। বড় কেস্ অর্থাৎ জঘন্য কেসের আসামীদের status বেশী। আর with- out passport, চুরি, ছিনতাই এসব ছোট-খাট কেসের আসামীরা অস্পৃশ্য। এর মধ্যে political কারণে ধৃত আসামীদের কথা আলাদা, এসব বিচারকেরা ওদের classification নিয়ে মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়।

তাই, আসামীদের আপ্যায়ণও হয় তদনুযায়ী। জেল প্রশাসনের কর্ণ- ধার সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীরা, তাদের মধ্যে যারা পাহারায় উন্নীত হয়েছে,

তারা এই সমস্ত হিরোদের (বড় আসামী) যথেষ্ট সমাদর করে। জমাদা দের চাকরীর চিন্তা করে, নামমাত্র তল্লাশী করে ছেড়ে দেয় এবং থাকবা খাবার ভাল ব্যবস্থা করার জন্যে চ্যালাদের নির্দেশ দিয়ে দেয়। জমাদারে এ সবই জানেন, কোন আপত্তি করেন না ; কারণ ওরাই তো সারাজী জমাদারদের বন্ধু, দু'পয়সা বাড়তি আয়ের মূলসূত্র, সহযোগী।

কিন্তু এদের জ্বালাতনে অস্পৃশ্যদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। এদের আপ্যা হবে চুলটানা, চিমটীকাটা থেকে চড়, লাথি, পিটুনী দিয়ে। স্বাস্থ্য রক্ষা কান ধরে বৈঠক তো গরীবের অনাহারের মত দৈনিককার খাদ্য। তল্লাশীর না যা হয় তা সভ্য সমাজের সামনে বর্ণনা সম্ভবতঃ দণ্ডনীয়। বৈধ, প্রয়োজনী কোন দ্রব্য বহুদফা তল্লাশীর পর কদাচিৎ জেলের অভিষেক অনুষ্ঠান পর্য পৌঁছালেও এখানে স্বজাতির জমার (?) ভাণ্ডারে বিনা প্রতিবাদে অথবা প্রতিবা মূল্য পরিশোধান্তে রেখে যেতে বাধ্য হয়।

দীননাথ ওদের প্রতীক্ষা পূর্ণ করলো। প্রত্যক্ষভাবে আনন্দ না দি পারলেও অর্ধ চৈতন্য তার বিরাট বপুটা ওদের মনে আশার সঞ্চার করলো- হয়তো গুরুর কাছে কিছু শেখার থাকবে।

গুরুতর রোগী সংবাদ পেয়ে বিরক্ত ডাক্তার সাহেব ছুটে এলেন। রোগী অবস্থা দেখে ডাক্তার সাহেব ওকে জেল হাসপাতালে রাখতে সাহস পেলে না, সাথে সাথে Transfer করলেন সদর হাসপাতালে।

কড়া পুলিশ পাহারায় দীননাথ হাসপাতালে আস্তে আস্তে সুস্থ্য হয়ে উঠা থাকে। শ্যামল প্রায় প্রতিদিনই এসে দীননাথকে দেখে যায়। ডাক্তারদে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবার জন্যে অনুরোধ করে, নার্সদের (অতি) ক মেজাজ সহ্য করেও দিদি-দিদি, sister-sister বলে পিছু পিছু ঘুরে তোষামো করে। দীননাথের প্রকৃত চরিত্র ওদের বোঝাবার জন্যে D. C. দেওয়া চিঠির একটা কপি ওদের দেখিয়ে বললো,—প্রকৃতপক্ষে সে একজ অত্যন্ত সৎ, ভদ্র কৃষক ; কিন্তু ডাক্তার নার্সদের অযত্নের কোন পরিবর্তন হ বলে শ্যামলের মনে হলো না। তবুও বারে বারে ওদের অনুনয়-বিনয় ক যায়, আর মনকে প্রবোধ দেয়,—এ ছাড়া আর কি-ই বা করার আছে! দী নাথের স্ত্রীকেও ক'দিন সংগে এনেছে, স্বামীকে দেখে গেছে।

দীননাথের অবর্তমানে পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়লো। প্রতিদিনের মজুরীর সামান্য টাকায় কোন রকমে সবাই বেঁচে ছিল। এখন তাও নেই, দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে ওর স্ত্রী চোখে অন্ধকার দেখলো।

ইতিমধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভজার সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেবার হুমকি দিলেন। তার অপরাধ, সে ডাকাত পুত্র। তাছাড়াও সরল প্রাণ বালকটির ওপর কোন কোন তথাকথিত শিক্ষক অমানবিক ব্যবহার শুরু করলো। একদিন ভজা এসে শ্যামলের কাছে কেঁদে পড়লো। সব শুনে শ্যামল উত্তেজনায় ফেটে পড়লো, ক্লাসের দু'চারজন ছাত্রের কাছে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে সোজা Teacher's Common room-এর মধ্যে ঢুকে শিক্ষক নামধারী পশুটার কলার চেপে ধরলো, সজোরে বসিয়ে দিল ক'খানা। শক্তিতে শ্যামলের পেরে ওঠবার কথা নয়, শ্যামলের কীর্তিটাও অপকীর্তি, কিন্তু নৈতিকতার দিক দিয়ে তিনি এত দুর্বল যে, প্রতিবাদ করার সাহস পেলেন না।

ব্যাপারটা ঐ শিক্ষকই বেশীদূর এগিয়ে নিতে রাজী হননি। শ্যামলদের বিরোধীতায় ভজাকে স্কুলের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি।

শ্যামল বাড়ি থেকে চাল, ধান চুরি করে দীননাথের স্ত্রীকে সাহায্য করে। নিজের খাতা-পত্র মাঝে মাঝে ভজাকে দিয়ে দেয়। দীননাথের স্ত্রী জানে শ্যামল কাউকে না বলে ওগুলো তাদের জন্যে দিয়ে আসে। সন্তানতুল্য শ্যামলের এই মানসিকতায় দীননাথের স্ত্রীর চোখে জল এসে যায়—না বলতে পারে না। ফিরিয়ে দিলে ছেলে-মেয়ে না খেয়ে থাকবে। তবুও শ্যামলের মাকে গিয়ে বলে, শ্যামল ওগুলো দিয়েছে সে কথা। আর সবই মনে মনে হিসাব করে রাখে, পারলে কোনদিন পরিশোধ করে দেবে।

শ্যামলের মা সবই বুঝতে পারে। ছেলের মানসিকতা তিনি জানেন, তাই, ছেলেকে এ কাজে তেমন বাধা দিতে চান না। তবুও বলে দেন, ঠিক আছে; তোমার ওগুলো ফেরৎ দিতে হবে না বৌমা, আমি শ্যামলকে বারণ করে দেব।

এতদিনে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীননাথের স্ত্রী শত্রু-মিত্রকে আলাদা করতে শিখ্‌ছে। প্রতিবেশীদের অনেককেই সে চিনে গেছে, অনেকের সম্পর্কে তার ভুল ভেঙে গেছে। দীননাথ এতদিন যাদের জন্যে বহু কিছু

করেছে, তারা কেউই বিপদের দিনে তার বউ-ছেলেমেয়ের দিকে মুখ ফিরি
তাকালো না বরং ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। পাড়ার তার মতো অনেকেই-
যাদের সাহায্য করার সামর্থ্য নেই কিন্তু দিনান্তে একবার এসে খোঁজ খ
নিতে ভুল করে না, দুটো কথা বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা—এযে আ
তার কাছে কত মূল্যবান, অন্যে কি বুঝবে।

মনাবাবুর চলাফেরা কয়েকদিন থেকেই তার ভাল লাগছে না। অবশে
একদিন দুপুর বেলায় মনাবাবু মনের কথাটি সরাসরি বলেই ফেললেন।
লাইনে উঁনার অভিজ্ঞতা অন্তহীন। মানুষের বিভিন্ন দুর্বলতার সুযোগ নি
তিনি যে কত নারীর সতীত্ব নষ্ট করেছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান তি
নিজেও দিতে পারবেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এ অবস্থাতে দীননাথের
তাঁকে কখনই হতাশ করতে পারে না। তাই. কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়
উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

দীননাথের স্ত্রী একবার ভাবলো বুড়োটাকে ধরে আচ্ছা করে ঝাঁট
পেটা করে দেবে; কিন্তু মুহূর্তে নিজকে সংযত করে নিলো. তাতে নিজে
বদ্‌নাম হবে, ওরতো দু'কান কাটাই। তাই. দৃঢ়তার সাথে বললো. অ
টাহার দেমাক হয়ে থাহেতো আরও পাঁচটা বিয়ে করো, নিজির বউ য
মিষ্টি না লাগে তোমার মায়েডাতো বয়েস্থা. ওরে নিয়ে শুয়ে থাহোগে. ক
এরে এত দূরি আসতি হবে না। আর খবরদার, এ দিরি আর পা বাড়া
গলায় বটী বাধাবো; মনে থাহে যেন আমি দীনোর বউ।

দীননাথের স্ত্রীর ভৈরবী মূর্তি দেখে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শেষ পর্যন্ত শোনা
সাহস হলো না মনাবাবুর। ভাল মানুষের মত কেটে পড়লেন, যেন কিছু
জানেন না তিনি।

মনাবাবু চলে গেলে কান্নায় ভেঙে পড়লো দীননাথের স্ত্রী। কি ক
সে বেঁচে থাকবে এই সংসারে। সমাজের জঞ্জাল দু'হাতে ঠেলে ঠে
সে ক্লান্ত।

মনাবাবু বদ্ প্রকৃতির লোক। নিজের ঘৃণ্য প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে ব
জঘন্য কাজ তিনি করেছেন, সে কথা দীননাথের স্ত্রীও কিছু কিছু জানে; কি
নিজকে ওর বিকৃত প্রবৃত্তির থাবার মধ্যে পড়তে হবে এযে স্বপ্নেও চিন্তা করে

বাদী কেস্‌টা তুলে নিতে রাজী হলো, কিন্তু দারোগাবাবু বিভিন্ন আইনের ্যাকড়া তুলে বাদীকে বুঝিয়ে দিল কেস্‌ তোলা মস্ত বিপদ, পরবর্তীকালে ল্ট কোন কেস্‌ হলে তার রেহাই থাকবে না। এভাবে বহু টাল-বাহানার র শেষ পর্যন্ত আর withdraw করানো সম্ভব হলো না। জামিনও লা না। ফলে, কতদিনে দারোগাবাবু অন্যান্য আসামীদের ধরতে সমর্থ হবেন রপর চার্জসীট দেবেন, কেস্‌ ট্রায়ালে উঠবে। তারপর যাচাই করার সময় াসবে দীননাথ দোষী না নির্দোষ। সে কত মাস বা বছর অথবা দশক কেউ দতে পারে না। বিচার কালে টাকা ছড়াতে পারলে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া ঠিন নয়, আর তা না পারলে খালাস পাওয়া প্রায় অসম্ভব। দীননাথের নিজের পরিবারের ভবিষ্যতে কি ঘটবে কে জানে!

সমিতির কাজ করতে গিয়ে কেউ বিপদে পড়লে সমিতি সাহায্য করবে সিদ্ধান্ত লিখিত থাকলেও কার্যতঃ তা সম্ভব হলো না, করার মত শক্তি সমিতি র্জন করার অবসর পায়নি। তাছাড়া নেতৃস্থানীয় সমস্ত কৃষকই পুলিশের পাতে এখন বেপাত্তা। সমিতির ক্রিয়া-কলাপ বাস্তবতঃ এ অবস্থায় বন্ধ য়ে পড়েছে।

মধুবচনবাবুর পরিকল্পনা আপাততঃ সফল হলো; ঠিকই কিন্তু ফ্যাসাদে পড়ে াছেন একমাত্র তিনিই। পরবর্তীকালে তার ওপর কেউ প্রতিশোধ নিতো ি-না তা যাচাই করার সাহস তিনি পাননি। T. E. O. কে ধরে, কিছু ঙ্কোচ প্রদানে সন্তুষ্ট করে অন্য থানাতে Transfer নিয়ে চলে গেছেন। চদিন হলো, কেউ আর তাঁকে এদিকে দেখেনি।

এরকম একটা ঘটনা কাউকে বলতে দীননাথের স্ত্রীর অত্যন্ত লজ্জা করছিল। াই ভেবেছিল ওকথা আর কাউকে বলবে না। কিন্তু উত্তরোত্তর মনাবাবুর াকেরা তার মোটেই ভাল লাগলো না। কিন্তু কথাটা যে কাউকে বলতে তার ন চাইলো না। অগত্যা শ্যামলের মাকে বললো, খুড়ীমা, ফাঁকা বাড়ী আমার ার একা একা থাকতে সাহস হচ্ছে না, কি করি কও?

শ্যামলের মা সবই বুঝতে পারলো। এ অঞ্চলে এ অবস্থায় এমনটি হওয়াটাই অস্বাভাবিক। বললো, বৌমা, আমার বাড়ীতে আমাকে একটু সাহায্য ারা জন্যে একজন লোকের দরকার। দুপুর বেলায় একটু স্কুলে যেতে হয়,

ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি আর এখন পারিনে। এতদিন তবু মেঝে মেয়েটা ছিল, সাহায্য করতে পারতো। জামাই চাকরী পেয়ে গেছে, মেয়েরও পাসপোর্ট হয়ে গেছে, কয়েকদিন বাদেই ও কলকাতায় চলে যাবে। তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমার কাজে একটু সাহায্য করতে পারো। ছোট মেয়েটাকে সংগে করেই এনো, খাওয়া-দাওয়া এখানেই করবে। ভজাও নাহয় এখান থেকে দু'টো খেয়ে নেবে। তাতে তোমারও একটু সুবিধা হবে, আমিও অনেকটা খাটুনির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবো। আমি তোমার শ্বশুরকে বুঝিয়ে বলবো, না বলবে না। রাতের বেলা এখানেই থেকো। শ্যামলকে আমি বলে দেব রাতের বেলা তোমার যেতে অসুবিধা হয়, ও গিয়ে ভজার সাথে তোমাদের বাড়িতে শোবে।

মাত্র কিছুদিন আগে পুলিশের নাম শুনলে দীননাথের থরহরি কম্প লেগে যেত। আজ দিব্যি যশোর সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতালে লাল কম্বলের উপর শুয়ে-বসে দিন কাটাচ্ছে, কোন ভয় নেই, ভীতি নেই, দুশ্চিন্তা শূন্য। যতটুকু ভাবতে হয় যে সংসার নিয়ে। বউ, ছেলেমেয়ে কি খেয়ে বাঁচবে।

দীর্ঘ চারমাস হাসপাতালের ভাল ভাল diet খেয়ে সে প্রায় পুরো-পুরি সুস্থ্য। একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু অন্য কোথায় কোন চোট আছে বলে তার মনে হয় না।

দীননাথ মাঝে মাঝে বসে চিন্তা করে ডাক্তার সাহেব কেন তাকে অতটা ভালবাসে। খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে তবে ওষুধ দেন, ইচ্ছা করেই অতিরিক্ত মাংস, মাছ, ডিম, কলা পাশ করে দেন। অথচ অন্যেরা কত ঝগড়া-ঝাটি, অনুনয়-বিনয় করেও কিছুই পায় না; ওষুধ তো ওদের মিক্চার ছাড়া অন্যকিছু দেনই না। কিন্তু কোন মীমাংসায় আসতে পারে না।

এরমধ্যে একদিন ডাক্তার সাহেব একটা শ্লিপ দিলেন দীননাথের হাতে। বললেন, general ward-এ গিয়ে এঁকে একটু খুঁজে নিয়ে এসো। কেউ তোমাকে আটকালে বলবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।

দীননাথ প্রত্যেকটা ward-এ গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল, কিন্তু খুঁজে পাওয়া কি সহজ কাজ!

যশোর জেলের capacity তখন পাঁচশ'। অথচ আসামীর সংখ্যা তিন হাজারের কম কখনও হয় না, কোন কোন সন্ধ্যায় চার হাজার অতিক্রম করে।

দীননাথ এক একটা ward-এর সামনে গিয়ে পাঁচ-সাত হাত দুর থেকেই ভাবসা গন্ধ আর গরম স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। আর লোকগুলো ওরই মধ্যে দিনের প্রায় সমস্তক্ষণ, আর সারা রাত আটক হয়ে পড়ে আছে।

দীননাথ কতকগুলো ward-এ খোঁজ নিয়ে কোন সন্ধান পেল না। আর পাবেই বা কি করে, এদিকে তো দীননাথ একেবারে নতুন, নিয়ম-কানুন তার জানবার কথা নয়। একজন পাহারাকে জিজ্ঞেস করাতে সে জানতে চাইলো নতুন—না পুরোনো আসামী? দীননাথ বলতে পারলো না, পাহারা নতুন আসামী হতে পারে অনুমান করে তাকে ১ নং ward-এ খোঁজ নিতে বলে দিল।

খোঁজ করলো কিন্তু সেখানেও নেই। একজন উপদেশ দিলো, ৫ নং ছোকরা ফাইলে খোঁজ করো। এখানেই দীননাথ তাকে পেয়ে গেল, অল্প বয়স্ক একটা ছেলে। সংগে নিয়ে সোজা চলে গেল হাসপাতালে ডাক্তার সাহেবের কাছে। অনেকক্ষণ কেটে গেছে, ততক্ষণে ডাক্তার সাহেবের ঘরে অন্য কোন লোকজন নেই; ছেলেটার জন্যেই তিনি বসে আছেন। ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি রোগ তোমার?

: কই স্যার, আমার তো কিছুই হয়নি।

: সে কি, তোমার কিছুই হয়নি?

: না স্যার, আমিতো ভাল আছি।

: সে কি, তোমার তো রাত্তিরে রাত্তিরে জ্বর হয় কয়েকদিন থেকে।

: না-না স্যার, আমার জ্বর হয়নি।

: হ্যাঁ হ্যাঁ হয়, তুমি জানো না, তোমার মা জানে।

আমি তো স্যার প্রায় পনেরো-বিশ দিন জেলখানায়, মা কি করে জানবে! —আমার কিছুই হয়নি।

: না-না তোমার শরীর ভাল নয়। টিকিটটা দাও, আর তোমার জিনিষ-পত্র সমেত পাহারাকে নিয়ে বিকেলে হাসপাতালে চলে এসো। —বলে হাসপাতালে admit করে নিলেন। প্রতিদিন অতিরিক্ত এক পোয়া চিকেন আর দু'টো করে ডিম পনেরো দিনের জন্যে পাশ করে দিলেন!

দীননাথের মাথায় কিছুই ঢুকলো না, ডাক্তার সাহেবের কি মাথা খারাপ।

—আট—

এত কাকুতি-মিনতি করে অনেক কিছুই পাশ করাতে পারে না, আর কারো কারো খুঁজে এনে জোর করে মাংস ডিম পাশ করে দেন। দীননাথের কেমন যেন ধাঁ-ধাঁ লাগে এসব আজব কাণ্ড দেখে।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। দীননাথ এখন পুরোপুরি সুস্থ। তার মাশল্‌পূর্ণ শরীরে অল্প অল্প মেদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। এ অবস্থায় ডাক্তার সাহেব একদিন তাকে discharge করে দিলেন হাসপাতাল থেকে। বিকেল বেলায় দীননাথ চলে গেল ১নং আমদানী ওয়ার্ডে। শুয়োরের মত গাদাগাদি হয়ে লোকগুলো যেন দিব্যি আরামে পড়ে আছে, আরামবোধ করা ছাড়া গত্যন্তরই বা কি! মানসিক দিক দিয়ে এ অবস্থাকে কেউ একবার অসহ্য মনে করলে এখানে সে টিকতে পারবে না। তাই, এ নিয়ে কেউ চিন্তা করতে চায় না, অবস্থার সংগে মানান সই হয়ে উঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

দীননাথ লক্ষ্য করলো, জায়গার তুলনায় লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। সবাই দাঁড়িয়ে থাকলেও যেন জায়গায় সংকুলান হওয়া কঠিন। তারপর সন্ধ্যার সময় দশ-বারোজন পাহারা ঢুকবে, ওদের জন্যে অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশজনের জায়গা ছাড়তেই হবে। আর কপাল মন্দ হলে সন্ধ্যের পর কোর্ট থেকে এক দু'শ আসামী আসবে না এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। কিন্তু নিয়ম হলো, যত আসামীই আসুক, সব থাকবে ১নং আমদানী ফাইলে (ওয়ার্ড), তাতে শোবার কেন, দাঁড়াবার জায়গা হলো কি-হলো না সেটা দেখার ব্যাপার নয়। সকাল বেলায় একটা অংশকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হবে, যাদের টিকিট হয়ে যাবে।

সন্ধ্যের আগে ঘন্টা পড়ার সংগে সংগে ফাইল ফাইল বলে চিৎকার শুরু হলো। সবাই গিয়ে শূন্য পাছায় পায়ের উপর ভর দিয়ে চারজন প্রথমে এবং একইভাবে চারের পিছনে চার, লাইন দিয়ে বসে পড়লো, বসবার ভংগীটা হবে যেভাবে লোকে পায়খানায় বসে। একটু এদিক-ওদিক বা দেরী হচ্ছে পাহারাগুলো যথেচ্ছ মার ধোর করে যাচ্ছে।

দীননাথ সবার দেখাদেখি ফাইলে গিয়ে বসলো। হাসপাতালে থাকার জন্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলেও ওখানে বসে গল্প শুনেছে, সেজন্যে বুঝতে অসুবিধা হলো না।

একটু বাদেই পাহারাদের একজন দীননাথকে ডেকে তুলে নিয়ে গেল এবং পাহারা ও অন্যান্য কয়েকজন হিরোদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে বললো।

দীননাথ প্রথম দিন থেকেই এই সমস্ত কুখ্যাত ডাকাতদের মোটেই আপন করে নিতে পারেনি। ওদের প্রশ্নের জবাবে বারে বারে বলেছে, সে ডাকাতি করেনা, ডাকাত নয়, মিথ্যে কেসে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করেনি, বরং ওদের মনে হয়েছে দীননাথ অত্যন্ত গভীর জলের মাছ, ফুচ্‌কে চোরের মত বকাটে নয়। তাই, ওর প্রতি ডাকাতগুলির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস গভীরতর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, দীননাথের দৈত্যের মত চেহেরা ওদের ভুল বুঝতে সাহায্য করেছে।

জমাদার এলেন, গুনলেন, চলে গেলেন, ফাইল কিন্তু ভাঙবে না; প্রত্যেক ward-এ গোনা হবে, জমাদারেরা case table-এ report করবেন, হিসাব মিলবে আবার ঘন্টা বাজানো হবে তারপর ফাইল ভাঙবে। কম অথবা বেশী হলে আবার গোনা হবে, মিলানো হবে, সে অনেক ঝামেলা — যাহোক একবারেই মিলে গেল, আবার ঘন্টা বাজলো, ফাইল ভেঙে দেওয়া হলো, ততক্ষণে দু'ঘন্টাতো বটেই।

দীননাথের কপাল তাকে সহযোগিতা করলো, খুব বেশী আসামী কোর্ট থেকে আসেনি।

সন্ধ্যার পর অনেকের সাথেই দীনোনাথের আলাপ হলো। দীননাথ দেখলো তার মত নিরপরাধীর সংখ্যাই বেশী, ছোট বড় বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা কেসে জড়িয়ে তাদেরকে জেলে পাঠানো হয়েছে, পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাবে ও ঘটনার মধ্য দিয়ে সে তার ধারণার সমর্থনে বহু তথ্য পেয়েছে।

রাত্রি ন'টার দিকে শুরু হলো শোবার আয়োজন। পাহারাগুলো গিয়ে অভিভাবকসূচক তদারকি শুরু করেছে। জ্যান্ত মানুষগুলোকে জড় পদার্থের মত সাজানোর কাজে প্রত্যেক দলে তিনজন করে মোট ছ'জন পাহারা হাত লাগিয়েছে। একজন হাত, আরেকজনে পা ধরে এক একটা হতভাগাকে টান্‌ছে; আর অপরজনে কোমরে মৃদু মৃদু লাথি মেরে গেদে দিয়ে যাচ্ছে। এই অভিনব ব্যবস্থায় অনেক আসামী হেসে পড়ছে। পাহারা কাউকে থাপ্পড়

বসাচ্ছে, কাউকে বলছে—ভাই উপায় নেই। পঁচিশ-এর জায়গায় পাঁচ হাজার, তার মানে একজনের জায়গায় দশজন, ম্যানেজতো করতে হবে। পাহারা-চেহেরা দেখে এভাবে কাউকে মিষ্টি জবাব আবার কাউকে কিল-ঘুসি উপহার দিয়ে চলেছে।

এই সমস্ত নিষ্ঠুরতা যে প্রশাসনের অংগ। এ ব্যাপারে যে যত পারদর্শী কর্তৃপক্ষের কাছে সে তত প্রিয়। ফলে তাদের সব থেকে বড় কাম্য "মার্কা" স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশী মিলে থাকে। সম্পর্ক ভাল থাকার জন্যে একটু ভাল চালিতে কাম পাস হয়—সেখানে দু'টো টাকা বা বিড়ি সিগারেট আয় করতে অসুবিধা হয় না। সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে বক্‌শীস্ আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উৎকোচ। যেমন, নাপিত চালী। Division ward বা Detenue ward-এ গিয়ে চুল কেটে দিলে তারা ইচ্ছা করেই দু'চারটি সিগারেট বিড়ি দেয়, এটা বকশীস্; আর পানি চালীর পাহারাকে প্রতিমাসে দু'টাকা-পাঁচ টাকা করে contract করবে, পরিস্কার এবং পর্যাপ্ত পানি পাবে, নতুবা দু'মগ। স্নান হলো কি হলো না, কোন প্রশ্ন নয়। চৌকোর পাহারার সংগে contract করো বাটী ভর্ত্তি মাছ-মাংস বিছানায় পৌঁছে দেবে প্রভৃতি।

তাছাড়া সম্পর্ক ভাল রাখতে পারলে কিছুকিছু চালী আছে যেখানে পরিশ্রম কম ও বেশ ভদ্রভাবেই থাকা যায়। যেমন মাষ্টার চালী, রাইটার চালী, হাসপাতাল, মোড়া, তাঁত চালী, প্রভৃতি জায়গাতে কামপাস হবে।

অবশ্য শুধু ভাল সম্পর্কই এসবের নিয়ন্তা নয়, টাকা-পয়সাও কাম পাসের বেলায় খুব কম ভূমিকা পালন করে না। এসব ব্যাপারে সমঝোতা করে থাকতে পারলে ভুল ত্রুটি বা অন্যায় (জেল আইনে) মাফ পেয়ে যাবার সুযোগ থাকে। Report হয়ে carrer নষ্ট হয়না, মার্কা যাবার সম্ভাবনা থাকে না।

অন্যদিকে, কর্ত্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক ভাল না থাকলে বিপত্তির অন্ত নেই, বিপত্তির অন্ত থাকলে কি আর সমঝোতা কেউ করতে যেত! এ সমস্ত আসামীদের কামপাস হবে বাবু চালী (মেথর চালী), গোয়াল বাড়ি, পানি চালী (পাহারা নয়) বা wall duty-এর মত নোংরা বা শ্রমসাধ্য জায়গা-গুলোতে। অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পাপোশ চালী, সারাদিন বসে নারকেলের

ছোবড়া পিটিয়ে হাতে ফোস্‌কা উঠাও, না হলে দূরের কোন জেলে বদ্‌লী, বেশী দয়া হলে ডাণ্ডাবেড়ী লাগিয়ে সেল্‌বাস।

যারজন্যে অধিকাংশ কয়েদী ও পাহারা অপ্রয়োজনীয় ও অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে জেলের মধ্যে সর্বক্ষণ সন্ত্রাস জিইয়ে রাখতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে।

মিষ্টি জবাব, ভাল জায়গা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা মিলবার পিছনে পরিস্কার জামা কাপড় ও চেহারাটাই শুধু কাজ করে না। দু'টো বিড়ি বা একটা সিগারেট, একটু সাবান, দু'টো তামাকের পাতার ভূমিকা বড় কম নয়। এই সুন্দর ব্যবস্থাগুলো চালু রাখতেও অনাবশ্যক অত্যাচার একান্ত প্রয়োজন। আর মস্তানী করতে পারলে তো কথাই নেই, বিনা পূঁজির সফল ব্যবসা।

দীননাথের মত কেস্‌গুলো ব্যতিক্রম। দীননাথকে রাতের বেলা আদর করে পাহারাদের পাশেই জায়গা করে দিল। একেবারে জানালার পাশেই; লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যাতে একটু হাওয়া লাগতে পারে, একশ' পাওয়ারের বাল্‌বটা বেশ দূরেই, যাতে চোখে না লাগে—কোন উৎকোচের বিনিময়ে নয় বরং উল্টে আদর করে 'বোম' ধরিয়ে খাইয়ে দিল ওরা। চিন্তার কোন কারণ নেই, এ বোম সে বোম নয়। এটাকে তৈরী করতে লাগবে কুঁচিকুঁচি করে কাটা পানবোটের তামাক; গুড় দিয়ে ভাল করে মেখে খাতার কাগজে বিড়ির মত মোড়ালেই বোম তৈরী। অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করলো, তারপর ঘুমাতে বলে যার যার বিছানায় গেল।

দীননাথের রাতে ভাল ঘুম হলো না। রাত জেগে পাহারাদের জমা দেওয়া শুনলো। দু'ঘন্টা পর পর সেপাই পাল্টানোর সাথে সাথে পাহারা পাল্টেছে। আর বিভিন্ন ভংগীতে, সুর করে তিন নম্বর ওয়ার্ড দু'শ দশ জমা ·····, দশ নম্বর ওয়ার্ড পঁচিশ জমা · (এটা রাজবন্দীদের ওয়ার্ড, লোক কম) ইত্যাদি। দীননাথ এসব শুনেছে আর হিসাব করেছে কতগুলো ওয়ার্ড সর্বমোট, কোন ওয়ার্ডটাই বা সবচেয়ে বড়, আসামী বেশী।

ভোরবেলায় জেগেই ছিল দীননাথ। ঘন্টা পড়ার সাথে সবার সংগে ফাইলে বসলো। যাদের কেষ্ট ফাইল (case table) হবে তাদের নাম ডেকে আলাদা করে ফাইল দেওয়ানো হলো।

জমাদার এলেন, গুনলেন, চলে গেলেন, ঘন্টা বাজলো, ফাইল ভেঙে

গেল, সবাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো পায়খানার জন্যে লাইন দিতে—প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলিকে বশ মানানোর এ এক কঠিন সাধনা। কেষ্ট ফাইল ওয়ালা-দের কিন্তু ফাইল ভাঙা চলবে না, প্রাকৃতিক প্রয়োজনকে এখানে থমকে দাঁড়াতে হবে। কেষ্ট ফাইল অর্থাৎ জেলারের ফাইল, তারপর ডি, আই, জি,র ফাইল, ততক্ষণে বেলা এগারো-বারোটা, আসামী বেশী হলে আরও দেরী; এবার প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলোর ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে।

দীননাথের জন্যে আইনের ধারাগুলোকে একটু শিথিল করতে অসুবিধা ছিল না, সব সেরে কেষ্ট ফাইলে গিয়ে বসলো। হাসপাতালে থাকবার জন্যে ব্যতিক্রম হিসাবে এ আনুষ্ঠানিকতা ওর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অন্যান্যদের সাথে জেলখানার মাঝামাঝি বড় নিমগাছের নীচে case table- এর সামনে বসে রইলো।

জেলাব সাহেব জমিদারী চালে এগিয়ে এসে আসন গ্রহণ করলেন। হাতে ছড়ি, মাথায় টুপি, পরিপাটি টেট্রনের খাকী পোষাক, three star কাঁধের ওপর। সামনের পথ নির্দেশক সুবেদার সাহেব টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন, অন্যান্য সাংগ-পাঙ্গেরা আশেপাশেই রইলো, পিছনে বিরাট পাখাটি একজন কয়েদী ধীরে ধীরে দুলিয়ে হাওয়া করতে লাগলো।

পাহারাদের কড়া নির্দেশ কেউ অমান্য করলো না। আগেই পায়ের চটিগুলো খুলে নিমগাছের গোড়ায় জমা করে রেখেছে, জেলার সাহেব আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করলো।

কয়েদী ও অন্যান্য কয়েকজন পুরোনো হাজতি বিভিন্ন অভিযোগে case table-এ আনীত হয়েছিল। কয়েদীরা নিজ নিজ চালিতে কাজে যাবে বলে সুবেদার সাহেব ওদের কেসগুলো আগে দাখিল করলেন।

দীননাথ দেখলো কয়েদীদের বেশীর ভাগ case হলো ছোকরা ফাইল সংক্রান্ত, অপরাধ ছোকরা বাজী। ছোকরা বাজী কি, কেন তা অপরাধ, দীননাথের মাথায় এ সব জটিল ব্যাপার ঢুকলো না, ঢোকবার কথাও নয়। মানুষের জৈবিক ক্ষুধা চরিতার্থ করার এসব নোংরা, ঘৃণ্য উপায় সে জানতে পারলো আরও কিছুদিন বাদে।

অন্যান্য case গুলো চুরি, মারামারি ও অন্যান্য ধরণের শৃঙ্খলাভংগ সম্বন্ধীয়।

জেলার সাহেব ওদের টিকিটে কি সব লিখে D.I.G. ফাইলে হাজির করার নির্দেশ দিলেন।

সুবেদার সাহেব এক একজন করে নাম ধরে ডাকেন। এগিয়ে যেতেই পাহারা ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে বলে, সোজা হয়ে দাঁড়াও, হাত নামাও, সেলাম করো। নতুন নতুন আসামীরাতো সবাই তখন বলীর পাঁঠা, যান্ত্রিকভাবে করে যায় এসব। সুবেদার সাহেব টিকিট ধরে পড়ে দেন, নাম, বাবার নাম, একটা লুঙ্গি, একটা গেঞ্জি, একটা গামছা, দুটো টাকা— আর কিছু? আসামী মাথা নেড়ে জবাব দেয়, না। চলে যাও। আসামী আবার গিয়ে নিজের জায়গায় ফাইল দিয়ে বসে। এ ভাবে একে একে সবার হয়ে গেল, জেলার সাহেব প্রত্যেকটা টিকিটে সই করলেন, পারিষদ-দের নিয়ে অন্তর্ধান হলেন।

জেলখানাতে সামন্ত যুগের সমস্ত অব্যবস্থাগুলোকে সযত্নে প্রতিপালন করা হয়েছে। জেল প্রশাসনের সার বস্তু এখানেই লুকিয়ে আছে। জেলখানার অফিসারদের সাধারণ আসামীদের কাছে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হয় যাতে তারা ঐ সমস্ত আমলাদের শ্রদ্ধা করে, ভয় করে আর সমীহ করে, শান্ত ছেলের মত অত্যাচার হজম করে; ত্রাসকে ত্রাণকর্তা বলে মনে করে।

দীননাথের সাথে দেখা করে শ্যামল বুঝতে পারলো, সে অনেকখানি শক্ত হয়ে গেছে। বাড়ির চিন্তা মাঝে মাঝে কষ্ট দিলেও, সে তাতে আর মুষড়ে পড়ে না; কিছু কিছু সাজা প্রাপ্ত রাজনৈতিক আসামীর সংগে আলাপ-আলোচনার ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষিত হয়ে উঠছে এবং তাতে ওর আগ্রহ বাড়ছে। দীননাথ কথার মধ্যে একবার বলেই ফেললো, ভাইডি, আমি দেখলাম চোর-ডাহাত জেলে আসে (এসে) আরও পোক্ত হয়, আইন-কানুন শেহে আর ফাঁহি দিবার পথও জানে যায়, মেলা দলবলের খোজ পায়, নিজিগে মধ্যি অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করে চালু হয়। আর তাছাড়া আমি তো দেখতিছি জেলখানা চোর-ডাহাত জব্দ করার জাগা না, উগে আরও চুরি, বদমাইশি শিহেনে জাগা, এর মধ্যি তো চুরি, কারচুপি আর নষ্টামী ছাড়া কোন কাজই হয় না।

আর রাজনীতি যারা করে, তারাও বসে থাহে না। হ্যানে আসলি

আরো রাজনীতি শিহে যায়, এর মধ্যি নিয়ম করে রাজনীতির ক্লাস হয়, আলোচনা হয়, দেশের কনে কি হচ্ছে দৈনিকির সংবাদ দৈনিক পাওয়া যায়, ইরা যেন আগেরতে জানে থাহে কনে কি হবে। তাই বুলে ক্লাস কিন্তু ঐ স্কুলির মত না। চুরি করে, গোপনে এসব চলে, বড় বড় নেতারা আছে, আমার বেশ ভাল লাগে এ সব।

শ্যামল দু'বার এর মধ্যে ঢুকেছে। মাত্র দু'-চার দিনের জন্যে হলেও এ সব সে জানতো। সে জানে কেমন ক'রে Contractor-দের সাথে যোগ-সাজসে কর্তৃপক্ষ আসামীদের অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়ায়। শব্জীর টেণ্ডার নিয়েছে হয়তো প্রতি সের দেড় অথবা দু'টাকা; কিন্তু চার আনার বেশী দামের শব্জী কখনও ভিতরে ঢুকবে না। পচা, শুকনো, যা বাজারে অবিক্রিত সেটা যাবে জেলের মধ্যে। কোন্ শব্জীর season কোন্‌টা জেলের মধ্যে কেউ বোধ হয় বুঝতে পারে না, হিসাব করে না দেখলে। প্রায় একটা বছর পিছিয়ে থাকে জেলখানার শব্জীর বাজার। বাজারে যখন লোকে নতুন পটল কিনছে, মাত্র তার কয়েকদিন আগে থেকে জেলখানায় পটলের জোগান শুরু হবে, আগের বছরের পটল, সোনালী রং। তবে মিষ্টি (একমাত্র) কুমড়োর বেলায় তা প্রায়ই হয় না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মিষ্টি কুমড়োর দাপটে আসামীরা আমাশয়ে ভুগতে থাকতে। আমাশয়ের বীজ হিসাবে শুধু কি মিষ্টি কুমড়োই আসামীর কাঠ গড়ায় হাজির হবে? —না তা নয়। রুটির অবদান কম নয় এ ব্যাপারে। হাতির কানের মত বিরাট বিরাট রুটি। নির্দিষ্ট ওজনের কম হলে আসামীরা আপত্তি তুলবে, বিপাকে পড়বে চৌকোর পাহারা। ফলে, ওজন ঠিক রাখতে হবে। কিন্তু, কিভাবে ওজন ঠিক থাকবে? —গুদাম থেকে তো এক তৃতীয়াংশ বেরিয়ে গেছে। যার একটা Percentage তারাও (পাহারারা) পাবে, পাবে জমাদার থেকে—ডেপুটী জেলার, ডি আই. জি. পর্যন্ত, কেরাণীরাও বা বাদ পড়ে কেন! শুধু আটার বেলায় নয়—খড়ি (কাঠ), তেল, ডাল, মাছ-মাংস, চাল কোনটি নয়? প্রত্যেকটার বেলাতে মোটা অংকের পাচার হবে, বিক্রি হবে কালো বাজারে। কিন্তু, তবুও রুটির ওজন ঠিক রাখা চাই। তারজন্যে কখনও রুটি ঠিকমত সেঁকা হবে না, খাওয়ানো হবে কাঁচা রুটি, চেহারা দেখে তা মনে হয় অখাদ্য-

খাদ্য ভেজালও চলে।

সব্জীর মত মাছের বেলায় হবে পচা, মাংসের বেলায় পচা নয়, তবে াসীর বদলে আসে মিসেস্ খাসী ; তার আবার ছিনে আর গর্দ্দানের মাংস াবে সাহেবদের kitchen-এ। চাল-ডাল-আটা-তেল সরকারী গুদাম থেকে াসে, ওখানে কপাল ভাল হলে ভাল আসে, নতুবা খারাপ ও হয়। –তাই শ্যামল অবাক হলো না।

জেল গেট থেকে বেরিয়ে সোজা ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে। বললো, াচা, দাদাকে অনেকদিন হলো discharge করেছেন, এমনতো কথা ছিল না? : আরে ভাবিস্‌নে, আমি আবার নিয়ে যাবো। আমার চাকরীটাও তো াচাতে হবে। আমি কারুর সাথে বেইমানী করিনে, তুই যা, কালই ওকে ডেকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে নেব।

★

সবাই শিশুতলায় এসে জমা হলো। Result-এর খবর পেয়ে একেঁ একেঁ আরও অনেকে এসে একত্রিত হলো। স্কুলের টিফিনের ঘণ্টা বেজে ঠলো। সমস্ত ছাত্রেরা এসে যোগদান করলো ওদের আলোচনা সভায়। ুলের ছাত্রেরা অনেকদিন নিরিবিলি থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে, তারা চায় গালমাল একটা বাঁধুক।

শ্যামল সোজা রাস্তার দিকে গলালম্বা করে দেখলো ময়রা বাড়ির পাশ দিয়ে বিষ্ণুদা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

শ্যামল সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো, আমরা প্রায় সবাই এসে গেছি, বিদেশী ছাত্রেরা এখন বাড়িতে, তাদের এই মুহূর্ত্তে পাওয়া যাবে না ; বিষ্ণুদাও আসছে, সবাই মিলে তাহলে একটা পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে সেমত লড়াই শুরু করতে হবে।

শিশুতলা থেকে সরে গিয়ে সবাই মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর বসলো। শ্যামল প্রস্তাব করলো, বিষ্ণুদা আলোচনা সভার সভাপতি হোক। —সবাই চিৎকার করে প্রস্তাব সমর্থন করলো।

শ্যামল : সভাতে একজন সভাপতি না থাকলে শৃঙ্খলা থাকে না। সবাই

এলোমেলোভাবে যার যার মত্ ব্যক্ত করলে হৈ চৈ হয়, আসল কাজের কিছুই হয় না। তাই, আশা করবো, সবাই কথা বলার আগে সভাপতির অনুমতি নেবে।

বিষ্ণুদা ওদের সহপাঠী হলেও বয়সে সবার থেকে বেশ বড়। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটায় ওর বাড়ি। বিদেশী ছাত্র হলেও কদাচিৎ ও বাড়িতে যায়। বেশ বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন, শান্ত ও ভদ্র বলে সহপাঠীরা বড় ভাই-এর মত মান্য করে। শিক্ষকরাও স্নেহ করেন, ভালবাসেন সবার অধিক।

বিষ্ণুদা : শ্যামল, তোমার সাথে স্যারদের কতদূর কি কথা হয়েছে বিস্তারিত বলো।

শ্যামল প্রথমেই অন্যান্য সবার সাথে পরামর্শ না করে শিক্ষকদের সাথে আলোচনায় জড়িয়ে পড়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল। তারপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার বিষয়বস্তু ব্যক্ত করতে চেষ্টা করলো। ইতিমধ্যে টিফিন শেষের ঘণ্টা বেজে উঠলো। স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে শ্যামল বললো, প্রয়োজনে স্কুলের সমস্ত ছাত্রদের সহযোগিতার জন্যে এগিয়ে আসবার প্রয়োজন হতে পারে, আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে হতে পারে, আশাকরি, তোমরা সেজন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকবে। সবাই উল্লসিত হয়ে সাড়া দিল। বিষ্ণুদার অনুমতি নিয়ে সবাই চলে গেল।

স্কুলের ছাত্রেরা চলে গেলে সবাই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। এতক্ষণে শ্যামল ভলিবলটা আটকে রেখেছিল। ছেলেরা চলে গেলে ওটাকে একপাশে ঠেলে রেখে দিল, ওটা নিয়ে ঝামেলা করার এখন কেউ নেই।

বিষ্ণুদা বললো, আমি মনে করি এ সময়ে ছাত্র ছাঁটাই আর অত টাকা পরীক্ষার fee চাপানো অন্যায়-অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাকে যদি আজ আমরা মেনে নিই, তাহলে disallowed বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তাছাড়া, এই অন্যায়-অত্যাচারের কাছে মাথা নত করা, আপোষ করা আমাদের শুধুমাত্র বৈষয়িক ক্ষতি—তা নয়, অন্যায়ের সংগে আপোষ করাকে আমি মনে করি আমাদের নৈতিক অধঃপতন, হীন মনোবলের পরিচয় দেওয়া। আমাদের বহু সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অর্জিত ভাবমূর্ত্তির ওপর কালি লেপন করা। তাই, এ সবের প্রতিবিধানার্থে আমাদের লড়তে হবে, কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখবে আমরা

ঙ্গ যেতে রাজী আছি, কিন্তু বাঁচতে প্রস্তুত নই।

মহেন: এখন কি করতে হবে তাই বলো বিষ্ণুদা।

শ্যামল: আলোচনা করে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। একটু চিন্তা র কোন ভাল যুক্তি দে। কি করতে হবে, কি করতে হবে, বলে চিৎকার র কোনো লাভ আছে?

: এখন বিনয়বাবু থাকলে খুব সুবিধা হতো, কাউকে কিছু না বলে নি চলে গেলেন।

: বিনয়বাবু থাকলে এসব সময় সুবিধা হতো বলে বিনয়বাবুকে তাড়িয়ে ওয়া হলো। উনি কি আর ইচ্ছা করে চলে গেলেন?—আমাদের সংগে ধা করে, একটু বলে যাবার কোন সুযোগ পেলেন না।

বিনয়বাবুর কথা ওঠায় শ্যামলের উনার কাছ থেকে শেখা কতকগুলো rm মনে পড়ে গেল। ওগুলো ব্যবহার করার লোভ শ্যামল সামলাতে রলো না। বললো, মহেন, আগে আমাদের রণনীতি স্থির করতে হবে, রপর আসবে রণকৌশলের প্রশ্ন। তুই যা বলছিস্, ওটা কৌশলের মধ্যে ড়ে। আর বিষ্ণুদা যা বলছেন সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ হলো তি নির্দ্ধারণ।

বিষ্ণুদা যাকে অন্যায়-অত্যাচার বললো, তা অন্যায়-অত্যাচার কি-না, দি হয় তা কি ধরণের অত্যাচার, এর উদ্দেশ্যই বা কি? কি পাবার ন্যে আমরা লড়াই করবো, কার বিরুদ্ধে, কে আমাদের মিত্র, কে শত্রু—সবই সবাই মিলে স্থির করতে হবে। তারপর আসবে তোর কথা। ভাবে এর মোকাবেলা করতে হবে, কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে। তোর তমতো করার অর্থই হলো, অন্ধের মত হাতড়ানো, শূন্যে হাত-পা াড়া। ওভাবে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করা যায় না

মহেন: তুই নিশ্চয়ই ঐ সব বাংলা বিনয়বাবুর কাছে শিখেছিস্। নার কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেল খাটার ভয়ে স্কুল থেকে পালাতে হয়েছে। তারও বেশীদিন বাকী নেই; এ সব বাংলা দিনের বেলায় বলবি না, রাতে. াড়াতো দিনে কেউ বলে না ও সব।

:. তুই সব সময়েই বড় advance কথা বলিস্। যাকে বলে বাম-

বিচ্যুতি—দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ আর বাম-বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য খুব কম। তুই একদম কথা বলবি না. বড্ড ঝামেলা পাকাস্।

ঃ বাম বিচ্যুতি বুঝলাম, তা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদটা এখানে কি হবে?

ঃ এখানে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ হবে ওদের কাছে নতি স্বীকার করা অন্যায়ের সাথে আপোষ করা, নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ওদের সাথে সমঝোতা করা, ন্যায়সংগত আন্দোলন পরিত্যাগ করে, হীন মনোবলের পরিচয় দিয়ে লেজুড় বৃত্তি করে কিছু পাইয়ে দেবার চেষ্টা করা। কি তোর মাথায় ঢুকলো কি?

একজন প্রস্তাব করলো, বিনয়বাবু সম্পর্কে মহেনের অমর্যাদাপূর্ণ উক্তি করা ঠিক হয়নি, ও ওর কথা শুধরে নিক।

বিষ্ণুদা ঃ না-না তোমার কথা ঠিক নয়। মহেন সবার মতই বিনয়বাবুকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, বিনয়বাবুকে অসম্মান করার কোন ইচ্ছা নেই ওর।

সবাই বিষ্ণুদার প্রস্তাবে সম্মত হলো। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে অন্যায় অত্যাচার বলে স্থির হলো। এ সিদ্ধান্তকে ছাত্রদের উপর আক্রমণাত্মক মনোভাব বলে বর্ণনা করা হলো। এর প্রতিরোধে আন্দোলন করতে সবাই দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করলো।

শ্যামল ঃ সুজন, **Resulation** লিখে ফেল। স্থান, তাং, সময়, সভাপতির নাম, কে প্রস্তাব করলো, সমর্থনে একজনের নাম লিখবি, এভাবে ঠিক যেভাবে **Resulation** লিখতে হয়; সেভাবে লেখ্! কাকে আমরা অন্যায়-অত্যাচার বলছি সেগুলি বিস্তারিত লিখবি। কি, পারবি তো?

ঃ তোর একটা বড় দোষ আছে। কারুর উপর কোন কাজের ভার দিয়ে চুপ থাকতে পারিস্ নে, দিতেও চাস্ নে, তুই এসব প্রথমে এত ভাল বুঝতিস—নিশ্চয়ই না। বলে দিয়েছিস্ এরপর করতে দে। একটু খারাপ হলেও অন্যদের উপর দায়িত্ব কিছু কিছু দেওয়া উচিৎ; নতুবা তোকে যেমন চরকার মত ঘুরতে হয়, তেমনি কোন কারণে তুই না থাকলে এসব অচল হয়ে যাবে, মাতব্বরি একটু কমিয়ে দে।

শ্যামল ঃ তাহলে আমাদের দাবী কি হবে সেটাও পরিষ্কার হওয়া উচিৎ

আমরা আরও দশ-পনের বা বিশজনকে consider করলে সন্তুষ্ট থাকবো না—সবাইকে সুযোগ দিতে হবে এই সিদ্ধান্তে অটল থাকবো,—তা ঠিক করো।

সবার মত, কোন আপোষ নয়, পরীক্ষা দেবার সুযোগ দিতে হবে সবাইকে। টাকার অংক নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই এক বিপত্তি বাঁধলো।

ক্লাসে teacher না থাকায় কতকগুলো ছেলে এসে পাশেই ভলি পেটাতে শুরু করলো; তাতে বেশ অসুবিধা হলো। বিষ্ণুদা বললো, বলটা এদিকে দাও, এখন খেলা চলবে না। —একজন উঠে গিয়ে বলটা ধরে আনলো। এদিকে সবাই আলোচনায় মনোযোগ দেবার আগেই অমর ভলির ব্যাপারটা নিয়ে বাজে বক্‌বক্‌ শুরু করলো। বিষ্ণুদা বললো, অমর ঝামেলা করোনা; তুমি তো এমনিতেই কখনও কোন খেলাধূলা করোনা, আর যদি একান্তই আজ খেলতে চাও, একটু অপেক্ষা করো, আমাদের মিটিংটা শেষ হলেই তোমরা খেলতে পারবে।

ঃ বিষ্ণুদা ততক্ষণে তো আমাদের ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে যাবে।

ঃ বেশ তাহলে বিকালে খেলবে; এখন হয় এদিকে এসো, নতুবা চুপ করে থাকো।

অমর শ্যামলদের অনেক উপরে পড়তো, সঙ্গেও পড়েছে, এখন দশম শ্রেণীতে পড়ছে, একটা বাজে ছেলে।

পাশের একটা ছেলের কাছে বলটি ছিল। অমর তার হাত থেকে বলটি নিতে গেল, কাড়াকাড়ি হলো।

শ্যামল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। ও লক্ষ্য করলো অমরের দলের সব কটি ছেলেই ছাত্র লীগের। ওরা যে ইচ্ছে করেই একটা গোলমাল পাকাতে এসেছে শ্যামলের তা বুঝতে বাকী ছিল না, খেলা একটা অজুহাত মাত্র। গোলমাল এড়ানোর জন্যে সে কোন কথাই বলতে চায়নি; আর সেজন্যেই ওরা বেশী উৎসাহ পাচ্ছে। মনে মনে ভাবলো—লাথির কাঁঠাল লাথি না খেলে কখনই পাকে না। বললো, দেখি, বলটা আমার কাছে দাও। বিষ্ণুদা, তুমি শুরু করো!

অমর দাঁড়িয়ে চোখ পাকাতে পাকাতে বললো, শ্যামল, তোর বাবার কার বল নাকি, খেলতে দিবি না?

শ্যামল শান্ত স্বরে জবাব দিল, এখন খেলা চলবে না। যা, ওদিকে যা যা বলেছিস্, বলেছিস্; ওকথা আর উচ্চারণ করলে তোর গালে দাঁ থাকবে না।

অমর একটা গুণ্ডা। বয়সও যেমন, চেহারাটাও মানান সই। শ্যামলে দিকে মুখ ভেংচে বললো, মুখ টিপলে গালে দুধ পাওয়া যায়, ও আবা দাঁত ফেলবে। আবার বলছি, একশ' বার বলবো — এটা তোর বাবা বল নয়।

শ্যামল দম্ দেওয়া পুতুলের মত এক লাফে ওর সামনে গিয়ে পড়লো বিদ্যুৎ গতিতে ঘুসি বসিয়ে দিল ওর মুখে, মস্তান একেবারে হতভম্ব।

বিষ্ণুদা দৌড়ে গিয়ে ঠেকাবার আগেই অঘটন ঘটলো। সম্ভবতঃ বুড়ো আঙ্গুলের নখে লেগে মুখটা অনেকখানি কেটে গেল। গায়ে হাত বুলি বিষ্ণুদা ওকে শিশুতলা পার করে দিয়ে এলো। শান্ত ছেলের মত ও কে পড়লো। এই মুহূর্তে শান্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা; তবে এখানে এ ঘটনার শেষ নয়, শুরু —সুযোগ হলে সেকথা পরে আলোচনা হবে

পরক্ষণে শ্যামলকে দেখে মনেই হয় না কিছু একটা ঘটেছে। নিজের জায়গায় এসে বসে পড়লো। ঠিক হলো, science-এর ছেলে তিরাশি এবং Arts ও Commerce-এর ছেলেরা তিয়াত্তর টা Fee বাবদ দেবে। দর কষাকষিতে প্রয়োজনে সেটাকে বাড়িয়ে পঁচা ও পঁচাত্তর টাকা করা যেতে পারে।

লিখিতভাবে এর একটা copy কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হবে এবং ও পরবর্ত্তী দৃষ্টিভংগী লক্ষ্য করে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে, একটা শ লড়াই সে করতে হবে, সেটা ভেবে সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা হবে।

অতঃপর বিষ্ণুদা সভাপতির ভাষণ শুরু করলো—বন্ধুরা, আমি এ স্কুলে ক্লাস six থেকে পড়াশুনা করছি, আট বছর হয়ে গেল। তোম প্রত্যেকেই জানা ভগবান (?) আমার প্রতি কত বিরূপ! প্রতিব পরীক্ষার সময় অসুখ-বিসুখ একটা হবেই। যার জন্যে, তোমাদের প্রত্যেকে দাদা যেমন আমার বন্ধু, তোমরাও ঠিক তেমনি। যাহোক, এটা আম

একটা অভিশাপ হলেও আজ এই সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা কিছুটা লাগতে পারে। আমি আমার স্কুল জীবনে দেখেছি, শিক্ষক কর্তৃপক্ষের অন্যায় কাজের প্রতিবাদে প্রায় প্রতিটা ব্যাচ্ একবার না র রুখে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ অবশ্য বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু esult প্রতিবারেই হয়েছে এক। নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে না, ক বিভিন্ন ধরণের অপকৌশল গ্রহণ করে ছাত্রদের ঐক্যকে বিনষ্ট চেষ্টা করে; ছেলেরা ফাঁদে পা দেয় Nett ফল ধোলাই; একেবারে মার। ডাণ্ডা খেয়ে সবাই ঠাণ্ডা হয়—কর্তৃপক্ষের অপকর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না। এ সবের নেতৃত্ব যারা তাদের ওপরই চাপটা বেশী পড়ে, মূল্য তাদেরই বেশী দিতে হয়। রা নিশ্চয়ই জানো, এ সবের ফলে বহু ভাল ভাল ছাত্রকে অন্যায়ভাবে ce T.C. দিয়ে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ সে সামলাতে যথেষ্ট বেগ পেয়েছে; আর অনেকেই সে ধাক্কাতে গুড়িয়ে , শেষ হয়ে গেছে। এ সবের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনেই আছে। তাই, আজ আমরা যা করতে যাচ্ছি, সেটা মোটেই ছেলেখেলা নয়; নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে না। আজ নেতৃত্ব দেবার জন্যে হয়তো লের ডাক পড়বে, ডাকবে আমাকে বা অন্য কাউকে। কিন্তু এরা ক্ষের বর্তমান সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগতভাবে তেমন ক্ষতিগ্রস্থ নয়। আমি wed হয়েছি, টাকা দিতেও আমার খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। শ্যামলের রা আরও অন্যরকম, ওর বাবা অনেক কম টাকা দিয়েই মেটাতে পারবে। ন্যে কেউ কিছু মনে করো না, খোলাখুলি আলাপ করাই ভাল। তাই, রা যেমন সামগ্রিক স্বার্থ দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি, আশা করি সবাই সেটা ব এবং সেটাই উচিৎ। ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা করে আমরা যেন আন্দোলন না দেই।

এরপর তোমাদের কারুর কোন কথা থাকলে বলতে পারো, মিটিং দীর্ঘ করে লাভ নেই।

মহেন আর চুপ করে থাকতে পারলো না। বললো, তাহলে এখন ত হবে কি, তারতো কিছুই বললে না?

শ্যামল ঃ তুই প্রস্তাব কর কি করা উচিং—এক্ষুণি গিয়ে কারুর মাথা লাঠি মারা উচিং তাইতো ?

ঃ তা না হোক, একটা কিছুতো করতে হবেই।

ঃ কি শুনলি এতক্ষণ তোর মাথা মুণ্ডু। এবার যা করতে হবে তার জন্যে মিটিং-এর দরকার নেই। —ঘটনাটা সবাইকে জানাতে হবে, বাইরের বন্ধুদের খবর পাঠাতে হবে। প্রত্যেকের দায়িত্ব, পাশের বন্ধুদের বুঝিয়ে বলা অভিভাবকদের ঠিকমতো বোঝানো, স্কুলের সমস্ত ছাত্র আর যার যার গ্রামের জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলতে হবে—কেন এটা অন্যায় বা অত্যাচার। এ সব তো আর এখানে বসে হবে না, গ্রামে যেতে হবে। তবে একাজে ফাঁকি দিলে চলবে না। আর চিঠির জবাব পাবার পর পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে হবে।

ঃ চিঠির যদি কোন জবাবই না দেয় ?

ঃ আগামী দু'একের মধ্যেই অর্থাৎ ধর্ বৃহস্পতিবার বারোটার মধ্যেই জবাব চাইবো, না দিলে সেটাও আলোচনার বিষয়বস্তু হবে।

মিটিং শেষ হলো। যে যার বাড়িতে চলে গেল। বিষ্ণুদা বললো শ্যামল, আমি এসব ঝামেলা তেমন পছন্দ করিনে, তোমার মত অতটা বুঝিও না, এর ফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে ?

ঃ দেখ বিষ্ণুদা তুমি বোঝনা এটা মিথ্যা কথা। তোমার দোষ হলো— সত্য কথাটাকে তুমি শক্ত করে বলতে চাও না। আমার যে দোষগুলো আছে তুমি জানো—একটু আগেই একটা করে ফেললাম। ওগুলোকে একটু সামাল দিয়ে দিও, তাহলেই হবে। জাঁদরেল জাঁদরেল মাতব্বরদের নাস্তানাবুদ করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

ঃ কিন্তু চিরচারিত কায়দায় বেশীর ভাগই যদি বিগড়ে যায় ?

ঃ অন্যান্যবার থেকে এবারের পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ আলাদা। ছেলেরা সাধারণতঃ বিগড়ে যায় অভিভাবকদের চাপে। এবারতো মনে হয় সে সম্ভাবনা নেই ; কারণ ছাঁটাই এবং টাকা পয়সার চাপটা ওদের ঘাড়েই পড়ে। তাছাড়াও ছাত্রদের নামে কেস্ হওয়াতে আর বিনয়বাবুকে তাড়িয়ে দেওয়াতে প্রায় সব অভিভাবকরাই ওদের ওপর ক্ষেপে আছে। আমরাও ওদের (জনসাধারণ) মাঝে

কাজ করে, প্রচার চালিয়ে ওদের আস্থা অর্জনে অনেকটা সফল হয়েছি, ছাত্রেরাও আগের থেকে অনেক বেশী ঐক্যবদ্ধ। তুমিতো জানোই ক্লাস Eight থেকেই আমি ওদের মোকাবিলা করে আসছি। মোড়লদের ভরসা কোথায়, কিম্বা দুর্বলতাই বা কি, আমি ভালভাবে জানি। আমরা আজ অনেক সুবিধাজনক অবস্থায়—ভয় পাবার কারণ নেই।

ঃ কিন্তু কোন কারণে হেরে গেলে তার ফলাফল কত ভয়াবহ তা কি একবার ভেবে দেখেছ ?

ঃ অতটা ভয় পেলে কোন কাজ করা যায় না। অবশ্য চিন্তা আমি সব দিকই করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা হারবো না, আর হেরে গেলে পরাজয়ের গ্লানি ছাড়া আমাদের জন্যে অন্যকিছু অপেক্ষা করে নেই। প্রয়োজনে আমরা লাঠির জবাবে লাঠি মারবো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবার পক্ষপাতি আমি নই। আমিতো সবার আগে, আঘাত আসলে আমার ওপরই আগে আসবে, মিছে ভয় পেলে চলবে না।

দু'জনে গিয়ে চিঠিটা হেডস্যারকে দিয়ে অন্য আরেকটি কপিতে সই করিয়ে নিল। তারপর বাড়ি ফিরে গেল।

বারান্দায় পা দিতেই ওর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কিরে শ্যামল 1st হতে পেরেছিস্ ?

ঃ না।

ঃ কে 1st হলো তাহলে ?

ঃ হামিদ।

ঃ কত নম্বর বেশী পেয়েছে তোর থেকে ?

ঃ হেডস্যারতো বললেন, সাত-আট বেশী পেয়েছে।

ঃ ঠিক্ ঠিক্ জানিস্ না তাহলে ?

ঃ না, নম্বর জানিয়ে দেননি।

শ্যামলের ঠিক পরের বোনটা স্কুল থেকে ফিরে কাপড় ছাড়ছিল। বললো, বাবা, ছোড়্দা মিথ্যে কথা বলেছে, ও একটাতে ফেল করেছে; B Group-এ পাশ করেছে। সত্তরজন A Group-এ পাশ করেছে, তারমানে ছোড়্দার Roll No. কম করেও একাত্তর।

—নয়—

: আমি মিথ্যে কথা বলেছি, তুই কি করে জানলি? আগে ভাল করে ঘটনাটা শোন, তারপর কথা বল্।

স্কুলের মেয়েরাতো তাই বললো। হামিদ 1st, শ্যামা 2nd, সুজন 3rd, কওসার 4th, তারপর আর জানিনে। তুইতো বাবাকে বলেছিস, 2nd হয়েছিস্!

: তুই যাতো! আমি বাবাকে বলিনি যে আমি 2nd হয়েছি, হামিদ আমার চেয়ে কত নম্বর বেশী পেয়েছে তাই বলেছি।

: তুই তাহলে 2nd হতেও পারিস্‌নি! অত মাতব্বরি করে বেড়ালে কি আর লেখাপড়া হয়? যাও, এখন রান্নাঘরে গিয়ে দুধের সরটা, বড় মাছটা খাও গিয়ে—বলে রাগতে রাগতে ওর বাবা বারান্দা থেকে নেমে গেলেন।

মা বললেন, কিরে, কি হলো?

: জানা নেই, শোনা নেই, গালাগালি দিতে পারলেই হলো। সেই যে পণ্ডিত মশায়ের সাথে গোলমাল হওয়ায় ধর্ম পরীক্ষা দিতে পারিনি সেটাতে ফেল করেছি। পনের-বিশ মিনিট লিখেছিলাম তাতে হয়তো বিশ-পঁচিশ পেয়েছি; কিন্তু তাই বলে কি না পেরে ফেল করলাম? শুনলাম হামিদ ইসলামিয়াতে নব্বই-বিরানব্বই পেয়েছে, আর আমি সেখানে বিশ-পঁচিশ; তবুও মাত্র সাত-আট মার্ক কম পেয়েছি; তাতেই বাবা রেগে গালাগালি শুরু করে দিল। মাতব্বরি করে বেড়াই বলেইতো কম পড়েও ভাল জবাব দিতে পারি। মনোরঞ্জন বাবুতো বলেন—বাংলায় আমার উত্তর একেবারেই মাপা, তর্ক করতে না পারলে কি কোন প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেওয়া যায়? মা তুমিই বলো, বসে বসে নোট বই মুখস্ত না করে, মাতব্বরির দৌলতে প্রত্যেকটা প্রশ্নের টানা টানা জবাব দিয়ে বেশী নম্বর পেতে দোষটা কিসের? মাতব্বরি না করে বেড়ালে প্রশ্নের মাপা জবাব শেখা সম্ভব নয়।

মা বললেন, ভাল হয়েছে, এখন বাকী ক'টা দিন তোর ঐ মাতব্বরি ছেড়ে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দে। জীবনে মাতব্বরি করার অনেক সময় পড়ে আছে। যা, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নে।

শ্যামল জামা-প্যান্ট খুলতে যাচ্ছিল। মা কি মনে করে আবার ফিরে এলেন। বললেন, শ্যামল সনাতন ধর্মতো তোদের Compulsory Subject। Final-এ তো পরীক্ষা দিতে হবে, তাই না?

ঃ হ্যাঁ মা, আয়ুব খাঁ আবার এই নিয়ম করে গেছে, বড্ড বাজে জিনিষ মা।

ঃ তোরাতো আয়ুব খাঁকে একেবারে দেখতে পারিস্ না। কিন্তু দেখেছিস্ অন্যকোন সরকার ধর্মের এমন মর্যাদা দেয়নি। আয়ুব খাঁ কেমন একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে গেছে; তোরা কি কখনও এমন না হলে গীতা, পুরাণ, বেদ একবার পড়ে দেখতিস্?

ঃ না মা, আসলে কাজটা ভাল করেনি। Social Studies Subject-টা তুলে দিল। ওর মধ্যে History, Geography আর Civics ছিল; তাতে কিছু কিছু জানবার ছিল। সে যাহোক, সেটা বড় কথা নয়। ধর্ম নিয়ে আয়ুবের plan টা অন্যরকম। ওর ইচ্ছা ধর্ম শিখে হিন্দুরা হোক গোঁড়া হিন্দু, মুসলমানেরা হোক গোঁড়া মুসলমান—হিন্দুদের ভাবতে শিখুক কাফের। ঐ সব বই এর মধ্যে সে ধরণের বক্তব্যই বেশী আছে। ফলে, সাম্প্রদায়িকতা জিইয়ে থাকবে ও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। হিন্দু-মুসলমান নিজেদের মধ্যে মাথা ভাভাভাঙি করবে, প্রকৃত শত্রুর দিকে দৃষ্টি দেবার সুযোগ পাবে না; আর সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদের দালাল আয়ুব খাঁরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের হিটলারী শাসন প্রতিষ্ঠিত করার মওকা পেয়ে যাবে।

ঃ না বাবা, তোদের ওসব রাজনীতি আমি বুঝি না। তবে পরীক্ষা যখন দিতেই হবে, তখন না পড়ে আর উপায় কি? তাছাড়া, তুই ধর্ম পড়ে অন্যান্যদের মত না হলেই ঝামেলা মিটে গেল।

ঃ মা, তোমরা হয়তো ভাবছো আমি না পড়েই ফেল করেছি; কিন্তু মোটেই তা নয় বরং তার উল্টো। পরীক্ষাতে প্রশ্ন পত্রে ভুল ছিল। একটা প্রশ্নে লেখা ছিল, ডানদিকের শব্দগুলি এনে বাদিকের শূন্যস্থান পূরণ করো; কিন্তু ছাপার ভুলে ডানদিকের শব্দগুলি বাদ পড়ে যায়। আমার এমনিতেই জানা ছিল; তাই, খাতার একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই সবার আগে ওগুলো লিখি। তারপর কাব্যতীর্থ পণ্ডিত মশায় এসে বললেন—লিখে নাও।

আমি দেখলাম, তার প্রায় সবগুলোই ওখানে খাটে না। আমি আপত্তি করলাম, উঁনি আমাকে "সারা বছর ক্লাস না করে" ইত্যাদি যা-তা বলতে শুরু করলেন। আসলে উঁনার ইচ্ছা এভাবে নিজের অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখবেন। আমি রেগে গিয়ে পরীক্ষা দিলাম না।

ঃ না-না শ্যামল, গুরুজনদের সাথে ওরকম ব্যবহার করা ঠিক নয়। উঁনার লেখাপড়া অল্প, হয়তো জ্ঞানও বেশী নয়, উঁনি ভুল করতে পারেন। ভুল কার বা হয় না; তাই বলে হল ভর্ত্তি ছাত্রদের সামনে তুই তাঁকে অপমান করতে পারিস্ না। এটা তোর ভয়ানক অন্যায় হয়েছিল।

শ্যামল জানে সে অন্যায় করেছিল, নিজকে আত্ম সমালোচনা সে করতে জানে, ভুল করলে স্বীকার করতেও কুণ্ঠা করে না; কিন্তু কতকগুলো মুহূর্তে কেমন যেন সব ওলট্-পালট্ হয়ে যায়, নিজকে সামলাতে পারে না। তাই, এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাইল না। রান্নাঘরের পিছনে নান্দার (মাটির বড় পাত্র) জলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসে গেল।

খেতে খেতে মাকে বললো, মা, পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই। এখন মলন মলা প্রভৃতি এ জাতীয় কাজে পরিশ্রম হয়, রাতে ঘুম পায়—পড়াশুনা করা যায় না। তুমি বাবাকে একটু বলে দাও না!

ঃ তুইতো খেলাধুলা একটু কমাতে পারিস্। দিনের বেলায় কত সময়, দিনে একটু বেশী পড়ে নিস্, তাহলে অসুবিধা হবে না।

ঃ দেখ মা, অভ্যাস হয়ে গেছে। মাঠে খেলতে না গেলেও মনটা ওখানে পড়ে থাকে, পড়াশুনা হয় না। তারপর খেলতে না পারার লোক্সানের কথা ভেবে ভেবে সময় কেটে যায়, তাতে দু'দিকেই loss। বিকেলে একটু খেলতে গেলে মনটা ভাল থাকে, অল্প সময়ে অনেক মুখস্ত হয়; বাবার মত তুমিও একই যুক্তি দিলে পাশই করতে পারবো না!

ঃ না, এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারবো না। তাছাড়া অন্যান্যদের মততো নয়, কতটুকু আর খাটাতে হয়। বাড়ির কাজ-কর্মে একটু সাহায্য না করলে তোদের সাথে আমাকেও বক্তে ছাড়বে না তোর বাবা।

ঃ ঐ তো বাবার জন্যেই তো Result ভাল করা যায় না। রাগ করবে, গালাগালি পড়বে; সবার মন খারাপ হয়ে যায়, পড়তে কি আর

ল লাগে !

কথা বলতে বলতে শ্যামলের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। থালাতে হাত-ধুয়ে মাকে বিরক্ত করতে চাইলো না, গ্লাস নিয়ে বাইরে চলে গেল।

বড় আট চালা চৌরিঘরের চারিদিকে বারান্দা, পিছনের বারান্দা বেড়া য়ে ঘেরা। সেখানে বীজধান বিভিন্ন পাত্রে গচ্ছিত রাখা হয়। মাটির কোলা, টর বস্তায় বীজধান ভর্ত্তি করে তাতে লেবেল আটকে রাখা হয়।

পূবদিকের বারান্দায় শ্যামলের পড়ার টেবিল; পাশের চৌকিখানাই র রাত্রি কাটাবার জন্যে। চৌকির পাশেই একটা ছোট্ট বস্তা ভর্ত্তি বীজ ন; ওগুলো চিকন্ ধানের বীজ, সম্ভবতঃ বোটের বালাম।

বালাম ধান সাধারণতঃ উঁচু জমিতে হয়। প্রথমে একটা জমিতে চাষ য়ে জল ঢেলে কাদা করা হয়; উপর্যুপরি চাষ ও জল ঢেলে নরম াদায় রূপান্তরিত করা হয়। মই দিয়ে জমিটাকে সমান করে তিনদিনের ভজানো অংকুরিত বীজ ঘন করে কাদার ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কাঠ-ড়ালী, কবুতর প্রভৃতির উৎপাতের হাত থেকে বীজগুলোকে রক্ষা করতে াল্লের পাতা (খেজুরের ডগা) দিয়ে নরম কাদার ওপর মৃদু মৃদু আঘাত করে ীজগুলোকে সযত্নে ধীরে ধীরে কাদার নীচে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। লক্ষ্য াখতে হবে অংকুর যেন ভেঙে না যায়।

এটা করবার আরও একটা প্রয়োজন আছে। এটা না করলে বীজ ছড়ানোর পর জোর বর্ষা হলে বীজগুলো এখানে ওখানে জট্ পাকিয়ে পড়ে াকবে, সুবিন্যস্তভাবে ছড়ানো না থাকায় চারা ভাল হবে না। আর জমি একটু অসমতল হলেতো একেবারেই 'মাটি' হয়ে যাবে।

কিছুদিনের মধ্যে ওগুলো চারাতে রূপান্তরিত হয়। এক বিঘতের মত লম্বা হলে ওগুলো তুলে আঁটি বাঁধা হয়। আঁটি বাঁধার কায়দাটিও দেখবার মত। টেনে টেনে তুলে যখনই হাতে এক গোছা হবে; নিপুণ হাতে ধরে বা পা-টা উঁচু করে পায়ের তলায় মারবে বাড়ি, এভাবে কাদা-মাটি ঝেড়ে ফেলবে। আনাড়ী হলে এক বাড়িতেই চারার দফা রফা; সবগুলোর কোমর ভেঙে যাবে, দুর্বল হয়ে যাবে। এভাবে কয়েক গোছা এক করে আঁটি বাঁধা হয়।

এদিকে যখন চারা মারা হবে, একই সময়ে অপর আরেকটি জমিতে যেখানে অল্প পরিমাণ জল জমে আছে, লাঙল দিয়ে চাষ করা হবে। এটাকে জমি "পাকানো" বলে। সম্ভব ও সুযোগ হলে দু'চারদিন আগে জমিটাতে দু'টো চাষ মেরে মই দিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়, একে বলে "জাবড়" দেওয়া। তাহলে আগাছাগুলো মরে সবুজ সারে পরিণত হয় বা এমন ভাবে দুর্বল হয়ে যায় যে পাতা (চারা) রোপন করার পর ধানের নীচে পড়ে গিয়ে ওগুলো আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না, ফসলের ক্ষতি করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে।

এ অঞ্চলে এ জাতীয় জমির ভাগ অত্যন্ত কম। এখানে যে ধান হয় তা এরা সাধারণতঃ পায়েস, পিঠে প্রভৃতি করতে ব্যবহার করে অথবা সখ করে মাংস সহযোগে সদ্ব্যবহার করে।

সারাদিন চিৎকার চেঁচামেচি করে শ্যামল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই, চৌকির ওপর একটু গড়াগড়ি দেবার চেষ্টা করলো। শুয়ে বারে বারে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে চাইলো—কি হবে এরপর, কি ভাবে এগানো যাবে ইত্যাদি। কিন্তু তা পারলো না। এমন নিরিবিলি মুহূর্ত-গুলো আজকাল বারে বারে রীতাকে মনে করিয়ে দেয়, রীতার চিন্তায় মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

রীতা Test পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসেছে মাস খানেক হয়ে গেল। শ্যামল সে খবর রাখে, কয়েকদিন বিভিন্ন কাজের অজুহাতে ওদের গ্রাম দিয়ে ঘুরেও এসেছে সে; যদি দেখা হয়ে যায়। ওদের গ্রামের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বারে বারে দেখা করেছে, যদি কথায় কথায় ওর কথা এসে পড়ে, তাহলে খোঁজ খবর জানতে পারবে। কিন্তু হলো না, রীতা চলে যাবার পর একমাত্র সে ছাড়া প্রত্যেকেই বোধ হয় ওকে ভুলে গেছে।

শ্যামল উঠে পড়লো, শুয়ে থাকলে এসব চিন্তা আর মাথা থেকে যাবে না। এখনও সময় আছে, মাঠের দিকে কারো কারো হয়তো পাওয়া যাবে; দু'টো প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করা যাবে, প্রতিক্রিয়াটা অনু-ধাবনের সুযোগ হবে।

রীতাও শ্যামলকে একবার দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেক

ন হলো ওকে দেখেনি ; কিন্তু মশিয়াহাটীর দিকে আসতে সাহস পায় না। ক বছর আগের ঘটনা মশিয়াহাটী ভুলে গেলেও, সে নিজে ভোলেনি। রিকলে মশিয়াহাটীকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। ওদিকে আসবার কথা বতেই লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

রীতা স্কুলে গোলমালের সব খবরই প্রতিদিন জানতে পারে। শ্যামলের য়াকলাপ সে খুটিয়ে খুটিয়ে জানবার চেষ্টা করে। ওরা স্কুল কর্তৃপক্ষের খামুখি হতে যাচ্ছে শুনে তার খুবই দুঃচিন্তা হলো, কি ঘটবে কে জানে! শেষভাবে শ্যামলের জন্যে তার বড় লাগে। পরীক্ষার বেশী বাকী নেই, তদিন এভাবে পড়াশুনা নষ্ট করবে কে জানে! —তারপর অন্যান্য বিপদের ভাবনা তো আছেই। কিসের এক অদৃশ্য যোগাযোগে সে অনেক দিন হতেই মলের শুভাকাংখী হয়ে পড়েছে।

রীতা জানতো, তাই বৃহস্পতিবারকেই বেছে নিয়ে সে মরিয়া হয়ে শিয়াহাটীর দিকে পা বাড়ালো। চোখ মেলেই সে রাস্তা দিয়ে হাটছে, স্তু সামনে, পিছনে, পাশে সে যেন কিছুই দেখতে পারছে না। স্কুলে চে তার মনে হলো, স্বপ্ন শেষে সে যেন ঘুম থেকে জাগলো। সমস্ত ক্ষকদের সাথে দেখা করে প্রণাম করলো, তারপর অপেক্ষা করতে লাগতো ন শ্যামলের দেখা মিলবে।

কিন্তু এভাবে বসে থাকা ভাল দেখায় না, অগত্যা বেরিয়ে গার্লস্ স্কুলের কে চলে গেল।

বারোটা নাগাদ ছাত্রেরা হেডস্যারের কাছে এসে ফলাফল জানতে চাইলো। নি নোটীশ বোর্ডটা দেখে নিতে বললেন এবং জানালেন ওটাই সর্বশেষ সম্মত সিদ্ধান্ত।

ছাত্রেরা দেখলো আরও দশজনের নাম টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওরা শেষ বিবেচনার ফসল ; কিন্তু fee সম্পর্কে কোন রদবদল হয়নি, পাশেই খা আছে আগেরটাই বহাল রইলো।

শ্যামল এটা আগে থাকতেই অনুমান করেছিল, তাই অবাক হলো না। বান্ধবদের সাথে মাঠে গিয়ে বসলো। শ্যামলের অনুরোধে আজ ভলির কোর্টের শে বসা হয়নি। বিষ্ণুদা এসে না পৌঁছানোর জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে,

আর গরম গরম বক্তব্য পেশ করছে। বিষ্ণুদা এসে গেল, কাজের কথা শুরু হবে, গরম বক্তারা কেন যেন নিজেদের গুটিয়ে নিল।

এমন সময় কে একজন বললো, রীতা যাচ্ছে না? —ওকে ডাক, অনেকদিন শ্যামলের সাথে বোধ হয় দেখা হয়নি।

বিষ্ণুদা ভয়ংকর চটে গেল। বললো, একটা বয়স্কা মেয়ে সম্পর্কে ঐ রকম মন্তব্য কখনও করবে না। ওতে গ্রামের মেয়েদের জন্যে পরিণাম খারাপ হয়। মিথ্যা কুৎসা গ্রামে এতবেশী প্রচার হয়, যা বোঝবার বয়স তোমাদের এখনও হয়নি। একসংগে পড়তাম, ভদ্রভাবে ডেকে আলাপ করতে পারো।

রীতাকে হাত উঁচু করে ডাকা হলো। ও এসে সবার কুশল জিজ্ঞাসা করলো। ভীড়ের মধ্যে এক নজর মাত্র শ্যামলকে দেখে বললো, যশোর বসেই শুনতাম আমাদের ব্যাচটি দারুণ আন্দোলন করে; আর শ্যামলদাতো একেবারে নেতা হয়ে গেছে শুনেছি, এখানে এসেতো নিজের চোখেই দেখলাম।

আরও ছু'চারটি কথার পর রীতা চলে গেল। সবাই ওদের সাথে বসে কে কেমন নেতা হয়েছে রীতাকে তা যাচাই করে দেখবার জন্যে অনুরোধ করলো; কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও ওর সাহসে কুলালো না।

শ্যামলের রীতাকে দেখবার এত ইচ্ছা থাকলেও একবারও মুখ তুলে তাকাতে সাহসী হলো না।

সভাতে অবস্থার খুবই গুরুত্ব দেওয়া হলো। গ্রামের জনসাধারণ ও অভিভাবকদের অনুকূল মনোভাব ওদের মনোবল বাড়িয়ে দিলো; এ অবস্থায় আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার উপরেই পুনর্বার জোর দিয়ে সবাই বক্তব্য রাখলো।

শ্যামল বললো, স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের আবেদনের কোন মূল্যই দিলো না। অথচ আমাদের দাবী সম্পূর্ণভাবে ন্যায়সংগত ও যুক্তিযুক্ত। আমি জানি কর্তৃপক্ষ একান্ত বাধ্য না হয়ে ওদের মত্ পরিবর্তন করবে না।

কর্তৃপক্ষ নিজেদের সমর্থনে যে বক্তব্য হাজির করেছে ওটা ভাওতা ছাড়া কিছুই নয়। মশিয়াহাটী স্কুলের বর্তমানে যে আর্থিক স্বচ্ছলতা তা সমগ্র দেশে এই ধরনের আর কোন স্কুলে আছে কি-না সন্দেহ। ফলে, স্কুল বাঁচাও শ্লোগাম একেবারেই মিথ্যা অজুহাত। আসলে ওরা আমাদের

ওপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। ওরা চায় মশিয়াহাটীতে বিভিন্ন আন্দোলন করে যে সুযোগ-সুবিধা আমরা আদায় করেছি — তা দূরে ঠেলে দিয়ে স্কুলকে আবার ওদের অবাধ স্ফূর্তির লীলা নিকেতনে পরিণত করতে। তারই জন্যে আন্দোলনের সামনের সারিতে যারা লড়াই করেছে তাদের ওরা এমন একটি শাস্তি দিতে চায়, যা মশিয়াহাটীর ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যার ভয়ে ভবিষ্যতে ছাত্রেরা আন্দোলন বিমুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু ওরা জানে না ওদের এ চিন্তা কল্পনা বিলাস, স্বপ্ন কখনই বাস্তব নয়।

আমি মনে করি আমাদের সামনে একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। আমরা আজ ওদের এমন প্রত্যাঘাত করবো যা ওরা এখন ভাবতেই পারছে না, সেটাই থাকবে মশিয়াহাটীতে দৃষ্টান্ত হয়ে; সে দৃষ্টান্ত মশিয়াহাটীর ছাত্র আন্দোলনকে প্রেরণা জোগাবে, প্রতিক্রিয়াশীলরা পরিণাম চিন্তা করে শিউরে উঠবে।

আমরা যতক্ষণ সম্ভব নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে লড়াই চালিয়ে যাবো, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করবো। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই নিম্নপর্যায় থেকে সর্বোচ্চ আসন পর্যন্ত এই একই চিত্র, এদেরই সহোদর। তাই, এভাবে কতদূর কি হবে বলা মুশ্‌কিল, সেজন্যে আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে সম্মুখ লড়াই-এর জন্যে, প্রয়োজনে বল প্রয়োগে পিছ্‌পা হলে চলবে না এবং এভাবেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালাতে হবে। মনে রাখবে অঞ্চলের জনগণের এ কাজের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও ওদের মতামতই শেষ পর্যন্ত ঘটনাকে প্রভাবিত করবে।

আমি মনে করি এরপর আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কন্ট্রোলারকে ঘটনা জানিয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্যে একটা স্মারকলিপি দেওয়া প্রয়োজন এবং তারজন্যে আমরা মিছিল করে বোর্ডে গিয়ে হাজির হবো। পরবর্তীকালে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

শ্যামলের প্রস্তাব গ্রাহ্য হলো। আগামীদিন শুক্রবার। সমস্ত অফিস আদালত, কোর্ট-কাচারী বন্ধ। তাই, শনিবারে মিছিল করে বোর্ডে যাওয়া হবে, স্মারকলিপি দেওয়া হবে ও মৌখিকভাবে সবই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা হবে।

ছাত্রদের সিদ্ধান্ত নিমেষে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। সমস্ত অঞ্চলে একেবারে হুলস্থূল পড়ে গেল। মিছিল করে বোর্ড অফিস অভিযান। এ বাস্তবে রূপদান করা অনেক দূরের কথা, এদের আগে ভাবতেও কেউ ভরসা পায়নি। অনেকে বললো, সাবাস! অনেকের মনে সংশয়, হয়তো এ অসম্ভব।

খবরটা শুনে হেডস্যার নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারলেন না। এ দলটাকে নিয়ে তিনি অনিশ্চিত; এরা বোধ হয় অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে। ছুটলেন অলকবাবুর বাড়িতে। বললেন, শুনছেন, বাঁদরগুলো নাকি বোর্ডে গিয়ে সব বলবে। যদি সত্যি সত্যি করে বসে কোন বিপদ হবে না তো? —আসলে তো অত টাকা fee কোনক্রমেই হয় না; তাছাড়া আমি আরও দু'টো স্কুলে কাজ করেছি, এ সময় কোথাও ছাত্র ছাঁটাই হয় না। হেডস্যার মৃদু কাঁপছেন।

ঃ আরে না-না। আপনার 'ঝড়ের আগে কলাগাছ পড়ার' মত অবস্থা। যাবো বললেই কি যাওয়া হলো? বিশ-পঁচিশ মাইল পথ, গাড়ী-ঘোড়ার ব্যাপার। পয়সা না হলে তো আর গাড়ী-ঘোড়া শুনবে না! তাছাড়া ওরা বোর্ড কেউ চেনে নাকি? আর গেলেও জায়গা পর্যন্ত পৌঁছানো অত সহজ নয়। দারোয়ানের কাছেই গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে।

আমরা গিয়ে একটা ক্লার্কের সাথেই দেখা করতে পারিনে, পাত্তাই দিতে চায় না। আর বড় বড় ব্যাপারে তো স্লিপ, permission প্রভৃতির দরকার; ওরা এসব জানবেই না। ওরা কি যশোর কেউ চেনে?

ঃ না-না, ঐ শ্যামলটাকে নিয়ে ভয়। ও সবই চেনে। জেলখানা-টানাতে প্রায়ই যাতায়াত করে। দেখবেন, শেষ পর্যন্ত চাকরীটা যেন না যায়।

সেক্রেটারীবাবুর দশা একেবারে গয়া। খাওয়া-দাওয়া শিকেয় উঠেছে। কেউ একজন ওকে বলেছে — এসব ব্যাপারে ওর জেলও হতে পারে। তাই, পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। বারে বারে শ্যামলের বাবাকে, কাকাদের গিয়ে ধরছে—ওকে থামাও, বিনা পয়সায় ওর পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবো, ও যেন না যায় এসব কাজ করতে। —কিন্তু আসল জায়গাতে হাতটা লাগাতে কেউ রাজী নয় — সিদ্ধান্তে অটল।

ছাত্রদের মধ্যে সাজ্ সাজ্ রব পড়ে গেছে। তার উপর হেডস্যার ও

সেক্রেটারীর অবস্থা আঁচ করতে পেরে ওদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। কেউ ডিম, কেউ চাল চুরি করে, কেউ বা মা-বাবাকে বুঝিয়ে এক টাকা-দু'টাকা —যে যার সামর্থ্য মত জোগাড় করে ফেলেছে। জামা-কাপড়ও যথাসম্ভব পরিপাটী করতে চেষ্টার ত্রুটী করেনি।

শ্যামলের বাবা গভীরভাবে চিন্তা করলো। স্কুলের এসব সামান্য ঘটনা নিয়ে যশোর দৌড়াদৌড়ি করলে স্কুলের সুনাম নষ্ট হবে, মশিয়াহাটীর কলংক হবে। তাছাড়া, এতদ্ঞ্চলের প্রত্যেকটি গণ্যমান্য লোক বারে বারে তাঁর কাছে আসছে, করুণভাবে অনুনয়-বিনয় করছে। এ অবস্থায় শ্যামলকে সামলানোই উচিৎ। কিন্তু ওকি শুনবে বারণ করলে! অনেক চিন্তা ভাবনার পর তিনি মনে মনে ছেলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন, যে করেই হোক শ্যামলকে তিনি ঠেকাবেনই।

বাড়ির মধ্যের অন্যান্য কাকাদের মাতব্বরিতে একটা বড় ভূমিকা। তাঁরাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শ্যামলকে তাঁরা আটকাবেনই; নতুবা মাতব্বরির কোঠায় তাঁদের ভাবমুর্ত্তি ম্লান হয়ে যাবে। অন্যান্য কাউকেই কিন্তু এসব বাধার মুখোমুখি হতে হলো না, বরং অনেকক্ষেত্রেই, অনেকেই বাড়ির সক্রিয় সহযোগিতা পেল।

শনিবার সকাল বেলায় সবাই একে একে সাক্ষাতের জন্যে নির্দিষ্ট স্কুল-মাঠে এসে হাজির হলো। শ্যামলকে ওর বাবা প্রচণ্ড বাধা দিলেন। বললেন, যশোর যাবিতো এ বাড়িতে তোর খাবার নেই — অগত্যা শ্যামল বাসিপেটে রওনা দিলো। বাবা-কাকারা পাঁচ-সাত ভাই পিছু পিছু রাস্তায় চলে এলেন, বললেন, আজ যদি যশোর যাস্ এ বাড়িতে তোর আর কোনদিন জায়গা হবে না। শ্যামল ছোট্ট করে জবাব দিলো, জায়গা যদি না হয়, তাই হবে, আমাকে যেতেই হবে।

শ্যামলের বাবার জীবনে এত বড় পরাজয় আর কখনও হয়েছে কি-না তা কেউ বলতে পারে না। ফিরে এসে ওর মার ওপর অনেকটা রাগ মিটিয়ে চুপচাপ পাথরের মুর্ত্তির মত বসে রইলেন।

অনেকদিন হতেই শ্যামলের জন্যে তিনি মাতব্বরিতে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলেন; কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ওকে নিয়ে সালিশী হতো, তাতে অস্বস্তিবোধ করতেন। আর এ ঘটনার পর ওর বাবাকে আর কেউ

কখনও কোন মিটিং-এ হাজির থাকতে দেখেনি।

মিছিল করে শতাধিক ছাত্র যখন বোর্ডের দোর গোড়ায় পৌছালো তখন বেলা তিনটে। দারোয়ান এতগুলো ছেলেকে একসংগে ঢুকতে দিতে রাজী হলো না। সমবেত উচ্চ কণ্ঠের শ্লোগানে ঘটনা কি-তা জানতে controller সাহেব লোক পাঠালেন; তারপর অনুমতি দিলেন—দু'জনকে ভিতরে গিয়ে আলোচনা করতে।

চেয়ারম্যান সাহেব টিফিন থেকে তখনও ফেরেন নি। তাই, ওদের দু'জনকে পাশের waiting room-এ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।

হেডস্যার অপেক্ষা পদস্থ কোন লোকের সংগে শ্যামল কোনদিন কথা বলেনি। তাই, মাঠে যখন বোর্ড অভিযানের সিদ্ধান্ত হলো, তারপর থেকে মনে মনে বার বার ট্রায়াল দিয়েছে যে সব কথা বলা প্রয়োজন। অভয় দিয়েছে নিজকে, মনকে শক্ত করেছে। এই অবসরে সেগুলোকে আরেক-বার ঝালাই করে নিলো—না, ভুল হবার বা ঘাবড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। শ্যামল লক্ষ্য করলো, বিষ্ণুদার চোখ দু'টি কিঞ্চিত বড় হয়ে গেছে, কেমন যেন দেখতে অস্বাভাবিক লাগছে—একের সাথে অন্যের কোন কথা হলো না।

চেয়ারম্যান সাহেব আসলেন, ওদের ডাক পড়লো। শ্যামল সামনে, পিছনে বিষ্ণুদা, এগিয়ে গিয়ে অনুমতি নিয়ে ঢুকে পড়লো। কন্ট্রোলার সাহেব ইংগিতে ওদের বসতে বললেন; দু'টো চেয়ারে দু'জন বসে পড়লো।

শ্যামল হাত বাড়িয়ে স্মারক লিপিটা এগিয়ে দিয়ে বললো, আমাদের পড়াশুনার খুব ক্ষতি হচ্ছে স্যার আপনারা অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করবেন আশাকরে এতদূরে এসেছি।

কন্ট্রোলার ও চেয়ারম্যান দুই সাহেব এক সংগে চিঠিটা পড়ে শেষ করলেন। তারপর দু'জনে ইংরেজীতে অনেকক্ষণ কি সব আলোচনা করলেন। শ্যামল বা বিষ্ণুদার এ সব আলোচনা হৃদয়ঙ্গম হবার কথা নয়—কিন্তু শুনতে না পারলেও ভাগে কম পড়লে অনেকেই বুঝতে পারে। মশিয়াহাটীর কর্তৃপক্ষের কাণ্ডকারখানা দেখে How strange! কথাটা যে উচ্চারণ করলেন সেটা ওদের বুঝতে অসুবিধা হলো না। চেয়ারম্যান নতুন, তাই কন্ট্রোলার সাহেবের কাছে মশিয়াহাটীর অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা শুনে অবাক

হয়ে গেলেন। কি করে এরা মিছিল নিয়ে এখানে এলো! ওদের কাছে জানতে চাইলেন—তোমরা ক'টায় বেরিয়েছ, কখন, কি খেয়ে এসেছ ? –ইত্যাদি।

নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ আলোচনা করে বললেন, এটাতো আমাদের করার কিছুই নেই। আমরা D C. সাহেবের সাথে Contract করে বলে দিচ্ছি, উঁনি যাহোক একটা ব্যবস্থা করবেন।

শ্যামল : স্কুল কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের প্রতিবিধানার্থে আপনাদের করার কিছু না থাকলেও, এ সময়ে ছাঁটাই-এর অবৈধতা উল্লেখ করে এবং Examination Fee প্রকৃতপক্ষে কি হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে জানিয়ে একটা চিঠি অন্ততঃ আমাদের কাছে দিন ?

: হ্যাঁ, তোমরা D.C. সাহেবের কাছে চলে যাও, আমরা এর মধ্যে চিঠিপত্র ready করে ফেলছি। D.C. সাহেব অবশ্যই জানতে চাইবেন, তখন ফোনে আলাপ করে কাগজপত্র লোক মারফত পাঠিয়ে দেব।

: যদি মনে না করেন, আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি; চিঠিটা আমাদের কাছেই দিয়ে দিন, তাহলে আপনাদের লোক পাঠাবার হাঙ্গামা থাকবে না।

: না-না, সে হয় না। এ সব Official procedure তোমরা বুঝবে না।

কিন্তু ফোনে জানা গেল, তিনি এক্ষুনি বেরোচ্ছেন, উঁনি আগামী কাল সকাল ১০টায় দেখা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্যামল বললো, আমাদের পক্ষে অসম্ভব! আমরা থাকবো কোথায়. খাবো কি ? সংগে গরম জামা কাপড়ও নেই যত দেরী হোক আমরা দেখা করে ফিরে যাব, আপনারা দয়া করে আমাদের অবস্থা জানিয়ে উঁনাকে বলুন আমরা office-এ গিয়ে অপেক্ষা করছি উঁনি যেন ফিরে এসে একটু দেখা করেন।

: তোমরা বড় বেশী কথা বলো, এসব ব্যাপার তোমরা বুঝবে না।

শ্যামল : কিন্তু আপনারা আমাদের অবস্থা বুঝতে চাচ্ছেন না!

: আমাদের অতটা ভাববার প্রয়োজন নেই। যদি সম্ভব হয় কাল ১০টায় D C অফিসে গিয়ে দেখা করো, আমরা ইতিমধ্যে আমাদের যা

করণীয় করে রাখবো।

অগত্যা রাস্তাতেই রাত্রি যাপন ছাড়া গত্যন্তর নেই। চেয়ারম্যান সাহেব দরদ দিয়ে deparcher, arrival and stomac condition এর খোঁজ নিলেও দরদী সাজার ঝুঁকি নিলেন না।

শ্যামল বন্ধু-বান্ধবদের সাথে রাস্তায় বেরিয়ে এলো, ক্ষুদায় ক্লান্তিতে সবার মুখ শুকনো। একেতো শীতকাল, আর হু-হু উত্তুরে হাওয়ায় বিবস্ত্র অবস্থায় রাত্রি যাপনের কথা চিন্তা করে সবাই ভয়ে শিউরে উঠলো। ইতিমধ্যে অনেকেরই এ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছুটে গেছে, বাড়ীর কথা মনে পড়ছে, মায়ের আকর্ষণ অনুভব করছে। গ্রামের বালক সবাই, চারিদিকে অপরিচিত রাস্তাঘাট, অচেনা লোকের মেলা; নিজেদের কেমন যেন অসহায় বোধ করলো।

বোর্ডের পাশেই পলিটেক্‌নিক্যাল কলেজ ও তার বিরাট বিরাট হল। ওর সামনের রাস্তা-ঘাট জনশূন্য, গাড়ী-ঘোড়ার বালাই নেই। সবাই গিয়ে ওখানে একত্রিত হলো। শ্যামল প্রত্যেককেই একে একে জিজ্ঞাসা করলো—কার পকেটে কত আছে; কিন্তু অবস্থা প্রায় নৈব নৈব চ। ইতিমধ্যে চপ, ভাজা প্রভৃতি খেয়ে প্রায় শেষ। হিসাব করে সবাই বাস অথবা ট্রেণ ভাড়াটা রেখে দিয়েছে।

শ্যামল ভাবছিল, হোটেলে খাবার পয়সাটা থাকলেও ডাল-ভাত খেয়ে ষ্টেশনে রাত কাটানো যেত; কিন্তু এ অবস্থায় অসম্ভব।

সবাইকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে বিষ্ণুদাকে নিয়ে শ্যামল কলেজ হোষ্টেলে ঢুকে গেল। মশিয়াহাটীর কয়েকজন ছাত্র আছে, ওরা এখানেই পড়াশুনা করে। তখন প্রায় সন্ধ্যে, সবাই এদিকে ওদিকে বেরিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত একজনকে পাওয়া গেল, ওর টাউনে গিয়ে আড্ডা দেওয়ার সখ তেমন নেই; খেলাধুলা, পড়াশুনা নিয়েই থাকে—খেলা শেষে হোষ্টেলে ফিরছিল।

ওদের আদর করে রুমে নিয়ে গেল। তারপর সমস্ত ঘটনা শুনে একেবারে স্তম্ভিত। কি হবে এতগুলো ছেলেকে নিয়ে রাত্রি বেলা! ও ছুটলো অন্যান্য বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্যে। এতক্ষণে একে একে সবাই ফিরে আসছে হোষ্টেলে, বিশ-পঁচিশ জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শ্যামলদের

।াথে আলাপ ক'রে দিল। এরা ওদের সাহস দিল, ভরসা দিলো।

অতঃপর একটা সুব্যবস্থার জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই টাকার প্রশ্ন উঠলো। ।ামল তখন ঘামছে, মনে হলো জ্বর এসে গেল বোধহয়। কি করে লবে এতগুলো ছেলে এ ভাবে এসেছে কিন্তু পকেট একেবারে শূন্য। একজন শ্নটা করেই ফেললো—তোমাদের কাছে টাকা-পয়সা আছে তো?

মশিয়াহাটীর ছেলে সে, ব্যাপারটা না জানলেও অনুমান করতে অসুবিধা লনা—কি থাকতে পারে ওদের পকেটে। তাই বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে বললো, াকা থাকলে তো হোটেলেই যেত, তোদের কাছে ধর্ণা দেবে কেন?

শ্যামল যেন লজ্জায় একেবারে মাটির সংগে মিশে যাচ্ছিল। নিজেকে কজন জঘন্য আসামী বলে মনে হচ্ছে, তাদের জন্য অঞ্চলের ঐ ছেলেগুলোরও ারা হোস্টেলে থাকে) হয়তো মান-সম্মান যেতে বসেছে; তবুও অগ্রজের থায় পায়ের তলায় কিছুটা মাটি পেলো যেন। বিষ্ণুদা বললো, আমরা কশ' থেকে দেড়শ' টাকা কোন রকমে খরচ করতে পারি, এর মধ্যেই বস্থা করতে হবে।

ঃ তাহলে তো কোন কথাই নেই। এমন অনেক হোটেল আছে যেখানে ক টাকায় পেট চুক্তি, যত পারো খাও। অত লাগবে না। তোমরা সম্ভব ল পঞ্চাশ টাকা দাও, আমরা এটা-সেটা কিনে আনি, চাল ডালতো আমাদের ছেই—তবে অসুবিধা হলে দরকার নেই। কষ্ট করে শুধু ডাল-ভাত সবাই লে খেয়ে নেব। আর টাকা পয়সার ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা কিছু মনে রা না—আমরা প্রায় সবাই গরীব ঘরের ছেলে, হিসেব করে বাবা যা ঠায় তাতেই মাসটা চালাতে হয় কি-না।

শ্যামল ভাবছে, বিষ্ণুদা কি সব যা-তা বলছে, অত টাকা কোথায়! ষ্ণুদা বললো, না, এ নিয়ে মনে করবার কি আছে? আপনি খানিকটা মলের মতই, খোলাখুলি আলোচনা করলেন। এতে আমরা খুবই আনন্দ য়েছি, মনে করবার কোন প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া এটাও কি কম! মরা জানি আমাদের জন্যে আপনাদের আমরা যা দিচ্ছি তার থেকে নক বেশী বেরিয়ে যাবে। সর্বোপরি আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতাকে মরা কোনদিন ভুলতে পারবো না।

বন্ধু-বান্ধবেরা এতক্ষণে রাস্তা ছেড়ে ভিতরের দিকে চলে এলো। শ্যামলে মানা সত্ত্বেও এদিকে-ওদিকে ঘুরে ঘুরে এমন বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে আর উঁকি-ঝুঁকি মারছে, তাতে শ্যামলের বড় খারাপ লাগছিল। মশিয় হাটী সম্পর্কে সবার মনে কি ধারণা হবে কে জানে!

শ্যামল বিষ্ণুদার কথাই ভাবছিল। খাতাপত্রে ছোট ছোট করে লেখে যাতে কাগজ বেশী নষ্ট না হয়, বহুদিন ধরে একটাই জামা আর পাজামা পরে, ছিঁড়তেই চায় না। পাজামা আঙুলে বেঁধে ছিঁড়লে সুন্দর করে সেলাই করে নেয়, জামার বোতাম ছিঁড়ে গেলে তুলে নিয়ে যত্ন করে পকেটে তুলে রাখে, একটাই কলম ব্যবহার করে বহুদিন ধরে—ভাঙেও না হারিয়েও যায় না। অথচ অন্যান্য সবাই তার পুরোপুরি উল্টো। সেজন্যে সবাই ওকে কিপ্‌টে বলে মনে করে—অথচ আজ ইচ্ছা করে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিল প্রয়োজনে একশ' পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। শ্যামল বিষ্ণুদাদের বাড়িতে একবার গেছে, বিরাট অবস্থা চার-পাঁচশ' বিঘা জমি ধানের গোলা বিশটির কম নয় — আর এসব জানে বলেই শ্যামল কৃপণ ভেবে বিষ্ণুদার ওপর বিরক্তবোধ করতো; কিন্তু আজ ওর ভ্রম ভেঙে গেল। শ্যামলের আজ মনে হলো এসব কৃপণতা নয়, মিতব্যয়; কিন্তু তখনও শ্যামলের অনেক কিছু জানবার বাকী ছিল। পরের একটা পুরোদিন তখনও বাকী, এর মধ্যে যে ওর পকেট থেকে আরও তিন-চারটি পঞ্চাশ বেরিয়ে যাবে তা-কি শ্যামল কল্পনা করতে পেরেছিল!

হোস্টেলে সেদিন মেম্বারদের জন্যে মাংস হচ্ছিল। রান্না বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি করে আরও পনের সের কিনে এনে ওর সংগে মিশিয়ে একসংগে রান্না হলো। পৌনে তিন-তিন টাকা করে সের, তাই বাকী টাকায় মশলার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

রাতে শোবার জন্যেও অসুবিধা হলো না। হোস্টেলেই ডাবলিং করে প্রায় সবাইকে ম্যানেজ করে নেওয়া গেল। এ ব্যবস্থায় কয়েকজন মাত্র উদ্বৃত্ত হলো। তাই কয়েকজন মেম্বার হোস্টেল ছেড়ে আশেপাশে বন্ধুদের বাড়িতে রাত কাটানো স্থির করলো।

সারাদিন কঠিন মেহনতের পর রাতের সুখনিদ্রা শ্যামল-বিষ্ণুদার জন্যে

ছিল না। চেয়ারম্যান ও কন্ট্রোলারের কথপোকথনে তারা আন্দাজ করতে পেরেছিল যে, তাদের অভিযোগের সমর্থনে কোন প্রমাণপত্র হাজির করার প্রয়োজন হতে পারে। রাত্রি তখন আটটা, কথাটা শ্যামলের খেয়াল হতেই বিষ্ণুদাকে বললো—বিষ্ণুদা, ওদের কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল—আমাদের অভিযোগের সমর্থনে কোন কাগজপত্র দেখাতে পারলে ওরা খুশী হতো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর চাননি, D.C. সাহেব যদি চেয়ে বসেন?

বিষ্ণুদা চিন্তা করলো। বললো, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। D.C. সাহেব বলতেই পারেন—তোমরা যে এসব বলছো, তার ভিত্তি কি? —একটু ভাবলেই বোঝা যায় ওটা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু আছে কি তেমন কিছু?

বন্ধুদের জানিয়ে ওরা দু'জনে বেরিয়ে গেল, খাবার তখনও রান্না হয়ে ওঠেনি। বাস ষ্ট্যাণ্ডের পাশের হোটেলে শ্যামলকে টেনে নিয়ে বিষ্ণুদা ঢুকে পড়লো। মাছ, মাংস দুই-ই খেলো। শ্যামলের আপত্তিতে বিষ্ণুদা বললো, শরীর সুস্থ্য থাকলে সবই ঠিক থাকবে, বিছানায় পড়ে থাকলে সব শিকেয় উঠবে, তাছাড়া হোষ্টেলেও তো মাংস হচ্ছে।

শ্যামল বুদ্ধি করে অথবা রাগ করে নোটীশ বোর্ড থেকে নোটীশগুলো খুলে নিয়েছিল। কিন্তু ছিঁড়ে ফেলেনি; পড়ার টেবিলের ওপর চালের বাতায় ভাজ করে গুঁজে রেখেছিল। বাড়িতে যখন পৌঁছালো রাত্রি বারোটা হবে, সবাই ঘুমিয়ে গেছে। চোরের মত বেড়া বেয়ে উঠে বাতার পরে বসে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলো; কিন্তু এত কাগজের মধ্যে কোনটি আন্দাজ করতে না পেরে হনুমানের সেই পর্বত ঘাড়ে করার মত সমস্ত কাগজ জমা করে নিয়ে নীচে নেমে এলো। জ্যোৎস্নার আবছা আলোকে প্রয়োজনীয় কাগজ দু'টি খুঁজতে চেষ্টা করলো। এর মধ্যে দেখলো মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় বসলেন। শ্যামল বুঝলো দুশ্চিন্তায় মা ঘুমোতে পারছেন না। পিছনের দিকে আস্তে আস্তে সরে গেল, নতুবা মার নজরে পড়লে আবার একটা ঝামেলা বাঁধবে। কাগজ দু'টি বেছে বাকীগুলো বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে চলে এলো।

শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় প্রতিকূল উত্তুরে হাওয়া মাড়িয়ে ওরা ছ'মাইল দূরবর্তী রেল ষ্টেশনে যখন পৌঁছালো তখন রাত্রি দু'টোর কম নয়।

Waiting room-এ কোন লোক না থাকলেও খোলা ছিল। দু'জনে দু'টো চেয়ারের ওপর বসে একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করলো। কিন্তু মশার উষ্ণ অভ্যর্থনায় সম্ভব ছিল না। মনে দুশ্চিন্তা, ভোরবেলায় 1st ট্রেণটা ধরতেই হবে—বসে বসেই বাকী রাতটুকু কেটে গেল।

যশোর কালেক্ট্রি অফিসে D. C. সাহেবের সংগে দেখা করতে অত আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হলো না, আর্দালী বললো, এবার তোমরা এসো, দল ধরে সবাই ঢুকে গেল। D. C. সাহেব মনোযোগ দিয়ে সবই শুনলেন, আগে রাত্রিবেলার অভিজ্ঞতা, তারপর সমস্যা।

উঁনি বললেন, তোমাদের সব কথাই বুঝলাম, এমন যে হয়, সেটাও আমি জানি; স্কুলের নামে এসব ব্যবসা আজ প্রত্যেকটা স্কুলে, কিন্তু কিছুই করার নেই। সে যাহোক, এতদূরে তোমাদের স্কুল কর্তৃপক্ষকে ডেকে তোমাদের সাথে মীমাংসা করে দেওয়া তো সম্ভব নয়। আমি নওয়াপাড়ার C.O. (Dev) সাহেবের উপর ভার দিয়ে দিচ্ছি, উঁনি একটা মীমাংসা করে দেবেন।

শ্যামল: না স্যার, তার থেকে ভাল হয়, আপনি দু'-একদিনের মধ্যে আমাদের স্কুলে আসুন, এখন রাস্তাঘাট শুক্‌নো আছে, গাড়ী যাবে।

: সেটা হলে হয়তো বেশী ভাল হতো। তোমাদের সত্যিকারের অবস্থা নিজের চোখে দেখে আসতে পারতাম; কিন্তু আমার এখন কাজের প্রচণ্ড চাপ। পনের দিনের প্রোগ্রাম করাই আছে — তাছাড়া তোমাদের দেখেই আমি বুঝে গেছি কত তোমাদের সমস্যা! চিন্তা করার কারণ নেই, সন্তোষজনক ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তবুও ওদের চোখে সন্দেহ দেখে বললেন, তোমরা কেউ C.O. সাহেবের সংগে কথা বলো। ফোন ধরাই ছিলো, শ্যামলকে সবাই ধাক্কাধাক্কি করতে থাকলো। শ্যামল প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল। ফোনে কি করে কথা বলতে হয়, কেমন শোনা যায়, ও কিছুই জানে না।

মরিয়া হয়ে ফোন ধরতে গেল, কানে আর মুখে লাগাতে গিয়ে উল্টো হয়ে গেল; মুখের দিকটা কানে লাগাতে গেল। D.C. সাহেব দেখে ঠিক করে দিলেন। শ্যামল রীতিমত কাঁপছে, উত্তেজনায় প্রথমে কিছুই শুনতে পেল না যেন। বারে বারে হ্যালোর জবাবে শেষ পর্যন্ত সাড়া দিল, কথা হলো।

D.C. সাহেব ওদের কিছু টাকা দিতে গেলেন, যাহোক কিছু খেয়ে তারপর রওনা হতে; কিন্তু শ্যামল আপত্তি করলো। বললো, সাহায্য যদি করতে চান তাহলে আমাদের যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন, আমাদের ট্রেণ ভাড়া নেই।

D.C. সাহেব ছেলেদের প্রতি অনুকম্পা দেখালেন। ষ্টেশন মাষ্টারকে ফোনে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিলেন এবং একটা চিঠি লিখে শ্যামলের হাতে দিয়ে বললেন রেখে দাও, কোন ঝামেলা হলে তাঁকে দেখাবে. অসুবিধা হবে না।

শ্যামল বললো, দেখুন স্যার, C.O সাহেব হয়তো জানবেন না কত fee হওয়া উচিৎ এবং এখন ছাত্র ছাঁটাই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে। তাই, আমি মনে করি বোর্ডের সংগে যোগাযোগ করে আপনি সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে C.O. সাহেবকে একটা চিঠি লিখে দিন, তাহলে ব্যাপারটা সহজে মীমাংসা হয়ে যাবে।

: ঠিক আছে, তোমরা যাও, আমি ইতিমধ্যে সবই জানিয়ে দেব আর কোন অসুবিধা হলে C.O সাহেব সংগে সংগে ফোনে আমার সংগে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন, আজ আমি সন্ধ্যে পর্যন্ত অফিসেই আছি, তাছাড়া বোর্ডের সংগে কথা বলতে তাঁর অসুবিধা হবে না।

ট্রেণের অনেক দেরী। ঘড়িতে তখন প্রায় একটা বাজে! সবার মুখ ক্ষুধায় শুকিয়ে গেছে। মাঝে একবার বিষ্ণুদা সবাইকে পাউরুটী, কলা আর ডিম খাইয়েছে; কিন্তু তাতে কি আর পেট ভরে, চলেই বা কতক্ষণ! গ্রামের ছেলে সবাই, ওসব চা-বিস্কুটে কাজ দেয় না। বিষ্ণুদা বুঝতে পারলো অবস্থা, নওয়াপাড়ায় গিয়ে কত রাত্রি পর্যন্ত বসে থাকতে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তারপর আছে ছ'মাইল হাটা পথ।

ষ্টেশনের পাশেই হোটেল, বিষ্ণুদা দশজন করে এক এক বারে খাইয়ে আনা শুরু করলো। হোটেলে মাছ আর মাংস ছাড়া একমাত্র ডাল। মাংস বেশীর ভাগ ছেলেই খেতে চায় না—কে জানে গরুর মাংস খুব সস্তা, খাসীর মধ্যে মিশিয়েও তো দিতে পারে! খেয়ে-দেয়ে সব চাঙা হয়ে উঠলো, এবার বোধহয় রাত দশটা পর্যন্ত আর কোন অসুবিধা হবে না।

C.O. সাহেব বললেন, তোমাদের আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে, লোক

পাঠিয়েছি তোমাদের হেডস্যারকে ডাকতে, এখনও এসে পৌছাননি। তো ততক্ষণে Sub-Register (Rev) office-এর সামনের মাঠে অপেক্ষা ক আমি আসছি।

C.O. সাহেব আসলেন। আসলেন হেডস্যার ও অন্য আরেকজন সহ শিক্ষক। C.O. সাহেব অসুস্থ্য, তাই Sub-Register সাহেবের উপর দিয়ে দায়মুক্ত হলেন।

নওয়াপাড়া স্কুলের হেডস্যারকেও C.O. সাহেব ডেকেছিলেন, নওয়াপা স্কুলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মশিয়াহাটী স্কুল। সে Result হোক, ফুটবল হে ভলি হোক, আর Atheletic Sports-ই হোক, সব তাতেই নওয়াপাড়া নাস্তানাবুদ হয় মশিয়াহাটীর কাছে। কিন্তু আজ একটা মওকা মিলে গে সম্ভব হলে আচ্ছা করে হেডস্যারকে নাকানি-চুবানি দেওয়া হবে।

অলকবাবু সংগে থাকলে হয়তো নওয়াপাড়া তেমন সুবিধা করতে পারে কিন্তু অলকবাবু ধূর্ত লোক, এ বিপদে কখনও তিনি সামনে আসবেন না।

হেডস্যারকে ভেড়া পেয়ে সুযোগ নিতে নওয়াপাড়ার স্যার ভুল করলেন না তিনি হিসাব দিলেন, fee ষাট টাকার বেশী কোনক্রমেই হয় না, আর Scien এর ছাত্রদের জন্যে Practical থাকায় দশ টাকা বেশী।

মশিয়াহাটীর হেডস্যার আম্‌তা আম্‌তা করতে থাকলেন। এ fee, সে f সবশেষে কোচিং করাতে হবে, সে fee, ষাট-সত্তর টাকায় কখনও হয় না। ছাত্রেরা যে বিরাট অংকের কথা বল্‌ছে ওটা ঠিক নয়, বাড়িয়ে বল্‌ছে, আম একশ' দশ টাকা fee ধার্য করেছি।

ছাত্রেরা সবাই চিৎকার করতে শুরু করলো, শ্যামল, নোটীশটা একব বের করে দে, সবাই দেখুক।

শ্যামলের নোটীশটা বের করে হেডস্যারকে অপদস্থ করার মত মানসিক তখন ছিল না। ততক্ষণে তার মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে নওয়াপাড়া আর মশিয়াহা নওয়াপাড়ার মাঠেই Inter School ফুটবলে সেই তুমুল মারামারিতেও নওয়া পাড়াদের ধরাশায়ী করে, তবে তারা ফিরে গিয়েছিল, এ ধরণের বহু ঘট ঘটেছে, তারা কখনও পরাজিত হয়নি। আর আজ সত্যি-মিথ্যে তথ্য দি নওয়াপাড়ার হেডস্যার শুধু তাদের হেডস্যারকে নয়, মশিয়াহাটীকেই ব্যঙ্গ করছে

অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা ও আপত্তিকর শব্দও ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না।

শ্যামল বললো, দেখুন, আমরা D.C. সাহেবকে আমাদের অসুবিধার কথা জানিয়েছি, সে অধিকার আমাদের আছে ; তিনি C O. সাহেব ও তারপর Sub-Register সাহেবের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা আলোচনায় এসেছি। নওয়াপাড়া স্কুলের হেডস্যার, আমরা মনে করি আমাদেরও শিক্ষক। তিনি আমাদের নমস্য। কিন্তু আজ এ অবস্থায় আমরা তাঁর অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা ও আপত্তিকর শব্দগুলো শুনতে বাধ্য নই, তাছাড়াও তিনি যে তথ্য দিয়েছেন তা বিকৃত। প্রকৃত fee সত্তর টাকার কম হতেই পারে না, সেটা আমরা ঠিকভাবে জানি। প্রশ্ন আসতে পারে নওয়াপাড়ার স্কুলের ছাত্রেরা কত fee দিয়ে পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাচ্ছে? আমরা সঠিক বিচার প্রার্থনা করি, আমাদের ব্যবহার করে কেউ তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আমাদের অসম্মান করুক, এটা আমরা বরদাস্ত করতে রাজী নই।

শ্যামলের বক্তব্য শুনে সব নির্বাক হয়ে গেল। যাহোক, সত্তর ও আশী টাকায় শেষ পর্যন্ত রফা হলো এবং এ সময় কোন ছাঁটাই দেওয়া অনুচিত এই রায় দিয়ে Register সাহেব শেষ করলেন। —হেডস্যারের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উঠলো না।

ছেলেদের মন খুশীতে টগ্‌বগ করে উঠলো। আনন্দ প্রকাশের কোন ভাব ও ভাষা তারা খুঁজে পায় না। শ্যামলকে নিয়ে সবাই নাচতে শুরু করলো। দুই বা পৌনে দু'ঘণ্টার পথ তারা এক ঘণ্টাতেই অতিক্রম করলো ; সমস্ত ক্লান্তি যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। এত বড় জয় সম্ভবতঃ ওদের মধ্যে কেউ আগে থাকতে আঁচ করতে পারেনি।

কিন্তু দেহচ্যুত কাঁকড়ার ঠ্যাঙ যেমন কামড় শিথিল করে না, পরাজিত কর্তৃপক্ষ তবুও তাদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করতে চেষ্টার ক্রুটী করলো না। অলকবাবু সবাইকে অভয়বাণী শোনালেন—ছেলেরা ক্লান্ত, এখন একটা সামান্য আঘাতেই ওরা মুষড়ে পড়বে, তোমরা চিন্তা করো না। তিনি বললেন, আমি D.C সাহেবকে পথে আনবার ভার নিলাম ; তোমরা C.O. সাহেব আর Sub-Register সাহেবকে সন্তুষ্ট করো।

পরিকল্পনানুযায়ী সেক্রেটারীর পুকুর থেকে দশ-বারো সের ওজনের

রুইমাছ একটা পাকড়াও করা হলো। বাছাই-বাছাই মুরগী জোগাড় হলো মান কচুর সংগে কই মিলবে ভাল। যশোরের কই সমস্ত দেশের কাছে প্রিয়, আর যশোরের লোকের প্রিয় বিল বোকড়ের বুক রাঙা কই। Sub register-এর মাথা ঘুরতে কতক্ষণ!

অলকবাবুর ভরসা বর্তমান D C. আওয়ামী লীগের লোক। জেলাস্তরে নেতাদের বোঝাতে হবে বর্তমান পরিস্থিতিতে মাথা নত করলে জনসাধারণে আর কোন আস্থা তাদের ওপর থাকবে না; বরং ছাত্রেরা সব ছাত্র ইউনিয়নের ওদের জয়ের অর্থই হবে জনগণের মনে স্থান করে নিতে ওরা সমর্থ হবে ফলে, আসন্ন নির্বাচনে লড়তে হলে যে কোন উপায়ে মান-সম্মান বাঁচাতে হবে।

অলকবাবুর অনুরোধ জেলা নেতাদের উপেক্ষা করার কোন ইচ্ছা ছিল না। কারণ, মশিয়াহাটীর মত হিন্দু প্রধান এলাকাগুলোই আওয়ামী লীগের প্রধান ভরসা। ফলে যা হবার তাই হলো।

Form Fill up করতে ছাত্রেরা হাজির হলো। হেডস্যার ত্রুটি স্বীকার করে বললেন, আলমারীর চাবিটা অলকবাবুর কাছে, উনি স্কুলের কাজে যশোর গেছেন, আমরা ভুলে গেছি চাবিটা রেখে দিতে; Form গুলো আলমারীতে আটকে গেছে, তোমরা কাল এসো সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

, ছাত্রেরা আঁচ করেছিল আগেই; এবার নিশ্চিত হয়ে গেল হেডস্যারের কথা শুনে। "পশু মুগুরে সোজা" — সত্যটার গুরুত্ব উপলব্ধি করলো এবং প্রস্তুতি নিলো সেমত ব্যবস্থার।

পরেরদিন ছাত্রেরা এসে হেডস্যারের কাছে Form চাইলো। সবার আগে শ্যামল। হেডস্যার এবার সৎ সাহসের পরিচয় দিলেন, বললেন, আগের সিদ্ধান্তই বহাল, কোন রদ্‌বদল হবে না; যে পারবে পরীক্ষা দেবে, আর যার সামর্থ্য নেই সে পরীক্ষা দেবে না, লেখাপড়া সবার জন্যে নয়।

ক্রুদ্ধ, বিস্ফোরন্মুখ ছাত্রেরা বের হয়ে এলো। তাহলে এরপর আমাদের কি করা উচিৎ? —শ্যামল বন্ধুদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

বিষ্ণুদা: আমাদের আরেকবার D.C. সাহেব, C.O. সাহেব এবং Sub-register সাহেবের সংগে দেখা করা বোধহয় একান্ত দরকার।

শ্যামল : তোদের কি সবার এই মত? —সবাই-এর পক্ষে রায় দিল।

শ্যামল বললো, না, আমার মনে হয় তাতে সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না। তোরা হয়তো শুনেছিস্, সেক্রেটারীবাবুর পুকুরের মাছ, ক্ষেতের কচু, মুরগী, Sub-register সাহেবের বাড়িতে গেছে। আর অলকবাবুর গতকালের যশোর সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, আমার মনে হয় D.C. সাহেবের অবস্থাটাও Register সাহেবের মত। ফলে, কোন লাভ হবে না।

: কিন্তু তা না হতেও তো পারে!

: এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই, গতকাল স্পষ্ট বলতে সাহস পাননি হেডস্যার, আর আজ? —সবাইকে ম্যানেজ করতে পেরেছে বলেই এত সাহস —এতো অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন।

স্থির হলো, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের এখানেই ইতি। শক্তি প্রয়োগ ছাড়া গত্যন্তর নেই। উৎফুল্ল হেডস্যার চেম্বারে বসে। চেম্বারের দরজা বন্ধ হয়ে গেল; বাইরে থেকে একটা বিরাটকায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

স্কুলের ছেলেরা কর্তৃপক্ষের নোংরা ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ক্লাস বর্জন করে দলে দলে বেরিয়ে এলো। স্কুলের দু'দিকের রাস্তায় লাঠি হাতে পরীক্ষার্থীদের সংগে যোগ দিয়ে একাত্মতা জানালো।

এতদিনের অপ্রতিরোধ্য মোড়লেরা ছাত্র, অভিভাবক ও জনসাধারণের জংদেহী মনোভাব দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। মান বাঁচাতে কেউ চলে গেল বিয়াইবাড়ি, কেউবা মেয়ের বাড়ি—পরবর্তীতে যেন বলার সুযোগ থাকে; আমি বাড়ি ছিলাম না, সে সুযোগে এত সব, নতুবা.........।

কিন্তু এত করেও মান বাঁচানো সম্ভব হলো না। হাজতে আটক আসামীর মত হেডস্যারকে দু'দিন খাওয়া-দাওয়া ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে নেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু মুক্তি মেলেনি। ছাত্রেরা ইচ্ছা করেই অলকবাবুকে বন্দীদশায় কাল কাটাতে বাধ্য করেনি; কারণ, যেহেতু স্থানীয়, বংশের কিছু কিছু লোক রক্তের টানে অন্যসব দ্বন্দ্ব ভুলে ওর সাহায্যে এগিয়ে আসবে, সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হতো না।

Form Fill up করার শেষ তারিখ নিকটে, ছাত্রেরা বেপরোয়া, উদ্বিগ্ন

অভিভাবকেরা। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ শংকিত—শেষ পর্যন্ত যদি এতগুলো ছাত্র পরীক্ষা দিতে না পারে ; তাহলে মাতব্বরিতো শিকেয় উঠবেই, পিঠের চামড়ার নিশ্চয়তাই বা কতটুকু ! কে জানে মেয়ের বাড়ির বা বিয়াই বাড়ির shelter গোপন থাকবে কি-না !

শেষ পর্যন্ত হেডস্যারকে বল প্রয়োগ করে Form Fill up-এর ব্যবস্থা করানোর প্রয়োজন হলো না, মোড়লেরা এসে অত্যন্ত আগ্রহ দেখালো, যেহেতু সময় অল্প। যাই হোক না কেন, স্কুলের যত ক্ষতিই হোক না কেন, এতগুলো ছাত্রের জীবন নষ্ট হয়ে যাক তাতো তারা চায় না ! সবাই যে তাদের নিজেদের সন্তান !

মশিয়াহাটীর ধুরন্ধর মোড়লেরা এর থেকে কি শিক্ষা নিলো জানি না ; তবে তাদের চরিত্রের কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে, একথা চিন্তা করলে ভুল হবে। শ্যামলদের এ আন্দোলন আজও মশিয়াহাটীতে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এ আন্দোলন প্রমাণ করেছে, মশিয়াহাটীর মোড়লেরা যত শক্তই হোক, অপরাজেয় তো নয়ই বরং কাগুজেবাঘ, কোন সমঝোতা নয়, সংগ্রামই সাফল্যের উৎস। এ আন্দোলন মশিয়াহাটীর প্রত্যেকটি আন্দোলনকে প্রেরণা জোগাবে, সাহস জোগাবে পরবর্তী আন্দোলনকারীদের, আর আন্দোলনের নামে শিউরে উঠবে প্রতিক্রিয়াশীল মোড়লেরা।

★

C.I.A. পরিকল্পিত শূন্যগর্ভ ছয় দফা দাবী নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ আওয়ামী লীগ অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক সংগঠন। স্বায়ত্ত শাসনের মত জটিল প্রশ্ন নয় ; পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা শোষিত হবার শ্লোগান পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণকে মোহগ্রস্থ করে ফেললো। উগ্র জাতীয়তাবাদের শ্লোগানে তারা অন্ধ হয়ে গেল। পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফের মত ভাওতায় বিপথগামী হলো ; আর কর্ণফুলি পেপার মিলের তৈরী কাগজ পূর্বপাকিস্তানে বারো আনা দিস্তা অথচ সেই কাগজ পশ্চিম পাকিস্তানে ছ'আনা — এ ধরণের ফাঁকা বক্তৃতা মানুষের মনকে বিষিয়ে দিল।

দুর্বল ও অবৈধ কমিউনিষ্ট পার্টি তার সীমিত শক্তি নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে

আর্তনাদ করে উঠলো — প্রকৃত শত্রু সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্তবাদকে আড়াল করতে, জনগণের মুক্তির আকাঙ্খাকে বিপথগামী করতে, তাদের বিভ্রান্ত করতে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে প্রাণপণ প্রচেষ্টা করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বজ্রকঠিন অর্থ-নৈতিক বেষ্টনীর মধ্যেও বর্তমান জংগী সরকার, গণবিরোধী সরকার, মহান চীনের বিরুদ্ধে জোট পাকাতে অস্বীকার তো করছেই বরং চীনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাই. সাম্রাজ্যবাদীদের আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বর্তমান দালালদের সরিয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য দালাল ক্ষমতায় বসানোর। সে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে তারা খাড়া করেছে আওয়ামী-লীগকে। এ আন্দোলন কখনও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হতে পারে না, এ আন্দোলন মানুষের মুক্তি আনতে পারে না। এ আন্দোলন সাম্রাজ্য-বাদীদের মহান চীনকে সামরিকভাবে ঘিরে ফেলার চক্রান্তের অংশ। তাই, জনগণের আশু প্রয়োজন আওয়ামী লীগকে পরাস্ত করে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তকে নস্যাং করে দেওয়া।

কিন্তু রাজনীতিতে অসচেতন পূর্ব পাকিস্তানের জন সাধারণ আওয়ামী-লীগের প্রচারে এতই বিভ্রান্ত যে. কমিউনিষ্ট পার্টির আবেদন তাদের কানে পৌছালো না। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রচুর ভোটের ব্যবধানে জয়যুক্ত হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। আওয়ামী লীগের এই সাফল্যে যত কৃতিত্ব দাবী করতে পারে আওয়ামী লীগ, তার থেকে অনেক বেশী প্রাপ্য বর্বর সেনা বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার।

তারপর বহু টানা পোড়নের পর আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারী নেতা শেখ মুজিবর রহমান গ্রেফতার হলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কাড়াকাড়ির জের হিসাবে সোভিয়েত তার তল্পীবাহী পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সহায়তায় মার্কিনের দীর্ঘ দিনের সযত্নে গাঁথা মালা নিজের গলায় পরে নিল।

পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বর্বর অত্যাচার ও অত্যাচারের ভয়ে এবং ভারতীয় রেডিওর অনুকুল প্রচারে দলে দলে শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করে; সাথে সাথে অবস্থাও সোভিয়েতের অনুকূলে চলে আসতে থাকে। ভারত-

সোভিয়েত সহযোগিতার নামে দীর্ঘ মেয়াদী সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তার বলে বলিয়ান হয়ে পূর্বপাকিস্তানে মাওবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অতিদ্রুত অগ্রগতিতে ভীত হয়ে অনতিবিলম্বে মিত্রবাহিনী নাম করে ভারতীয় সেনা-বাহিনী পূর্বপাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ঠিক যেমনটি হয়েছে ভিয়েতনামের মাধ্যমে কাম্পুচিয়া, লাওস গ্রাস, কিউবার মাধ্যমে এঙ্গোলা প্রভৃতি ….. ।

জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগশূন্য, অন্তরীণ, নৈতিকতা-বলহীন বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে ; দেশ আরেকবার পরাধীন ও লুন্ঠিত হয় । এবং সেই সাথে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ পরিপূর্ণভাবে তার দখল কায়েম করে । পূর্বপাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম. এল) ক্ষয়িষ্ণু ও আত্মরক্ষা ব্যস্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং উদীয়মান ও আক্রমনাত্মক সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের এই টানা হেঁচড়া ও দখল হস্তান্তরকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করতে অসম্মত হয় এবং ভারতীয় সেনাবাহীনীর এই নগ্ন আগ্রাসনকে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি ও ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সমর্থন করায় তীব্র নিন্দা করে ।

শেখ মুজিবর রহমান গ্রেফতার হবার সংগে সংগে দেশব্যাপী শুরু হয় প্রবল আন্দোলন আর উশৃঙ্খলতা । উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষে জর্জরিত বাঙালীরা ক্ষুধার্থ হায়নার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে অবাঙালীদের ওপর, নৃশংসভাবে হত্যা করে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু আর নারীদের । দেশ প্রেমিক, সৎ নাগরিকেরা ইহুদী নিধন যজ্ঞের বর্ণনা পড়েছেন, শুনেছেন ; আর এদেশে যা স্বচক্ষে দেখলেন তার পার্থক্য নিরূপনে ব্যর্থ হলেন ।

বর্তমানে, যখন আসামে তীব্র বিশৃঙ্খলা, তখন মনে করিয়ে দেয় সেদিনের স্মৃতি । ভারতবাসী সেদিন ধন্য ধন্য করেছিল (আজও করে) আওয়ামী লীগকে এবং শেখ মুজিবর রহমানকে, স্বাগত জানিয়েছিল এই আন্দোলনকে অথচ আজ অসীময়াদের কি নিন্দাই না করছেন ! [অসমীয়াদের বর্তমান আন্দোলনের কতকগুলো বাস্তব ভিত্তি আছে । বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে আসামে দারিদ্র ও বেকারীর চাপ যত বাড়ছে, অসমীয়াদের নিজ বাসভূমিতে পরদেশী হয়ে যাবার আশংকা ততই মৌনতা ভেঙে সোচ্চার

হয়ে উঠেছে।

ভারী শিল্পের বিকাশের মাপ কাঠিতে আসাম, পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার চেয়ে অনেক বেশী পিছিয়ে পড়া। সুতরাং অসমীয়াদের বেকারীর ভার লাঘবের পথে ভারী শিল্পের বিকাশ কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। আজ তাই অসমীয়া মধ্যবিত্তের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাহিদার সামনে আসামে দীর্ঘ দিনের প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত বহিরাগতরা বারে বারে শত্রু বলে পরিগণিত হচ্ছেন। অ-অসমীয়াদের কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়িক ভিত্তি অসমীয়া মধ্যবিত্তের বেকারী ও দারিদ্রের কারণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

আসামে বিদেশী বহিষ্কারের দাবীর পিছনে অসমীয়াদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর অ-অসমীয়াদের আক্রমণের এক প্রচ্ছন্ন সন্ত্রস্ত মনোভাব ও লুকিয়ে আছে। (এ ভীতির কারণও অবাস্তব নয়)

জনগণের দুঃখ দুর্দশা যাদের কাছে পণ্য বিশেষ, মানুষে মানুষে বিভেদ যাদের রাজনৈতিক মুনাফা উঠাবার হাতিয়ারমাত্র, দরদীর ছদ্মবেশে সেই সব অন্ধকারের জীবেরাই আজ বিক্ষুব্ধ আসামে আলোক-শিখা সামনে হাজির হয়েছে। বিভিন্ন বিদেশী শক্তি আসাম নিয়ে জুয়া খেলায় মেতেছে।

কিন্তু আসামের সমস্যার সমাধানের পথ কি? একথা পরিস্কার করে বলা উচিৎ যে আসামের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারী ও দারিদ্রের বঞ্চনা-বোধ বহিরাগতদের আসাম থেকে বিতাড়িত করলেই মিটবে না, এ সমস্যা অন্যান্য হাজারো সমস্যার মতই শোষণভিত্তিক ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ফলশ্রুতি। তাই প্রয়োজন সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন।

সেজন্যে অসমীয়াদের সমস্যা ও আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও সেই আন্দোলন যেভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদের রূপ নিয়েছে তা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। কিন্তু ভারতের সর্ব বৃহৎ কমিউনিষ্ট পার্টি তাকে কি-ভাবে বিশ্লেষণ করছে তা লক্ষ্য করার।] কি বিচিত্র মার্কসবাদের ব্যাখ্যা! —বামফ্রন্ট সরকার আজ চিৎকার করে গলা ভাঙছেন (আসাম নিয়ে) অথচ সেদিনের (পূর্ব পাকিস্তানে) অবাঙালী নিধন যজ্ঞকে সমর্থন করলেন!

যশোর জেল ভেঙে দেওয়া হলো। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দীননাথ

পিছ্‌পা হলো না অচেনা শহরে এসে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়ে নিল। সমস্ত রাস্তা, অলি-গলি মৃত ও মরণোন্মুখ লাসে ছয়লাপ! রক্তমাখা পশুগুলো তখনও মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদ্রোহী E.P.R. তিন দিন মাত্র শহরে তাদের দখল কায়েম করে রেখেছিল। তার মধ্যে যা ঘটেছে, এ যে দীননাথের চিন্তার অতীত। কিন্তু তখনও দীননাথ নীলগঞ্জের বিহারী পট্টির নারকীয় দৃশ্য দেখেনি!

উষ্ণ অভ্যর্থনার মধ্যে দীননাথ গ্রামে ফিরে এলো। মিলিত হলো আত্মীয়-পরিবার পরিজন আর বন্ধুদের সাথে। ধৃতপূর্ব ও মুক্তিত্তোর দীননাথের মধ্যে অনেক ব্যবধান। দেশ প্রেমিক মহান বিপ্লবীদের সংস্পর্শে খাঁটি লোহা খাঁটি সোনা হয়ে ফিরে এসেছে।

শরনার্থীদের পশ্চিমমুখী স্রোতে গা ভাসিয়ে মশিয়াহাটীর আপামর জন-সাধারণ ভারতের মাটিতে এসে পশুর জীবন-যাপন শুরু করলো; ব্যতিক্রম দীননাথ। পরিবারের আন্তরিক আবেদনে সে সাড়া দিতে পারেনি। শ্যামল বার বার বোঝাতে গিয়ে দীননাথের যুক্তিতে নিজেই অনুপ্রাণিত হয়েছে বারে বারে। কিন্তু শ্যামল তার শ্রেণীচরিত্রের আকর্ষণকে অতিক্রম করতে পারেনি, ওরা এতবড় মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে শুরু হতে লড়াই করতে সম্ভবতঃ প্রস্তুত নয়।

দীননাথ অদূরবর্তী নেহালপুর গ্রামে একজন বন্ধুর সাথে দেখা করলো। সেখান থেকে চলে গেল আরও দক্ষিণে ডুমুরিয়া থানা এলাকায়।

দীননাথ কাজে লেগে গেল। কিন্তু তত্ত্বগত আলোচনায় দীননাথ খুবই দুর্বল, সবল হবার কথাও নয়। স্থানীয় নেতারা দেখলেন, তার মোটামুটি ধারণা আছে; যাতে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া, যতটুকু সে জানে প্রকাশ করা বা গুছিয়ে বলা এখনও সম্ভব হয়ে উঠ্‌ছে না। সততা, সুন্দর ব্যবহার আর দৃঢ়তার কোন ঘাটতি তার নেই—যেগুলি একান্ত প্রয়োজন।

পার্টির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুবিধার জন্যে নেতৃবৃন্দ সশস্ত্র বাহিনীকে আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করলো এবং সেদিকে দৃষ্টি রেখেই দীননাথকে গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী হয়ে ওঠবার পরামর্শ দেওয়া হলো এবং সহযোগিতা করলো নেতৃবৃন্দ।

ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, তালা এবং কেশবপুর ও মনিরামপুর থানার একাংশ নিয়ে পূর্বপাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম, এল) মুক্ত এলাকা ঘোষণা করলো।

রাজাকার, আল্‌বদর, আল্‌শাম্‌স্‌ এবং পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর সংগে সংঘর্ষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যে দীননাথ তার যোগ্যতাবলে একটা গ্রুপের leader মনোনীত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কঠিনতর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় দীননাথকেই পাঠানো হয়।

এ অবস্থায় অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পার্টি নিজেদের সংগঠিত করার জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলো। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অংশের সংগে যোগাযোগ করা অসম্ভব। একই নেতা, রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করা সম্ভব হলো না। স্থানীয়ভাবে তারা ভারতের আক্রমণের আশংকা করে প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো পাক সেনাবাহিনীর সংগে একটা ফ্রন্ট তৈরী করার; কিন্তু বর্বর সেনারা অনমনীয়। দূরদৃষ্টিহীন সেনারা এ আবেদনে কোন সাড়াতো দিলই না বরং কমিউনিষ্টদের ওপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দিল। অবশেষে এমন সময়ে তাদের বোধোদয় হলো যখন সময় চলে গেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির গোপন সূত্রে খবর এলো চারশ'এর বেশী রাজাকার একত্রিত হয়েছে। দত্তগাতি ও দামোখালির মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে ওরা আড়োবাঁধের ওপারের কমিউনিষ্ট পার্টির গেরিলা ঘাঁটি আক্রমণ করবে। ওদের কাছে থাকবে 303 রাইফেল, ষ্টেনগান, পাঁচ থেকে দশটি L.M.G. ওরা ভোর রাতে আড়োবাঁধ পার হবে।

খবরটা দীননাথের কানে পৌছতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। উত্তর দিকের যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব তার। এক সঙ্গীকে হেড কোয়ার্টার থেকে একটি L.M.G. ও কিছু বুলেট আনবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে একান্ত বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান সাথীকে সঙ্গে করে সন্ধ্যার অন্ধকারে বেরিয়ে গেল।

প্রথমেই নির্দ্ধারণ করতে হবে জায়গা—কোথায় এ্যাম্বুস বসাতে হবে। অনেক চিন্তা ভাবনার পর জায়গা স্থির হলো আড়োবাঁধের ওপর থেকেই, যেখানে রাস্তাটি নব্বই ডিগ্রিতে মোড় নিয়েছে, ওখানেই ওদের প্রতিরোধ ও বিধ্বস্ত করার সুবিধাজনক স্থান।

L M.G দুটি থাকবে মোড়টার সামনেই ঝোঁপের মধ্যে পূব দিকে মুখ করে। যেখান থেকে ছোট খালটার উত্তর পাড়ের উঁচু রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসা পুরো শত্রু বাহিনীটিকে cover করবে। গেরিলাদের মূল বাহিনী থাকবে খালের দক্ষিণ পাড় ও বাঁধ বরাবর। Leader ও অন্য আর একজন থাকবে উঁচু রাস্তাটির উত্তর দিকে অর্থাৎ খালের উল্টোদিকের ঘন জংগলে। এদের কাজ হবে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া।

Leader সুবিধাজনক অবস্থান থেকে নজর রাখবে পুরো বাহিনী যখন ওদের পিছনের সাঁকোটা পার হয়ে আসবে এবং বাহিনীর অগ্রভাগ L M.G.-এর কাছাকাছি এসে পড়বে তখনই সে fire open করবে, সংগে সংগে L.M.G গর্জে উঠবে, মূল বাহিনী সাময়িক নীরবতা পালন করবে।

L.M.G.-এর অতর্কিত আক্রমণেই ওদের শক্তিক্ষয় হয়ে যাবে প্রথমেই, মিলিয়ে যাবে লড়াই করার মনোবল। উত্তর দিকের একটানা fire-এর ফলে ওরা ফাঁদে পড়বে, উঁচু রাস্তার দক্ষিণে আশ্রয় নিয়ে রাস্তাকে সামনে আড়াল রেখে প্রতিআক্রমণ করার সাহস যদি পায় ততক্ষণাৎ পিছন থেকে মূল বাহিনী ও সুবিধাজনক অবস্থানের জন্যে L M.G -এর সম্মিলিত আক্রমণে ওরা ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

দীননাথ গভীর রাতে সবাইকে ডেকে তার পরিকল্পনা জানিয়ে দিল, নির্দেশ দিল প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে। দীননাথের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সবাই অবাক হয়ে গেল। নিঃসন্দেহ হলো নিজেদের বিজয় সম্পর্কে. দলের মনোবল বেড়ে গেল আশাতীত পরিমাণ।

ভোররাতে রাজাকারদের বিশাল বাহিনী এসে ফাঁদে পা দিল। সুপরিকল্পিত আক্রমণের মুখে পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, প্রতিআক্রমণের কোন সুযোগই ওরা পেলনা। এক তরফা মার খেয়ে মরলো এবং বাদবাকী অস্ত্রশস্ত্র ফেলে যে যার মত পালিয়ে গেল আবছা অন্ধকারে।

বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদ দখলে এলো, বাহিনীর শক্তি অনেক বেড়ে গেল। পার্টি অভিনন্দন জানালো দীননাথকে।

রাজাকারের এই চরম বিপর্যয়ের পর মুক্তাঞ্চলের উপর আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে গেল। নদীপথে পাক-সেনারা এগিয়ে এসে গানবোটের ওপর

থেকে গোলাবর্ষণ ও L.M.G এর অবিরাম গুলিবর্ষণে নদীপাড়ের গ্রামগুলোকে ছারখার করতে থাকলো, কিন্তু ডাঙায় ওঠার বাহাদুরী ওরা করতে গেল না।

বহু ছোট-খাট সংঘর্ষের মধ্যে আরেকটা সফল অভিযান দীননাথের মনে দাগ কেটে আছে। দুপুর বেলায় বিশ-পঁচিশজন পাক সেনা এসে নামলো কপালিয়া বাজারে। (এখানেই কমিউনিষ্ট সন্দেহে চিত্ত, মনোরঞ্জনসহ চোদ্দটি তাজা তরুণকে রাজাকারেরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। মশিয়াহাটীর পঙ্কোজের ভাগ্য এই শহীদের সংগে যুক্ত নয়, এ কথা কেউ হলফ্ করে বলতে পারে না।) নদী পার হতে খেয়া নৌকায় গিয়ে উঠলো। অত্যন্ত সতর্ক - রাইফেল, L.M.G., ষ্টেনগান একেবারে বাগিয়ে ধরা আছে।

দীননাথ সবাইকে নদীর অপর পাড়ের WAPDA-এর ভেড়ীর ধারনয়ে খোড়া বাংকারগুলোতে আশ্রয় নিতে নির্দেশ দিলো। এবং নিজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জোয়ারের জলে অর্ধেক নিমজ্জিত চরের উড়া গাছের মধ্যে লুকিয়ে রইল। হাতে দু'টি গ্রেনেড, একেবারে 'প্রাইম' করা। খেয়াতে পার হতে হলে উড়া গাছের ধার দিয়েই আসতে হবে, অন্য কোন উপায় নেই।

খবর পেয়ে এলাকাতে কোন লোকজন নেই। মাঝি নৌকা রেখে হাওয়া। ওরা কোন রকমে পূর্ণ জোয়ারের স্রোতহীন থমথমে নদীতে নৌকা বেয়ে এগিয়ে গেল উড়া গাছের কাছাকাছি। মুহূর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট এসে পড়লো নৌকার ওপর। সন্ত্রস্ত সেনারা বিরাট নৌকার মধ্যে মাথা গুঁজে জবাব দিতে শুরু করলো।

ইতিমধ্যে উড়া গাছটা একটু নড়ে উঠলো, আর একটা গ্রেনেড অল্পের জন্যে নৌকার পাশে জলের মধ্যে ডুবে গেল। হয়তো জলের নীচে বিস্ফোরণও হলো; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার সময় ওদের ছিল না। এর মধ্যে নৌকার টালমাটাল অবস্থা, আরও এগিয়ে এসে দীননাথের একেবারে কাছাকাছি। না, আর দেরী করা চলে না, এলোপাতাড়ি গুলি ছিটকে এসে আঘাতও করতে পারে। কিন্তু নৌকাখানি এতো কাছে এসে পড়েছে যে, ওর মাঝে গ্রেনেডের বিস্ফোরণ হলে উড়া গাছ ও নিরাপদ দূরত্বে নয়। অগত্যা গ্রেনেড ছুঁড়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলের মধ্যে, সাথে সাথে

সব শেষ।

অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারতীয় বাহিনী ঢুকে পড়লো এবং তখনই পাক সেনাদের টনক নড়লো। বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র কমিউনিষ্টদের হাতে ওরা তুলে দিল। কিন্তু সে বড় দেরী হয়ে গেছে। গেরিলারা তার বেশীর ভাগেরই ব্যবহার জানতো না, শিখে নেবার সময়ও ছিল না। তবুও তারা সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, মেরেছে ; মরেছে সাময়িকভাবে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে, অস্ত্রগুলোকে রক্ষা করতে চেষ্টার ক্রুটী করেনি ; কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি !

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১, পাক বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের সাথে সাথে বাংলাদেশ তথাকথিত স্বাধীনতা পেল। শরণার্থীরা দেশে ফিরে এলো, ফিরে এলো শ্যামল ও তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধবেরা। দীননাথের স্ত্রীও ফিরে এলো কিন্তু ; চিরদিনের মত রেখে এলো আদরের মেয়েকে।

যুদ্ধে সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত, ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত কমিউনিষ্ট পার্টি তার অবশিষ্ট প্রাণ শক্তিটুকু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিল গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে, নতুন-ভাবে শক্তি সঞ্চয়ের কাজে ; দীননাথ ঘরে ফিরে এলো।

শ্যামলরা বাড়ি ফিরে এসেছে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। একদিন মাঠের পাশে বসে আছে, পায়ে চোটের জন্যে খেলতে পারছে না। সুজয়, অমর, ওরা আট-দশজন এগিয়ে এলো। ওদের আসতে দেখেই শ্যামলের সন্দেহ হলো, নিজকে প্রস্তুত করে ফেললো অপ্রীতিকর কোন ঘটনার মোকাবিলার জন্যে। কিন্তু ওরা বেশীদূর এগোলো না, শুধু সাবধান করে গেল—মনে রাখিস্ এটা আওয়ামী লীগের জামানা, ঘরে বসে থাকবি শান্ত ছেলের মত ; তাছাড়া মশিয়াহাটীর বাইরে যে কোন দিকে যাবার সময় একটু সতর্ক হয়ে যাবি।

শ্যামলের পায়ের চোট বেশ বেশী। আর ওর জন্যে শরীরটাও বেশী ভাল নয় ; হাতাহাতি করার মানসিকতা তার ছিল না। বললো, আমাদের কাছে দুই জামানাই এক, অন্যায়কে আমরা বরদাস্ত করিনি, করবোও না, আমরা কারুর চোখ রাঙানীকে সমীহ করি নে।

সুজয়ঃ আচ্ছা দেখা যাক !

শ্যামলের অজানা ছিলো না যে, ওদের দল অনেকটা ভারী হয়েছে। কিন্তু শক্তি কতটা বেড়েছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অকেজো কিছু ছেলে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, সেই সুবাদে দলে ভিড়েছে। লেজটা একটু লম্বা হওয়ায় ওরা ওদের শক্তি পরীক্ষা দেবার জন্যে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, মওকা মিলে গেল। দু'দিন বাদেই একুশে ফেব্রুয়ারী, শহীদ দিবস।

সুজয় বললো, আজকের শ্লোগান ঠিক করবো আমরাই এবং আমরাই মিছিলের নেতৃত্ব দেব।

শ্যামল ঃ আমরা মিছিল সংগঠিত করেছি, মাইক এনেছি ভাড়া করে, মিছিলে আমাদের ছেলেরাই। তোমাদের শ্লোগান কেন তারা মানবে? আর তোমরাই বা কেন এর নেতৃত্ব দিতে আসবে—তোমাদের নেতৃত্ব কে মানবে?

সুজয় ঃ ঠিক আছে, মাইকের ভাড়া আমরা দিয়ে দেব। তবে তা হলো?

শ্যামল ঃ একি সন্তুষ্ট হবার মত প্রস্তাব! তোমাদের পয়সা আছে, আরেকটা ব্যবস্থা করো, এটা তোমাদের দিতে পারিনে,—বলে অন্য-দিকে চলে গেল।

আশে পাশে অনেকগুলো নতুন মুখ। কোথেকে এলো ভোর রাতে এই মূর্তিগুলো! শ্যামলের সন্দেহ হলো, ওর সন্দেহটা সংক্রামিত করে দিল। ব্যাপারটা সবার চোখে অতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়লো। উত্তেজনায় সবাই কাঁপছে তখন। শ্যামল বললো, শহীদ দিবসে গোলমালটা কি এড়ানো যায় না?

ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস। শহীদদের বেদীতে মালা দিলেই শহীদ-দের আত্মা তৃপ্ত হবে না। তাদের আদর্শকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারা শহীদ হয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে। তাই, শহীদদের স্মরণ করে আজ আমাদের শপথ নেবার দিন যে, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাব। প্রয়োজনে অন্যায়কে রুখতে আজকের পবিত্র ভোরেও আমরা লড়বো। আমি মনে করি তাতে দোষ নেই বরং পবিত্র কর্তব্য। শ্যামল তুই নিশ্চিন্ত থাক, শহুরে ঠোকাঠুকি আর গ্রামের গুতোগুতির পার্থক্য যে কি প্রমাণ করে ছাড়বো!

শ্যামল বুঝতে পারলো আজকের সব প্রোগ্রাম মাটি হবে। কিন্তু

তাই বলে ওদের অন্যায় আবদার মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, তাতে যা ঘটা ঘটবে। শ্যামল শহীদ বেদীর পাশে দাঁড়িয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছি সুজয় ছুটে এসে বললো, তোকে আগেই মানা করেছি কোথাও মাতব্বরি করতে যাবি না ··· ··· বলতে বলতে ধাক্কা মারলো। শ্যামল ছিট্‌কে গি পড়তে পড়তে সামলে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে অমর ও আরেকজন অপরিচি ছেলে সাইকেলের চেইন বের করে সপাটে মারলো। কিন্তু শ্যামল ছিট্‌ সরে গেল। শুরু হলো ভাড়াটে গুণ্ডাদের সাথে মশিয়াহাটীর ঝাল-পা খেয়ে বেড়ে ওঠা বাঘের বাচ্চাদের তুমুল লড়াই। ছুরির আঘাতে গড়ি পড়লো স্কুলের দু'টি বাচ্চা ছেলে। শ্যামল ওদের সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু ওর দিকে ধেয়ে এলো দুই গুণ্ডা, ফলে ব্যর্থ হলো।

মশিয়াহাটীর ছেলেরা সশস্ত্র গুণ্ডাদের সাথে লড়াই শুরু করে খালি হাতে। মুহূর্তেই বেণীরামের বেড় প্রত্যেককেই জোগান দিলো ছোট ক লাঠি, শুধু কয়েক মুহূর্ত মড়্‌মড়্‌ শব্দ।

হাতাহাতি লড়াই-এ মারাত্মকভাবে জখম হলো মশিয়াহাটীর ছেলেরাই কিন্তু রণে ভংগ দেয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেককেই তাড়িয়ে ধরে বেঁ ফেলেছে। লাঠি-সটার পেটানীতে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, স্থানীয় জন সাধারণের ভীড়ে একাকার।

পাশেই ডাক্তারবাবুর বাড়ী, তিনি ছুটে এসেছেন, সবাই ছেলে দু'টি নিয়ে ব্যস্ত। শুধুমাত্র কয়েকজন ছুটছে স্থানীয় গুণ্ডাগুলোর খোঁজে- তারা সব বেপাত্তা।

এমন সময় আবিস্কার হলো বেণীরামের পুকুরে দু'জোড়া হাবুডুবু খাচ্ছে ঘোলা জল পান করে শহুরে গুণ্ডার চোখগুলো যেমন লাল, তেমনি ক হয়ে গেছে, যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে যাবে। তবুও ওদের কপাল ভালো পুকু জল বেশী ছিলনা। কোথাও ডুব জল নয়, নতুবা সলিল সমাধি ওদে হতোই।

দেশের এ অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কত সাহায্যের টোপ আর ঋণ দিয়ে দেশটাকে কতটা কব্জা করতে পারে। আ : দেশের আমলা, নেতা ও চ্যালাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে

সাহায্য ও ঋণের কে কতটা হাতিয়ে নিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ আর দেশীয় দালালদের শিকার সর্বস্বান্ত মানুষগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কাড়াকাড়ি দেখছে; আর উচ্ছিষ্ট কিছু পাবার ব্যর্থ আশায় প্রতীক্ষা করছে।

* * *

দীননাথ: ভাইডি, সংগঠনের জন্যে মারামারি করিস্ ঠিক আছে, প্রয়োজনে অবশ্যই করতে হবে; কিন্তু সংগঠন তো শুধু সংগঠনের প্রয়োজনে নয়, কাজতো কিছু করতে হবে।

শ্যামল: কিসের কথা বলছো তুমি?

: আমাদের স্বার্থ আর তোদের স্বার্থ আলাদা কিছু নয়। আমরা ভাল থাকলে তোরা ভাল থাকবি, তোরা ভাল থাকতে চাইলে আমাদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে—এটাতো ঠিক?

: হ্যাঁ, তা ঠিক; কিন্তু তুমি কিসের জন্যে এসব বলছো, বুঝিয়ে বলো?

: রিলিফের যে মাল আসছে তাতে সাধারণ মানুষ কোন রকমে বেঁচে থাকতে পারে আপাততঃ; কিন্তু সবই তো চুরি করে ফাঁক করে দিলো কয়েকটা লোকে, এসব দেখতে হবে না?

: হ্যাঁ, আমিও ব্যাপারটা ভেবেছি; কিন্তু ঝামেলা অনেক।

: তবুও বাঁচতে গেলে এসব ঝামেলার মোকাবিলা ছাড়া আর উপায় কি?

: আমার পরীক্ষার বেশী বাকী নেই, ওসব নিয়ে আবার পড়ার সময় নষ্ট করবো কি-না ভাবছি।

: তোরা আমাদের সহযোগিতা করলে আমরাই শুরু করছি। পরীক্ষা দে, তারপর উঠে-পড়ে লাগা যাবে।

দীননাথ কৃষক সমিতিকে আস্তে আস্তে চাঙা করে তুললো। বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ছাড়াও নতুন করে দাবী জানানো হলো—রিলিফ কমিটিতে কৃষক সমিতির প্রতিনিধি রাখতে হবে। ওসব পাড়া বা বংশভিত্তিক প্রতিনিধির ধার তারা ধারে না। আর সংগে সংগে গভীর মনোযোগের সংগে কৃষকদের রাজনীতি সচেতন করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কুলটিয়া গ্রামের রিলিফ কমিটিতে সমিতির প্রতিনিধি নিতে বাধ্য হলো।

প্রত্যেক গ্রামে দাবী উঠলো, দাবী ব্যাপকতা লাভ করলো। কোন কোন গ্রামে কৃষকেরা সফল হলো, কোথাও ব্যর্থ হলো। এভাবে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করলো, মুষ্টিমেয় পরজীবিরা আলাদা হয়ে পড়লো।

মধুবচনবাবু হালে পানি পেয়ে নিজ বাড়িতে আবার পুনর্বাসন পেয়েছেন। সুজয়ের সংগে সর্বক্ষণ নিকট সম্পর্ক রেখে চলেন, এভাবে তিনি ধীরে ধীরে ওদের উপদেষ্টার আসন দখল করেন।

* * *

শ্যামল পরীক্ষা শেষে রীতার অনুরোধে যশোর গিয়ে দেখা করে এসেছে ভারতে কাছাকাছি বাস করার সুযোগে মাঝে মাঝে দেখা হতো। আলাপ শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

পরীক্ষা শেষে অনেকটা সময়, কোন কাজের চাপ নেই, নিরবচ্ছিন্ন অবসর। শ্যামল মনে মনে চিন্তা করলো—এ অবস্থায় কি করা যেতে পারে। মাথায় একটা ভাল idea এসে গেল। অঞ্চলে এমন কিছু কাজ আছে যা অত্যন্ত প্রয়োজন; কিন্তু সেদিকে একবার নজর দেবার কোন লোক নেই। তাই স্থির করলো, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এগুলো সে করবে।

একটা তালিকাও সে করে ফেললো। কয়েকটা সাঁকো ভেঙে গেছে, ওগুলো মেরামত করতে হবে। কতকগুলো ছোট ছোট পুলের ধারগুলো রাস্তা থেকে অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে। সাইকেল, গরুর গাড়ী প্রভৃতি চলতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। অপরিচিত লোক-জন অন্ধকারে হোঁচটও খাচ্ছে, ওখানে কয়েক ঝুড়ি করে মাটি ফেলতে হবে। ক্লাব ঘরখানা মেরামতের একান্ত প্রয়োজন, খেলার মাঠটিতে কয়েকটা জায়গায় কয়েক ঝুড়ি বালি দিতে হবে, রাস্তার ওপরে গাছপালা এসে ঢেকে ধরায় রোদ্দুর অভাবে কাদা হচ্ছে, তাছাড়া রাতে গাঢ় অন্ধকারে চলাফেরা করাও অসুবিধে, গাছগুলো ছাঁটতে হবে; বহু পুরোনো পুকুরে কচুরীপানা জমে পড়ে আছে, ওগুলো মশার আড্ডা, তুলে ফেলে মাছ চাষের একটা পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। গাঙ আর খালের মাথায় সাগর শেলা জমে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, একটু বেশী বর্ষা হলেই জল সরতে না পেরে বিল ডুববে, ওগুলো তোলার জরুরী প্রয়োজন প্রভৃতি অন্তহীন কাজ।

শ্যামল নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারলো অলস জীবন কত বাজে, মূল্যহীন চিন্তার জন্ম দিতে পারে। তাই স্থির করে ফেললো, কোন না কোন কাজের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে পারলে একদিকে যেমন জনসাধারণের প্রভূত উপকার করা সম্ভব, তেমনি নিজেদের কলুষমুক্ত রাখতে সাহায্য করা হয়, সেবামূলক কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, সর্বোপরি নিজেদের মধ্যের ঐক্য ঠিক থাকে ও আরও দৃঢ় হয়, মনটা সংগ্রাম বিমুখ হয়ে পড়ে না।

বাড়ির বিভিন্ন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কাজগুলো শেষ করার জন্যে মনস্থির করলো শ্যামল। দু'-চার ঝুড়ি মাটি দেওয়া বা গাছের ডাল খোড়া (ছাঁটা) এমন কিছু শক্ত বা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। এগুলো কতকগুলো গা সওয়া রোগের মত, সংগে নিয়ে দৈনন্দিনকার কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু এদের দ্বারা ক্ষতি মোটেই কম হয় না। যার যার বাড়ির কাছাকাছি তারা হাতে হাতে কাজটি করে ফেলতে পারে; কিন্তু বাস্তবে তা কখনও হয় না।

শ্যামলের পক্ষে পাঁচ-সাতজন বন্ধুকে জোগাড় করা খুবই সহজ ব্যাপার। এরা যেমন আগ্রহী ও এদের বাড়িতে তেমন কাজকর্ম না করলেও চলে, বকুনি খাবার ভয় নেই।

ওদের সাথে নিয়ে শ্যামল বেরিয়ে পড়লো রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়া গাছপালা খোড়ার কাজে। কাজটা যেমন ঝামেলার, ঝুঁকিও অনেক বেশী। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বিভিন্ন রাস্তাতে খোঁজ-খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতে ব্যবস্থা নিতে হবে। এলাকাটাও বড় কম নয়, আট-দশটি গ্রামতো বটেই। গাছে চড়ে ডাল কাটতে হবে, কাটা গাছ আর বাঁশঝাড়ই বেশী। বড় বড় অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের লতা-পাতায় গাছগুলো এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে, গাছে উঠাই দুষ্কর। লতার মধ্যে কিছু কিছু আবার বিষাক্ত, গায়ে লাগলে সারাদিন ধরে চুলকাবে, ফুলে উঠবে। আর বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ, বিষাক্ত পিঁপড়ে-মাঝালীতো আছেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাছ-পালার অভিভাবক এগুলো কাটতে দিতে চায় না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করলেও condition জুড়ে দেবে—ছোট খাট ডাল ছাড়া কাটা চলবে না,

তাও আবার গুছিয়ে রেখে যেতে হবে; গাছের নীচের মূল্যবান গাছপালা, শব্জী প্রভৃতি নষ্ট হলে তো রক্ষা নেই।

ফলে, বাধ্য হয়ে বিপজ্জনক ছোট ছোট ডালে চড়তে হয়, কোন কোন সময় অর্ধেকটা কাটবার পর পাতার ভারে বা হাওয়ায় ডালটা যখন মড়্‌মড় শব্দে ভেঙে পড়বে, তখন প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে অসতর্কতার কঠিন মূল্য দিতে হবে। এভাবে ডাল-পালা ঝোড়া শেষ হলে, রাস্তার মাঝের নীচু জায়গাতে যাতে জল জমে কাদা না হতে পারে সেজন্যে একদিকে কোদালো কেটে নর্দমা করে দেওয়া হবে।

অন্যান্য এলাকা থেকে এ এলাকার জনসাধারণের মাটি কাটার টেক্‌নিক কিছুটা আলাদা ধরণের। মাটি ভর্ত্তি ভারী ঝুড়িটা ধরে মাথায় তোলবার কাজে ঝুড়ির মধ্যদিয়ে ছু'টি লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে ধরবার ব্যবস্থা এদের মনঃপূত নয়। এরা এ কাজে ঐ ধরণের ঝুড়ির বদলে যে ঝুড়ি ব্যবহার করে তার নাম "চাক ডালা" ঝুড়ি। গোলাকৃতি ঝুড়িটা যতটা প্রসারিত, ততটা গভীর নয়। অনেকটা সূর্যমুখী ফুলের মত। প্রথম থেকে ঘন ও অত্যন্ত মজবুত করে বুনে এমন কায়দা করে "মুড়ি" ভাঙানো হয় যাতে ধরবার জন্যে আঙুল বাঁধানো যায়। এগুলো যেমন টিকবে বহুদিন, মাটির চাক প্রয়োজনানুযায়ী সাজানো যাবে প্রচুর, মুটের পক্ষে ভারসাম্য রাখতে কোন অসুবিধাই হবে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নরম কাদা হলে ঢালতে অসুবিধা হবে না, কামড়ে ধরার সম্ভাবনা খুবই কম।

ধরে মাথায় তোলবার অসুবিধা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে; কিন্তু এ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। "কোদালে" (যে মাটি কাটছে) ফুট খানেকের ব্যবধানে ছু'হাতে ঝুড়ির কানা ধরবে এবং ভারসাম্য যাতে ব্যাহত না হয় সেমত জায়গাতে একহাতে ধরবে মুটে (গোড়ার মুটে)। সমান্তরাল টানে বুক পর্যন্ত উঠে আসবে ভারী ঝুড়িটা, কোদালে ওখানেই বুকের ওপর ছু'হাতে ধরে রাখবে। মুহূর্তে মুটে অন্য হাতটা ব্যবহার করে ছু'হাতে ঝুড়িটা ধরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উঁচু করবে তার নিজের দিকটা এবং সংগে সংগে ঝুড়ির নীচে মাথা দিয়ে ঝুড়িটা তুলে নেবে। এর মাঝে একটুখানি শেখার আছে, সেটাকে বলা হয় "গুলি" ফেরানো। অর্থাৎ

আঙুল থেকে ঝুড়িটাকে তালুতে নিয়ে আসা। বর্ণনা করতে যতটা জটিল ও সময়সাপেক্ষ বলে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আদৌ তা নয়, মুহূর্তেই ঝুড়িটা মাথায় চড়বে।

এ অঞ্চলে কৃষক-শ্রমিক, শিক্ষক-ছাত্র প্রত্যেকেই এই সমস্ত কাজে পারদর্শী। খাল কাটতে, রাস্তায় মাটি কাটার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা অল্প বয়সেই এসব কাজে পাণ্ডিত্য অর্জন করে। এই পারিশ্রমিকের টাকায় কারুর দু'টি বই কেনার ব্যবস্থা হয়, কারুর জামা-কাপড় বা পূজার খরচ; আর কেউবা বিড়ি-সিগারেট টেনে শেষ করে দেয়।

যাহোক, শ্যামল ও তার বন্ধুরা তাদের যোগ্যতাকে ব্যবহার করলো সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্মে। যেখানে ঝুড়িতে বয়ে নেবার প্রয়োজন হলো, সেখানে বিড়ে মাথায় বেঁধে মাটির ঝুড়ি বয়ে নিল। দূরের গর্ত থেকে কেটে বোঝাই করা মাটির ঝুড়ি একের মাথা থেকে অন্যের মাথা ঘুরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পড়ে পড়ে প্রয়োজন মিটালো। আর যেখানে ঝুড়ির প্রয়োজন হলো না, সেখানে পাঁতি কোদাল হাতে নিপুণ শিল্পীরা মাটির চাক তৈরী করে হাতে তুলে দিল, পর পর অনেকের হাত ঘুরে প্রয়োজনীয় জায়-গাতে এসে জমা হলো।

প্রতিদিন অল্প অল্প করে কয়েকদিনেই তারা এ কাজগুলো সেরে ফেললো। এ ধরণের কাজে ছাত্রেরা বোধ হয় এই প্রথম অংশ নিলো। জনসাধারণের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ছেলেদের এই উন্নত মানসিকতায় সবাই ওদের স্নেহে কোলে টেনে নিলো।

জনসাধারণের আন্তরিক অভিনন্দন মনকে নাড়া দিল, ওরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত হলো। এরপর ওরা চিন্তা করলো হাটগাছার ফুয়োনের বিরাট সাঁকোটা নিয়ে। ফুয়োনে সাঁকো না থাকায় জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছে বর্ণনাতীত। পারাপারের জন্যে প্রতিদিন পয়সা দিতে হচ্ছে, ভীড়ের ঠেলায় বসে বসে সময় নষ্ট করতে হচ্ছে কাদা ভাঙতে হচ্ছে। বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ওঠা-নামা যেমন কষ্টকর, জল-কাদা লেগে ক্ষতিও হচ্ছে। তারপরও অতিরিক্ত বোঝাই-এর জন্যে হাবুডুবু তো লেগেই আছে। জিনিষপত্র নষ্ট হচ্ছে, আর আছে এসব নিয়ে নিয়মিত ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি।

এ কাজগুলো ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এর জন্যে প্রয়োজনীয় টাকাও সরকার দিয়ে থাকে; কিন্তু বারে বারে আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও চেয়ারম্যান মহোদয় কর্ণপাত করার প্রয়োজন মনে করেননি। কর্ণপাত না করায় তাঁদের উভয়দিকেই লাভ; এ লাভ ছাড়ার মত বোকারা ইউনিয়ন কাউন্সিলের নয় চোরের খবরদারী করতে যান না। সাঁকো না বাঁধলে সরকারের দেয় টাকার পুরোটা পকেটস্থ করার এমন কিছু ঝুঁকি নেই। তাছাড়া, ফুয়োনে পারাপার করে যে সমস্ত লোকগুলো (মাঝি) ওদের সাথে মাস-কাবারী চুক্তি।

শ্যামলরা চিন্তা করলো, কোন রকমে সাঁকোটা যদি বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে জনসাধারণের প্রচুর উপকার হবে, লোকজনের ওঠানামায় রাস্তা ভেঙে যে ভাবে ফুয়োন বেড়ে যাচ্ছে, ওটা বন্ধ হবে; আর এ কাজের মাধ্যমে জনসাধারণের মনের কোণে জায়গা করে নিতে পারলে ভবিষ্যতে তাদের ওপর জনগণের আস্থাকে অন্যকোন মহৎ কাজে প্রয়োজনে লাগতে পারে।

ওরা কয়েকজন মিলে হিসেব কষতে বসে গেল। যদি দেড় হাত অন্তরও বাঁশ পোতা হয়, তাহলে প্রতি দেড় হাতে একজোড়া করে, "পাড়ানের" বাঁশ তিনটের কম হলে চলে না, ধরার জন্যে তল্লাবাঁশ হলেই সুবিধা। "পয়ানের" পাঁচ-সাত হাত বাদ রেখেও দু'শো বাঁশের কম হলে চলবে না। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে আড়াইশো বাঁশ জোগাড় করার। যদি দু'-চারটে বেশী থেকে যায়, তাহলে অন্যান্য কতকগুলো ছোট সাঁকোতে সারাবার কাজে লেগে যাবে। পেরেক আর কাতা মোট চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার কম হলে কোন রকমে চলবে না। এত কিছু করা কি সম্ভব হবে!

বাঁশ collection একদিনের জায়গায় তিনদিন ঘুরে ঘুরে ব্যবস্থা করা যাবে। লোকজনের ব্যাপারটাও আসল নয়। পঞ্চাশ ষাটজনে দু'দিনে শেষ করা যেত, সেখানে না হয় — ত্রিশ-চল্লিশজনে চারদিনে শেষ করা হবে; কিন্তু নগদ এতগুলো টাকা, এটা কোথায় পাওয়া যাবে!

লজ্জা-শরম ত্যাগ করে বিষ্ণুদার কাছে প্রস্তাব দেওয়া হলো। কারণ ধর্মঘটের সময় ওরা বুঝে গেছে বিষ্ণুদার কাছে টাকা থাকে। বিষ্ণুদা বোধ হয় দু'-তিনশ' টাকা খরচ করে ওদের মনের মধ্যে যে জায়গাটুকু

করে নিয়েছে, পঞ্চাশ টাকার জন্যে তা নষ্ট করতে রাজী ছিল না, বললো, ভাল কাজে আমার কোন আপত্তি নেই, আমার কাছে না থাকলেও আমি জোগাড় করে দেব।

শ্যামল বারে বারে স্মরণ করে দিলো, সাঁকো বাঁধা হয়ে গেলে নওয়াপাড়ার হাটবারে হাটুরেদের কাছ হতে কিছু কিছু collection করে টাকাগুলো ফেরত দেওয়া হবে; আপাততঃ এটা ধার হিসাবেই নেওয়া হচ্ছে, সাহায্য নয়। বিষ্ণুদা বললো, ঠিক আছে, যদি collection হয় তাহলে দিয়ে দিও।

ছাত্র আন্দোলন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়া ছাত্র সংগঠনের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ, রাজনীতিতে অসচেতনতা ও যোগাযোগশূন্যতা সত্ত্বেও, বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজ কর্মের মাধ্যমে নিজেদের ঐক্যকে টিকিয়ে রাখার ও জোরদার করার এবং বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চালিয়ে যেতে লাগলো।

তখন অন্যদিকে তথাকথিত নেতারা (মোড়লেরা) তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনে. ওদের ঐক্যকে জঘন্য উপায়ে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তল্পীবাহক কতকগুলো ছেলেকে বিভিন্ন প্রলোভনের রঙিন টোপ দিয়ে ঐ সমস্ত কল্যাণমূলক কাজে বিভিন্ন অজুহাতে বাধা সৃষ্টি করতে প্ররোচিত করতে থাকলো। এবং বিকৃত উপায়ে এই সব গুণ্ডাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে লাগলো।

পরিকল্পনা তৈরী হলো, টাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে মূল সমস্যা হলো ছেলেদের সংগঠিত করা। প্রত্যেকের আন্তরিক ইচ্ছা আছে নিঃসন্দেহ; কিন্তু মুশ্‌কিল হলো ওদের পরিচালনা করা, একত্রিত করা।

হিসাব করে উদ্যোগী দেখে প্রত্যেক গ্রামের কমপক্ষে দু'জন ছেলের নামের তালিকা তৈরী করা হলো—ওরা নিজ নিজ গ্রামের ছেলেদের একত্রিত করবে, ডেকে সংগে নিয়ে আসবে। পঞ্চাশ-ষাটজন প্রতিদিন কাজে অংশ নিতে পারলে দু'দিনেই শেষ করা সম্ভব হবে; কোন কারণে শেষ করা সম্ভব না হলেও পরবর্তী দিন এত ছেলের হাজিরার প্রয়োজন হবে না।

প্রত্যেক গ্রামের বাঁশের অবস্থা বিবেচনা করে, কোন গ্রামে কতগুলো বাঁশ অবশ্যই জোগাড় করতে হবে তার হিসাব করা হলো। ফুয়োনের

পাশের গ্রাম হাটগাছাতে কোন বাঁশ না কাটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। কারণ ওখানে একেতো বাঁশের ঝাড় সংখ্যা কম, তাছাড়া ঐ গ্রামেই সমস্ত ছেলেদের তুপুর বেলায় খাবারের বন্দোবস্ত করার plan মাথায় রেখে বাঁশ দেবার হাত থেকে রেহাই দেওয়া স্থির হলো।

শ্যামল প্রত্যেকটা গ্রামে ঘুরে বন্ধু-বান্ধবকে অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে অবশ্যই যোগদানের জন্যে অনুরোধ করেছে। প্রত্যেকেই কথা দিয়েছে তারা যোগদান করবে। কিন্তু তবুও প্রত্যেকের বাড়িতে যে কাজের চাপ তা লক্ষ্য করে শ্যামলের আশংকা ছিল প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছেলে হয়তো আসতে পারবে না। কারণ পরীক্ষার পর এই অবসর সময়ে অভিভাবকেরা প্রায় প্রত্যেক ছেলেকেই বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব একেবারেই তাদের ওপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন, যেগুলো ফেলে রেখে আসা শক্ত ব্যাপার।

কিন্তু আশংকা মিথ্যা প্রমাণ করে পরিশ্রমই সার্থক হলো। ধারণার বেশী ছেলে এসে হাজির হলো, কুলটিয়া গ্রামের তে'মাথায় মিলিত হবার পর তুই দলে ভাগ হয়ে একটা অংশ গেল আলিপুর, পোড়াডাঙা, মহিষ-দিয়াতে এবং অপর অংশ গেল নেহালপুর, লখাইডাঙার দিকে। ওদিকের কাজ সেরে কুলটিয়া, সুজাতপুর প্রভৃতি গ্রামে এক সংগে বাঁশ কাটার কাজে লেগে যাওয়া যাবে।

শ্যামল নেহালপুরের অংশের নেতৃত্ব করছিল। গ্রামের একধার থেকে বাঁশ কাটতে কাটতে অন্যদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাঁশ দেবার মত ঝাড় যাদের আছে প্রায়ই না বলছে না; কিন্তু মাঝে মাঝে ঝামেলা হচ্ছে অনেকেই বিভিন্ন 'বারে' ঝাড় থেকে বাঁশ কাটে না সেটা নিয়ে। অনেকে রবি আর বৃহস্পতিবারে ঝাড়ে কোপ দেয় না, কেউ বা শনি-মঙ্গলবার। কেউ কেউ যে দিনটাতে ঝাড় লাগিয়েছে সেই বারে বাঁশ দেবার অক্ষমতা জানাচ্ছে। শ্যামলরা এসব কুসংস্কারের খবর পুরোপুরিই জানতো। তাই, বেছে বেছে দিনটি স্থির করেছিল— যে দিন আপত্তি কম হবে। যারা বাঁশ দিতে পারলো না তাদের অনেকেই সোৎসাহে কথা দিল আগামী দিন বাঁশ ফুয়োনে পৌঁছে দেবে। নেহালপুরের মাথা থেকে ফুয়োন আড়াই-তিন মাইলের কম নয়, জনসাধারণের এ ধরণের আগ্রহে ওরা ক্লান্তি ভুলে যাচ্ছিল। এবং

মাঝে মাঝে এতবেশী উৎসাহিত হচ্ছিল যে, ওরা যেন বাঁশের মাথা ধরে টেনে ঝাড় থেকে বাঁশ বের করে আনবে!

বাঁশ ঝাড়গুলোর নীচে অন্য কোন আগাছা গজিয়ে জঙ্গল না হলেও বড় নোংরা। গ্রামের মানুষের পায়খানা করার নিরিবিলি জায়গা এই বাঁশ-বাগান। পায়খানার পাকা ইটের বেড়া নয়; ঘন বাঁশ, নুইয়ে পড়া বাঁশ, কোন মোটা গাছ বা ঝোপ-জংগল গ্রামের মানুষকে লোক চক্ষুর আড়াল করে লজ্জা বাঁচায়। যেমন বন্ধ দরজা বা সামনে জলভর্তি বালতি দেখে পায়খানায় কারুর উপস্থিতি অনুমান করা হয়। এখানে ঝোপের আড়ালে চুপটি করে বসে থাকা লোকটিকে (মহিলাকেও) দেখতে না পেয়ে অন্য কেউ এগিয়ে আসলে গলার কাশির শব্দে ভুল বুঝতে পেরে পিছিয়ে যায়। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে কষ্ট হলে, অন্যত্র আশেপাশে জায়গা করে নিতে অসুবিধা হয় না। কাউকে মাঝ পথে সুখের কাজ আপাততঃ বন্ধ রেখে অন্যকে সুযোগ দেবার মত কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় না। কখনও দু'জনের দৃষ্টির আড়ালে এগিয়ে এসে একেবারে মুখোমুখি হলে চোখ বন্ধ করে লজ্জা নিবারণ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

গ্রামের লোকের এব্যাপারে আরও কিছু কিছু সুবিধা আছে। প্রাকৃতিক প্রয়োজনকে জোর করে বাগ মানাবার অসাধ্য সাধনে গ্রামের মানুষকে ব্রতী হবার প্রয়োজন হয় না, যেমন শহরের লোকের সচরাচর করতে হচ্ছে। এখানে অফুরন্ত পাবলিক প্রস্রাবখানা, পায়খানা; আর গ্রামের লোকের অতি অল্পই তো ঘরের পাত্র বা জল নিয়ে অতদূর যাবার কসরৎ করে। তবে হ্যা, তার মানে এই নয় যে তারা দার্জিলিং বা এই জাতীয় শীত প্রধান দেশের মানুষের ন্যায় উপায়াদি (যেখানে পাবলিক সেকটরে জলের বদলে খবরের কাগজ সাইজ করে কেটে ঝুলানো থাকে) অবলম্বন করে। এখানে ভ্যাপসা গন্ধ আর গরমে কষ্ট পাবার কোন আশংকা নেই; কিন্তু সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে পায়ের নীচের ঘাসের বা শুকনো পাতার ওপর; নতুবা জোঁক চিমটি কাটতে কার্পণ্য করবে না। তবে এটা গ্রামের লোকের আৎকে ওঠার মত কোন ঘটনা এটা নয়।

কিন্তু বাঁশ কাটতে এসে শ্যামলরা অসুবিধায় পড়েছে। কথায় বলে

হাতি যেমন খায়, তেমনি ন্যাদায়। গ্রামের লোক কঠোর পরিশ্রমান্তে খায় প্রচুর যার প্রায় সবটাই ভাত। ফলে, পরিপাকান্তে অসারের ভাগটাও বেশী পড়ে থাকে। পরিত্যক্ত পায়খানার উপর ফোটা ফোটা জল পড়ে এবং শালিক আর গাঙশালিকের চক্ষুর স্পর্শে দেখতে এক অপরূপ রূপ ধারণ করে। কঞ্চিতে জড়ানো বাঁশ বের করতে গিয়ে "হেই লচ্চা ; হেইও" টানে বে-খেয়াল হয়ে বাঁশ টেনে ধরে পিছোতে গিয়ে ঐ সব অপরূপ পদার্থের উপর পা পড়ে বারে বারে পায়ের পাতাটা ডুব দিয়ে যাকে বলে অবগাহন করে উঠছে ; তখন গা-টা একটু ঘ্যান ঘ্যান না করে পারছে না। রসিকতা করে অনেকেই বলছে "পরের কাজে কামার ব্যস্ত"—এভাবে যদি বাপের কাজ করতাম, তাহলে বাড়িতে এতদিনে দালান উঠতো।

যাহোক, তবুও ছেলেদের উৎসাহে মোটেই ভাটা পড়েনি ; কিন্তু বিপত্তি বাধালো নতুন উপসর্গ! গৃহস্থদের কাছে ওরা জানতে পারলো কিছু সংখ্যক ছেলে একটু আগেই ওদের বুঝিয়ে গেল তারা যেন বাঁশ না দেয়। কারণ, বাঁশ দিয়ে কি হবে? এ সমস্ত ছেলেদের দ্বারা কখনও অত বড় সাঁকো তৈরী সম্ভব! শুধু শুধু বাঁশটাই নষ্ট। ঐ সমস্ত অসৎ ছেলেরা অর্ধেক বাঁশই চুরি করে বেচবে। তাছাড়াও ওদের উদ্দেশ্য হলো, চেয়ারম্যানকে বোকা বানানো। এসব কাজ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এদের বিরুদ্ধে কাজ। ফলে, চেয়ারম্যানরা ওদের ছাড়বে না, আর যারা বাঁশ দিয়ে ওদের সহযোগিতা করছে, তাদের আখেরে ভাল হবে না।

এই সমস্ত মিথ্যা অজুহাত ; আর কখনও কখনও প্রয়োজনে ভয় দেখিয়ে ওরা চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বাঁশ জোগাড় করা সম্ভব না হয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হলো বলে মনে হয় না। তবে, ছেলেদের কুড়াল ঘাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গৃহস্বামীকে বোঝাতে কিছুটা সময় নষ্ট হচ্ছে এই যা। তাতে খানিকটা "আছাড়ে গঙ্গা স্নান" ও হচ্ছে। শ্যামলরা ওদের বিরুদ্ধে প্রচারের একটা সুযোগ পাচ্ছে এবং জনসাধারণ ওদের নোংরা চরিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বাস্তব দিয়ে অর্জন করছে। এভাবেই মিথ্যাবাদীরা একটা মিথ্যাকে ঢাকতে দশটা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং অবশেষে নিজেদের ফাঁদে নিজেরা জড়িয়ে পড়ে।

কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, বাঁশ collection-এর লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম করতে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছেনা, তবে গ্রামের গণ্যমান্য অবস্থাপন্ন লোকের বিরাট বিরাট ঝাড় থেকে পাড়ানের ও পঁয়ানের জন্যে যে বড় বড় ভাল বাঁশ আশা করা হয়েছিল তাতো হলোই না বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাঁশ দিতে সরাসরি অস্বীকার করলো। বললো, পাঁচ-দশ পয়সা দিয়েই আমরা পারাপার করবো; কিন্তু বাঁশ দেব না।

অন্যদিকে সামর্থ্যশূন্য গরীবেরা মহৎ প্রাণের পরিচয় দিল। যেখানে ছেলেরা বুঝতে পারছে ঝাড় থেকে বাঁশ কাটা অসম্ভব, সে ক্ষেত্রেও ওরা দেখে শুনে, যার থেকে কোঁড়া বেরোবার সম্ভাবনা নেই এমন বাঁশ নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে কেটে নিতে বললে। বা কোন কোন সময় হাত চালিয়ে কাজটা করেও দিল।

কিছু কিছু অবস্থাপন্ন লোক ঝাড়ের এমন সব বাঁশ নির্দ্দিষ্ট করে দিল যেগুলো কেটে বের করা প্রায় অসম্ভব, ছেলেরা বুঝতে পারলো তাদের মনোভাব; কিন্তু তবুও যা দিল কষ্ট করে তাই বের করে নিয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত গরীবেরা আলাদা, এরা সহযোগিতা করতে কখনই কার্পণ্য করছে না।

সার্বজনীন প্রয়োজনে ছোট হোক, সে বাঁশের মূল্য যত কম হোক অথবা এ কাজে সে বাঁশ মূল্যহীন হলেও তারা দান করে গর্ববোধ করলো। কেউ কেউ আফসোস করে বললো, "আগে আমি প্রত্যেকটা কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতাম; কিন্তু আজ আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে বলে তোমরা আমাদের কাছে আসো না, আমাদের কাছে একটা বাঁশ নিতেও আসো না। আমাদের পাঁচ পয়সা দান করবার ক্ষমতা আছে, দান করে আমরা আনন্দ পাই; কিন্তু পাঁচ পয়সা মূল্যহীন বলে পাঁচ পয়সা নিতে তোমরা আমাদের বাড়িতে আসো না; এতে আমরা আরও বেশী দুঃখ পাই।

এ সমস্ত মানুষের মনের খবর পেয়ে ছেলেরা ওদের আর এড়িয়ে যাবার সাহস পায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগানো অসম্ভব দেখেও সে বাঁশ উৎসাহের সংগে নিয়ে নিলো, ওদের মনে আঘাত দিতে চায়নি। বাঁশের জন্যে নয়, ওদের উন্নত মানসিকতার জন্যে বারে বারে অভিনন্দন

জানালো, মানুষের মানসিকতা ও ব্যবহার সম্পর্কে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলো।

এর মধ্যে অন্যদিকে যে দলটি গিয়েছিল, তারা সদলবলে এসে হাজির হলো। সবার চোখমুখ লাল, উত্তেজনায় ওরা একেবারে অস্থির। কাছাকাছি এসে সমস্বরে চিৎকার করে বললো, চল্, বাঁশ কাটা রাখ, আগে মারলো ক্যান তার ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর অন্য কাজ; চল সবাই মিলে।

শ্যামল সবাইকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু কেউ তার কথা শুনতে রাজী নয়। শ্যামলের দলটাও সাথে সাথে কুড়াল উঁচু করে দাঁড়ালো—আগে মারের পাল্টা মার দিতে হবে তারপর অন্য কাজ। শ্যামল ওদের সব কথা শুনে বললো, মাতালেরা নিজেদের যত বেপরোয়াই মনে করুক না কেন, নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়লে প্রকৃতপক্ষে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। একটা বাচ্চা ছেলেও ঠাণ্ডা মাথায় চেষ্টা করলে ওদের ঘায়েল করতে পারে। তাই, আমাদের মাতালের মত চিন্তা করা ঠিক হবে না। সুযোগ মত এবং সঠিক পথে আমাদের জবাব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে এই সমস্ত জায়গাগুলোতেই ওদের সাথে আমাদের পার্থক্য, আমরা এই প্রভেদটুকু মিলিয়ে দিতে পারিনে। তবুও শোনে না, শ্যামল উত্তেজিত হয়ে বললো, এত বাহাদুরী এখানে কেন? ওখানেই কেন দু'-চারটেকে কুড়াল মেরে ঘায়েল করতে পারোনি, তাহলে বোঝা যেত! এখন এখান থেকে দল বেঁধে যাবার অর্থই হলো মারামারি করতে যাওয়া, আর ঐ সময়ের অবস্থা ছিল আত্মরক্ষা। ওরা তো এই চায় যে, আমরা মারামারিতে জড়িয়ে পড়ি, আসল কাজ শিকেয় উঠুক; আমরা ওদের ফাঁদে পা দিতে পারিনে, ধৈর্য ধর্, সুযোগমত জবাব দিতে হবে। তাতেও হয় না, হাম্পি-দাম্পি চলতে থাকলো। শ্যামল অগত্যা বললো যেতে পারিস্; কিন্তু আমার দ্বারা একাজ সম্ভব নয়, আমার মতও নেই।

শ্যামল মারামারিতে তেমন সাহায্য করতে পারবে না, তার কোন প্রয়োজনও নেই। ওদের মধ্যে দু'-পাঁচজন আছে যারা এক একজনেই পাঁচ-সাতজন যুবকের মহড়া দিতে পারে; কিন্তু ওরা যেন শ্যামল না থাকলে বা ওর মত না থাকলে মাঝি বিহীন নৌকার মত। শ্যামল যাবে না তাই

সবাই থেমে গেল। এক সংগে মিলে কাজে লেগে গেল।

সম্মিলিত দলটির একটা অংশ বাঁশ কেটে বের করে "খোড়োয়ে" (ছেটে) দিল, অন্যেরা ঘাড়ে করে বয়ে ফুয়োনের দিকে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। দুপুরে যে যার বিভিন্ন আত্মীয় বা বন্ধুদের বাড়িতে সুযোগ মত খেয়ে নিল। কিন্তু হিসাব করে পরিস্কার বোঝা গেল সমস্ত গ্রামগুলোতে বাঁশ কেটে শেষ করা সম্ভব হবে না। , তাই শ্যামল বন্ধুদের একটা অংশকে সংগে নিয়ে এগিয়ে গেল, যেকোন রকমে বাঁশের গোড়া কেটে রাখতেই হবে, তাহলে আগামীদিনে বাকীটুকু সেরে নেওয়া সম্ভব হবে।

পরবর্তীদিন উপস্থিতির হার অনেকটা কমে গেল। কাজও অনেকটা কম, অসুবিধা হলো না। প্রয়োজনীয় বাঁশ সংগ্রহ করে বয়ে নিয়ে ফুয়োনের পাশে জমা করলো।

সন্ধ্যের পর শ্যামলরা কয়েকজন হাটগাছা গ্রামে ঢুকলো। প্রথমেই তারা ভাইস-চেয়ারম্যানের সংগে দেখা করে বললো, বাঁশ কাটা আমরা শেষ করেছি, আগামীদিন সাঁকো বাঁধার কাজ হবে। ছেলেদের অনেকের বাড়ি অনেকটা দুরের গ্রামে, তাই, তাদের পক্ষে বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে। সেজন্যে আপনি, আপনাদের গ্রামে ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করুন।

ঃ কতগুলো ছেলে হবে ?

ঃ তা পঞ্চাশজন হিসাব করেই করতে হবে। হয়তো কিছু কম হতে পারে, বেশী হবার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া আরেকটা কথা পাঁচ-সাতটি "ডোঙার" (নৌকা) ব্যবস্থা করতে হবে, নতুবা কাজ করা যাবে না।

ঃ ও বাবা ! অতজনের খাবার ব্যবস্থা কি করে হবে? অসম্ভব ! আমার পরে বরং পাঁচ-সাতজনের ভার দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি। তোমরা অন্যান্য গ্রামেও ভাগাভাগি করে দাও।

ঃ গ্রামে একশ' ঘরেরও বেশী লোক বাস করে। সেখানে পঞ্চাশ-জনের খাবার ব্যবস্থা করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, আপনি একটু চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারেন। একটু সময় নষ্ট করে করুন না ?

ঃ আসলে ব্যাপারটা হলো আমার সময় নেই ; নতুবা পঞ্চাশ কেন

ও রকম দু'শো জনের ব্যবস্থা করতে আমার বাধে না।

: চল্ শ্যামল চল্; মুরোদ বোঝা গেল, করার কোন ক্ষমতা নেই, বাহাদুরীর বেলায় সাড়ে ষোল আনা।

চেয়ারম্যানবাবুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো, বললেন, আমি শ্যামলের সংগে কথা বলছি, তুমি বাজে কথা বলবে না।

: হ্যাঁ ঠিকই, আমার সাথে আপনার কথা হচ্ছে, ওদের এভাবে এখানে কথা বলা ঠিক নয়; আর আপনারও ঐ সব কথায় কান না দেওয়াই উচিৎ; কিন্তু দেখুন, আপনি ইউনিয়নের ভাইস-চেয়ারম্যান, কাজটা আপনাদেরই করার কথা, কিন্তু বহুকালতো হয়ে গেল। যাহোক, হয়তো fund-এ টাকা-কড়ি নেই; কিন্তু সাঁকোটা আপনার বাড়ির পাশেই, গ্রামের একজন সচেতন লোক হিসাবে আপনার দায়িত্ব আমাদের থেকে বেশী; সে কথা চিন্তা করে আমাদের সাথে এটুকু সহযোগিতা আপনার করা উচিৎ বলে আমি মনে করি, এরজন্যে আপনার মূল্যবান সময় একটু নষ্ট করুন না?

: ঠিক আছে, সব দিক দিয়ে আমার দায়িত্ব যখন বেশী, আমরাই বেঁধে দেব। তোমাদের তো আমরা ডেকে আনিনি যে, সাঁকো বেঁধে দাও!

: ওসব বাজে তর্ক করে লাভ নেই। তাহলে স্পষ্ট করে বলুন এটা করার কোন ইচ্ছা বা ক্ষমতা আপনার আছে, না নেই?

চেয়ারম্যানবাবু পড়লেন উভয় সংকটে, কি বলবেন! ক্ষমতা নেই একথা বলা একেবারেই অসম্ভব। আর ইচ্ছা নেই বললে ওরা প্রচার করে বেড়াবে। চিন্তা করে জানালেন,—তোমরা যা মনে করো তাই।

: বেশ তাহলে আমরাই ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। এটুকু যদি আপনার গ্রামের লোকে না করে তাহলে আপনার বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরেই আমরা ইটের উনুন তৈরী করবো, চাল-ডাল এনে এখানেই রেঁধে খাবো। এখন আপনার বাড়িতে আপনি information দিয়ে রাখবেন পাঁচ-সাতজন খাবে; কাল দুপুর বেলায়।

: দেখ শ্যামল, বাড়িতে জন-কিষেণের খুব ঝামেলা, কাজ করার লোকের অভাব, আমার ওপর চাপ দিয়ো না।

: যা বলবেন স্পষ্ট করে বলুন; আপনার ঐসব অসুবিধা আমাদের

কোন সুবিধা এনে দেবে না। ছেলেদের খাবার আপনি দেবেন, কি দেবেন না?

Public function আমিও তো করে থাকি, জনগণের জন্যে আমিও তো কম খাটি না। এই একটু আগে ফিরলাম, আবার ভোর রাতে বেরোতে হবে। আমার উপরে এ সব চাপ দিয়ো না।

ছেলেটা নিজেকে আর সংযত করে রাখতে পারলো না। বললো, **public function** যে আপনারা কতটা করেন তার নমুনা আমরা জানি। ইন্দিরার গরীবী হটানোর নামে গরীব হটানোর মতই। বাড়ীতে খাবার সুযোগে ছেলেরা ঘরে ঢুকলে সবই ফাঁস হয়ে যাবে—এইতো আপনার ভয়? গত Allot-এর গুঁড়ো দুধ আর সুন্দর সুন্দর বিদেশী কম্বলগুলো গেল কোথায়?

শ্যামল দেখলো এখানে কথা বলে কোন লাভ নেই। তাই বললো, ঝগড়া করে লাভ নেই, তাড়াতাড়ি চল্, আর দেরী হলে গ্রামের সবাই ঘুমিয়ে পড়বে।

গ্রামে মনোমত কতকগুলো বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনটা খুলে বললো, চার পাঁচ জন করে ভাগাভাগি করে কতকগুলো বাড়িতে রান্না হবে বলে স্থির হলো। কয়েকজন কথা দিলো তারা ডোঙা নিয়ে সময় মত পৌঁছে যাবে। বেশ কিছু কর্মঠ কৃষক, যাদের এ কাজের অভিজ্ঞতা আছে, তারা সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিলো; একজন কাঠের মিস্ত্রিকে জন হিসাবে ঠিক করা হলো, সে তার পুরণের জরুরী কাজ ফেলে আসবে।

আয়োজনের কোথাও কোন ত্রুটী ছিল না। কিন্তু ভোর বেলায় গিয়ে দেখে বাঁশের অবশিষ্টাংশ ইতস্ততঃ ছড়ানো, অধিকাংশ বাঁশ কে বা কারা অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছে।

বুঝতে কারুর বাকী রইলো না, না বোঝবার কথাও নয়! তবুও অনেকে চুরির ঘটনা বলেও মনে করছিল, কারণ এক একটা বাঁশের দাম তিন টাকার কম তো নয়ই, ফলে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এ ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত করে এদিক-ওদিক "ধাপের" নীচ থেকে ছেলেরা বাঁশ টেনে বের করা শুরু করলো; কিন্তু বেশ কিছু পরিমাণ বাঁশের হদিস্ তখনও পাওয়া গেল না। যে গুলো সম্ভবতঃ সব থেকে বড় বড়

বাঁশ সেগুলো পাওয়া গেল গ্রামের মধ্যে রাস্তার ধারের পুকুর ও কুয়োগুলোতে ভাল ভাল বাঁশের যেখানে সেখানে কুড়াল মেরে নষ্ট করা হয়েছে। তবুও শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাঁশ পাওয়া গেল কি-না তা নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ থেকে গেল, কিন্তু ঐ মুহূর্তে করার কি-ই বা ছিল!

রাতের অন্ধকারে এই অপকর্ম করে যারা জনসাধারণের কাছে নিজেদের গোপন রাখতে চেয়েছিল, তারা সম্ভবতঃ জানেনা জনগণ নিরক্ষর হলেও ওদের মত নির্বোধ নয়। জনসাধারণের জানতে বাকী রইলো না একাজ কারা করেছে এবং কাদের প্ররোচনায় ওরা একাজে লিপ্ত হয়েছে। এ ঘটনা অঞ্চলে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো।

শতাধিক ছাত্র-কৃষক কাজে লেগে গেল। অভিজ্ঞতার সংগে যুক্ত হলো প্রাণ চঞ্চল ছাত্রদের উৎসাহ-উদ্দিপনা; এতবড় জনশক্তির কাছে যে কোন কঠিন কাজও সহজসাধ্য। তর্‌তর্‌ করে কাজ এগিয়ে গেল।

একই সংগে কেউ বাঁশ কেটে প্রয়োজন মত সাইজ করছে, কেউ গোড়া সূঁচালো করছে, কেউ সুন্দর করে সমান করছে (পালিশ) পাড়ানের বাঁশ, পয়ানের বাঁশ আর "ধরা" তৈরীর তল্লাবাঁশগুলো, ঠিক একটা মেশিনের মত।

একটা বাঁশে একটার বেশী গোঁজা তৈরী সম্ভব নয়, তাহলে দুর্বল হয়ে যাবে। কেউ ডোঙ্গায় দাঁড়িয়ে, কেউ জলে সাঁতার কেটে, আর কেউ কেউ ডুব দিয়ে নরম কাদায় পা দু'টো পুতে দিয়ে এক সংগে ধরে আস্ত আস্ত বাঁশগুলো মাটির মধ্যে শক্ত করে পুতে দিচ্ছে; কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়। ডোঙায় দাঁড়িয়ে সাঁতরে অথবা ডুবিয়ে, কোথাও শরীরের পুরো শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই উঠিয়ে-নামিয়ে-উঠিয়ে-নামিয়ে ধীরে ধীরে বাঁশগুলো নরম কাদা পেরিয়ে শক্ত মাটিতে ঢুকিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হচ্ছে—ঠিক যেভাবে ষ্টিমইঞ্জিনের পিষ্টনটি ওঠা-নামা করে।

প্রত্যেক জোড়া গোঁজাকে (বাঁশকে) দুই বিপরীত দিকে একটু কাত করে পোতা হলো, যাতে ওরা একটা গুণ চিহ্নের আকার ধারণ করে। গোঁজা-দু'টি পরস্পর যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে সেখানে সুবিধা এবং প্রয়োজনানুযায়ী পেরেক অথবা কাতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো। বাঁশ দু'টির পরস্পর মিলিত বিন্দুকে মাঝে মাঝে ঠেলে উঁচু অথবা নীচু

করে বাঁধা হলো, যাতে ওর উপর দিয়ে পাড়ানের বাঁশ ফেলে দিলে তা মাটির (জলের) সংগে সমান্তরাল থাকে। পয়ানটা বেশ বড় করেই রাখা হলো, যাতে বড় বড় নৌকাগুলো ওর নীচ দিয়ে যাতায়াতে কোন অসুবিধা না হয়। গোঁজাগুলো দুই বিপরীত দিকে পরস্পর ঠেস দিয়ে থাকায় প্রকল্পটি হবে অত্যন্ত মজবুত।

সূর্য ডুবতে তখনও বেশ বাকী কঠিন পরিশ্রম করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সাঁকো তৈরী শেষ হলো। আর এর সাথে সাথে জনসাধারণের দীর্ঘদিনের কষ্টের আপাত অবসান ঘটলো।

পরের দিনই শনিবার, নওয়াপাড়ার হাটবার। অগণিত হাটুরে যাতায়াত করবে সাঁকোর উপর দিয়ে। তাই ঠিক হলো, ওদের কাছ থেকে পয়সা collection করা হবে, পাঁচ পয়সা দশ পয়সা যে যেমন দেবে। সংগৃহীত অর্থ দিয়ে পেরেক, কাতা আর মিস্ত্রির জন খরচ মেটানো হবে; অবশিষ্ট যদি কিছু থাকে নব নির্মিত কলেজের উন্নতিকল্পে দান করা হবে। সবাই ভোর-বেলায় হাজির থাকবে।

অলকবাবু অনেক চেষ্টা করেছেন একটা সুযোগ্য ছাত্র সংগঠন হিসাবে ছাত্র লীগকে গড়ে তুলতে। শ্যামলদেরও অনেক বুঝিয়েছেন যে, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এখন আর নেই; তাই তোমরা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে না গিয়ে ছাত্র লীগে যোগদান করো, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যাবে। কিন্তু ওরা তাতে রাজী হয়নি।

নীতিগত প্রশ্নে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) রাজনৈতিক সংগঠন NAP (মোজাফ্ফর) এবং বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টী (মনি সিং) নামক সংশোধনবাদী-দের সমর্থন করে। সেজন্যে ওদের পিছনে লাইন দিতে শ্যামলদের ঘোর আপত্তি। যদিও তারা কারণ ব্যাখ্যা করে অথবা যুক্তিতর্ক দিয়ে হয়তো সংশোধনবাদীদের সম্পূর্ণ অমার্কস্‌বাদী প্রমাণিত করার সামর্থ্য রাখেনা কিন্তু তারা বিনয়বাবুর কাছে শিখেছে সংশোধনবাদী ক্রুশ্চভচক্র কিভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইনটিকে এক তরফাভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ উত্তরণে পর্যবসিত করে ১৯৫৭ সালের ঘোষণা ও ১৯৬০ সালের বিবৃতিকে বরবাদ করে বৈপ্লবিক নীতি সমূহকে লংঘন করে ও সর্বহারার বিশ্ব বিপ্লবের

ঐতিহাসিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মার্কসবাদ-লেলিনবাদের বৈপ্লবিক শিক্ষা-গুলোকেই বিসর্জন দেয়।

বিনয়বাবুর কাছেই তারা শিখেছে মার্কসবাদের অতন্দ্র প্রহরী কমরেড স্তালিনকে তারা-১৯৫৬ সালের বিশতম কংগ্রেসে এভাবে উল্লেখ করে যে—"স্তালিনের ছিল অত্যাচারের এক বিকৃত মানসিকতা, তিনি চালাতেন নৃশংস যথেচ্ছাচার, বেছে নিয়েছিলেন গণ নির্যাতন ও অত্যাচারের পথ, দেশ ও কৃষিকে জানতেন শুধুমাত্র ফিলমের মাধ্যমে, যুদ্ধ পরিকল্পনা করতেন গ্লোব সামনে রেখে, স্তালিনের নেতৃত্ব ছিল সোভিয়েত সমাজের বিকাশের পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক ইত্যাদি···। যে স্তালিন বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজ-তান্ত্রিক রূপান্তর ও গঠন কার্যে সোভিয়েত জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আভ্যন্তরিণ ও বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করেছিলেন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই-এ বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।—এমনকি এই ক্রুশ্চভ চক্র স্তালিনের মরদেহ কবর থেকে টেনে তুলে অন্যত্র সরিয়েছিলেন।

এই কংগ্রেসেই তারা তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, "নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরি-স্থিতিতে অক্টোবর বিপ্লবের পথই ছিল একমাত্র সঠিক পথ, কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগে সংগে "সংসদীয় পথ" পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হয়ে উঠেছে।"—মর্মবস্তুর বিচারে সেটা ভুল, রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেলিনবাদী তত্ত্বের বিরোধী ও অক্টোবর বিপ্লবের পথের বিশ্বজনীন তাৎপর্যের সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি।

তার রিপোর্টে দুনিয়ার পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তনের এই অজুহাতে ক্রুশ্চভ সাম্রাজ্যবাদ এবং যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে লেলিনের শিক্ষাগুলোর এখনও যথার্থতা আছে কি-না তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং কার্যতঃ লেলিনের শিক্ষাগুলোকে বিকৃত করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, সংশোধনবাদী নেতৃত্ব চেকোশ্লাভিয়া দখল করে, পোলিশ কম্-রেডদের দমন করার জন্যে সৈন্য প্রেরণ করে ও মনোমত দালাল সরকার বসিয়ে কার্যতঃ পোল্যাণ্ড দখল করে, সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরীকে প্রতি বিপ্লবের হাতে তুলে দিতে সহযোগিতা করে—এ সমস্ত ঘটনার মাধ্যমে সংশোধনবাদ, সাম্রাজ্য-বাদের ভূমিকা নেয়, লেনিন-স্তালিনের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত আত্মপ্রকাশ

করে পৃথিবীর জনগণের পয়লা নম্বর শত্রু সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ হিসাবে।

আর বাংলাদেশ সৃষ্টির ঘটনা শ্যামলরা চোখেই দেখলো। স্পষ্ট দেখতে পেল সোভিয়েতের ভূমিকা। এবং দেশের পরবর্তী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থায় টিকে থাকতে তাদের কি কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখিই না হতে হচ্ছে!

আওয়ামী লীগ কর্মকর্তারা প্রতিযোগিতা শুরু করেছে হিটলার-মুসোলিনীর সংগে। আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল দেশে থাকবে না, অথবা আওয়ামী লীগ থাকবে না তাদের এ চ্যালেঞ্জ স্পষ্ট। অন্যদিকে অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম আঙুল ফুলে কলা গাছ। মশিয়াহাটীতে যে চালের দাম ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে দশ আনা প্রতিসের, ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি আজ তা চার টাকা প্রতি সের, একখানা আট পৌরে শাড়ী, যা গ্রামের অধিকাংশ মেয়েদের একমাত্র পরিধেয়, ঐ সময়ে ছিল ছ'টাকা থেকে সাত টাকা ; আর আজ তা ষাট থেকে সত্তর টাকা, লবণের মূল্য তো ৭৫ টাকা প্রতি সের ছুঁয়ে একটু একটু করে নামতে থাকে ; কিন্তু কেউ ভাবেনি সওয়া একসের চার আনার জায়গায় প্রতিসের দু'টাকায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়াবে। এক দিস্তা কাগজ বারো আনা থেকে কমিয়ে আনতে গিয়ে তিন টাকা হয়ে গেল, একটা wood pencil দু'আনা থেকে দু' টাকা। ভারত-সোভিয়েতের অকুণ্ঠ দয়ায় পাওয়া স্বাধীনতায় শ্যামলরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

এত সবের পর রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বের চামচাগিরি, এতো শ্যামলরা কল্পনাও করতে পারে না ; কিন্তু ওদের জন্যে রাশিয়া আরও অনেক কিছু নিয়ে অপেক্ষা করে ছিল ভিয়েতনামের মাধ্যমে কাম্পুচিয়া গ্রাস,... কিউবার মাধ্যমে এঙ্গোলা, আর পর্দা-পরচুলা নিয়ে কাজে ব্যাঘাত হওয়ায় ওগুলো খুলে ফেলেই আজ আফগানিস্তানে।

বিনয়বাবু আজ থাকলে তারা আরও অনেক কিছুই শিখতে পারতো। মার্কস-লেনিন-স্তালিন নামধারী ক্রুশ্চভপন্থীরা যে প্রকৃত পক্ষে মার্কসবাদের শত্রু একথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করার যোগ্যতা অর্জন করতো। যাহোক, শ্যামলরা নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্যে নিজেদের ত্রুটী স্বীকার করে ; কিন্তু তাই বলে মনে করে না বুলি কপচানো সংশোধনবাদীরা আসল মার্কসবাদী। তাই ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) বা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাথে একাত্মতা করে নেবার প্রশ্নই আসে না।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাথে একাত্মতা করে নেবার প্রশ্নই আসে না।

অন্যদিকে (সাম্প্রদায়িক সংগঠন) মুসলীম ছাত্র লীগ ও মুসলীম আওয়ামী লীগ নাম সংক্ষেপ করে হয়েছে ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগ। সে একমাত্র পাকিস্তানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক অস্পৃশ্য সংখ্যালঘুদের ভোটগুলো নিয়ে এক-চেটিয়া কারবার করার জন্যেই, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এদের বিক্ষোভকে কাজে লাগাতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক সংগঠন ? —না, তা মোটেই নয়। ব্যক্তিগত নোংরা চরিত্রের অধিকারী, আওয়ামী লীগের জনক সোহরার্দি সাহেব ইতিহাসের কলংক ১৯৪৬ সালের বিভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নাটের গুরু হিসাবে জনমনে আজও বেঁচে আছেন। অথচ এদিকে তিনি আওয়ামী লীগের কাছে আজও শহীদ সোহরার্দি, ঘটা করে যাঁকে তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিন দু'টিতে স্মরণ করা হয়, যিনি আজও আওয়ামী লীগের প্রেরণা। তাই, এদের সেবা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শ্যামলরা মনে করে এ ধরণের রাজনৈতিক সংগঠন সমালোচনারও অযোগ্য।

এমতাবস্থায়, অলকবাবু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর না দেখে চুপচাপ বসে ছিলেন। মধুবচনবাবু এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করলেন। তাঁর মাথায় তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে কিভাবে অলকবাবুকে আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ার পাকাপোক্ত আসন থেকে হটিয়ে তিনি তা দখল করবেন। নিজের হৃত অবস্থান পুনরুদ্ধার করবেন।

স্বাভাবিকভাবেই তিনি সুজয়দের মত ছেলেদের একান্তভাবে কোলে টেনে নেবার সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং তারপর থেকেই শুরু হয়েছে এসব জঘন্য ক্রিয়াকলাপ।

শ্যামলদের প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে মশিয়াহাটীর জনগণ তীব্র প্রতিবাদ করলো সুজয়কে শিক্ষক পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে। অগত্যা ওরা চেষ্টা করে কেরাণী হিসাবে নিয়োগ করতে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতেও সফল হতে পারেনি।

ছাত্র ইউনিয়নের নেতার পদে সুজয়ের যাহোক একটু আত্মতৃপ্তি অন্ততঃ ছিল, তাও চলে গেছে কিছুদিন। আশা ছিল শিক্ষকতা সেও গেল, সংগে থাকলো শুধু অপমান, ঘৃণা আর ব্যর্থতা। এবংবিধ বিপাকে সে দিশেহারা। মধুবচনবাবুকে ওদের মনের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা সুযোগ এনে দিল।

সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। নির্বিঘ্নে সাঁকো তৈরী হয়ে গেল। এমতাবস্থায় কি করা যেতে পারে তারজন্যে মধুবচনবাবুর বাড়িতে সুজয়রা একত্রিত হলো। মধুবচনবাবু বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই—ওরা এত পরিশ্রম করে যা এখনও করতে পারেনি, আমাদের চেষ্টা করতে হবে সেটাই করার।

সুজয়ঃ তার মানে?

মধুবচনবাবুঃ অত ব্যস্ত হয়ো না, সবই আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলছি। এর পরে ওখানে ওদের করনীয় কি বাকী আছে, তোমরা শুনেছ?

ঃ হ্যাঁ, কাল ভোরে ওরা চাঁদা আদায় করবে হাটুরেদের কাছ থেকে।

ঃ ঠিক তাই, আমি তোমাদের সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম। ওরা এসব করছে তার একমাত্র কারণ নাম করতে চাচ্ছে, এটাতো ঠিক?

সবাই মধুবচনবাবুকে নীরবে সমর্থন করলো। মধুবচনবাবু বললেন, ওদের সাঁকো তৈরী করতে ক'জনেই আর দেখেছে, লোকে যেটুকু জানে সে ঐ বাঁশ কাটবার সময়। তাও তো সবার বাড়িতে যায়নি, গেছে যার বাঁশ আছে তাদের বাড়িতে; কিন্তু হাটবারে যদি ওরা পয়সা আদায় করতে পারে, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না, সবাই জেনে যাবে যে, ওরা—এতবড় একটা ভাল কাজ করেছে। আর টুকিটাকি তো করেই চলেছে, দেখ্ছে, শুনছে।

ঃ তাহলে কি করতে বলেন?

ঃ প্রশ্ন করার প্রয়োজন হয় বলে আমি মনে করি না। ওখানে যেভাবেই হোক তোমাদের আদায় করতে হবে। তাহলে নামটা যেমন হয়ে যাবে, মিষ্টি খাবার কিছু টাকাও তোমরা পেয়ে যাবে। আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয়, কতলোক হাটবারে ওর উপর দিয়ে পারাপার করবে?

ঃ তা ভোর রাত্রি থেকে শুরু করে রাত্রি এগারো-বারোটা. ঐ কি হিসেব করে বলা সম্ভব!

ঃ হ্যাঁ, ওর কোন হিসেব দেওয়া সম্ভব নয়, তবে তোমরা যেকোন হাটুরেদের কাছে দশ পয়সা-বিশ পয়সা আর বাঁক প্রতি চার আনা গাড়ী প্রতি একটানা, এভাবে যদি আদায় করো তাহলে কম করেও পাঁচশ'

বা এক হাজার টাকা হবেই। তাই যদি হয় ওর থেকে একশ' টাকা কলেজে দান করে দিলে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। ওরা কিন্তু কলেজে দান করার কথা চিন্তা করেছে, একথা যেন মনে থাকে।

সুজয়ঃ না, এ কাজ করা যায় না, এ নিয়ে আর এগোনো বোধহয় ভাল হবে না।

মধুবচনবাবুঃ কূলে এসে তুমি তরী ডোবাতে চাও! তোমার কি মাথা খারাপ

ঃ কিন্তু ওদের সাথে কি জোর খাটিয়ে পারা যাবে?

ঃ যে করেই হোক পারতে হবে, এটাই শেষ সুযোগ। কাল ভোরে না পারলে মশিয়াহাটীতে আর একশ' বছরেও পারবে না, তোমাদের সারা জীবন এভাবে একঘরে হয়ে থাকতে হবে, সে কথা একবার চিন্তা করেছ!

ঃ আমরা তো মাত্র ক'জন!

ঃ চিন্তা করার কোন কারণ নেই—আমি তো আছি। নওয়াপাড়া থেকে বিশজনের মত আসবে। ওরা এমনিতেই শ্যামলের উপর ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা থেকে ক্ষেপে আছে। পাঁজীটা এমন চালাক, নওয়াপাড়ার দিকে যায়ই না, নতুবা অনেক আগেই···। এ সুযোগ ওরা কোনক্রমেই ছাড়বে না। তাছাড়া ফুয়োনে মারামারি করতে ওদের সুবিধাও বেশী। একটা গ্রাম ডুমুরিয়া, ওটা পার হলেই বলতে গেলে মশিয়াহাটী এলাকা শেষ, নওয়াপাড়ার শুরু। —তোমরা শুধু গোলমালটা বাঁধিয়ে দেবে।

ঃ কিন্তু ওরা হলো মাত্র বিশজন আর আমরা এই ক'জন। আজকে ওখানে কাজ করেছে কতজন শুনেছেন? একশ' জনেরও বেশী, সেটাও একবার চিন্তা করতে হবে বারে বারে পিটানী খেয়ে পারা যায় না। আর ওরা না হয় মেরে চলে গেল—আমরা যাব কোথায়? পরে যদি বাড়ি থেকে টেনে বের করে পেটায়?

ঃ সে সব চিন্তা তোমাদের করতে হবে না! আমি M.P. বাবুর সাথে কথা বলে এসেছি, কোন গোলমাল হলে উল্টে আবার ওদের নামেই কেস্ হবে। বাড়িতেই পা দিতে পারবে না—তার আবার মারামারি। তোমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া আগামীদিন আদায়ের জন্যে ওরা বেশী লোক হাজির থাকবে না, সবার বাড়িতে কাজ আছে, গত তিনদিন ধরে

একটানা পরিশ্রম করে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ভোর বেলায় শ্যামল চলে এলো। অনেকটা দূর থেকে দেখলো, তার আগে অনেকেই চলে এসেছে। নিজেকে অপরাধী মনে হলো দেরী হবার জন্যে, তাই দ্রুত পা চালালো। কাছে গিয়ে তার আনন্দ একেবারে মিলিয়ে গেল। সুজয় ও তার দলবল সমেত অনেকগুলো নতুন মুখ। শ্যামলের বুঝতে সময় লাগল না, কাছে গিয়ে দেখলো সাদা চাদরে পাঁচ-সাত টাকা আদায় করে ফেলেছে।

শ্যামলের মাথা গরম হয়ে গেল। সহ্যেরও একটা সীমা আছে! বললো, সুজয়দা সাঁকো আমরা বেঁধেছি সবাই জানে, তোমাদেরও অজানা নয়। তোমাদের ডেকেছিলাম মিলেমিশে করার জন্যে; কিন্তু তোমরা রাজীতো হলেই না, বরং আমরা যাতে না করতে পারি সে চেষ্টার ত্রুটী করোনি। কিন্তু তারপর এসব আবার কি?

ঃ আমরা তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নই।

শ্যামল বুঝলো গণ্ডগোল করাই এদের একমাত্র ইচ্ছা। কিন্তু এক্ষুণি মারামারি করলে, শুধু মারই খেতে হবে; তাই নিজেকে সামলে নিয়ে সময় কাটাতে চাইলো। বললো, তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ আমি চাইনি, সে ইচ্ছা বা অধিকার আমার নেই। ঠিক আছে, দেরীতে হলেও তোমরা যখন সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছ, সে ভালোই হলো। এসো বাকী কাজটুকু মিলেমিশে করি।

ঃ না, আদায় আমরাই করবো।

ঃ সে কি! সাঁকো বাঁধলাম আমরা, আর তোমরা আমাদের আদায় করতে সংগেও নেবে না!

ঃ না।

ঃ কিন্তু তা হয় না, আমরা ইতিমধ্যে, কাঁতা পেরেক কিনেছি, একজন মিস্ত্রিকে জনের দাম দিতে হবে; এসব মিলে সত্তর টাকার মত খরচ করে ফেলেছি। এসবতো আমরা চাঁদা আদায় করে তুলে নেব ভাবছি।

এর মাঝে একে একে শ্যামলদের অনেকেই এসে গেছে, জমা হয়েছে বহু হাটুরে, শ্যামল বুঝলো অপ্রীতিকর ঘটনার মোকাবিলায় ওরা এখন সক্ষম।

ঃ না, ওসব হবে না, তোমরা কিসে কি খরচ করেছ আমরা তার কি জানি।

শ্যামল উত্তেজিত ভাবে জবাব দিলো, কি জানি-মানে? সাঁকোটা কি যাদুমন্ত্রে হলো নাকি?

ঃ বললাম তো আমরা তোমার কোন কথার কৈফিয়ৎ দেব না।

ঃ কৈফিয়ৎ দেবারও কোন প্রয়োজন নেই, চাদর গোটাও এবং তার আগে চাদরের পয়সাগুলোও রেখে দাও।

এর মাঝে অকস্মাৎ পিছন থেকে কেউ বাঁশের অংশ দিয়ে শ্যামলের মাথায় তীব্র আঘাত করলো। আচমকা আঘাত ঠেকানোর কোন সুযোগই সে পেল না। প্রচণ্ড আঘাতে পড়তে পড়তে শ্যামল একটা বাবলা গাছ ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলো. এগিয়ে এসে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো।

প্রস্তুত আর অপ্রস্তুত দুই দলে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। ছড়ানো ছিটানো বাঁশের লাঠি জোগাড় করার আগেই গুণ্ডাদের হাতে কয়েকজন গুরুতর জখম হলো. এতক্ষণে হাটুরে লোকগুলো দর্শকের ভূমিকা নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে দেখছিল। ঘটনা বুঝতে পেরে শিকে থেকে বাঁক খুলে লাফিয়ে পড়লো কিন্তু গুণ্ডারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো।

অবস্থা বিপজ্জনক দেখে ওর এক বন্ধু শ্যামলকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে পিছনের গ্রাম হাটগাছাতে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল। দুপুর বেলায় ধীরে ধীরে শ্যামলের জ্ঞান ফিরে এলো, মনে পড়লো সব ঘটনা। গা ঝাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো কিন্তু সম্ভব নয়, অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে সে অতি দুর্বল। ক্ষীণ কণ্ঠে জানতে চাইলো—আর কারুর কিছু হয়েছে কি-না, ওদের পিটিয়ে হঠাতে পেরেছে কি-না। ওকে সবাই আশ্বস্ত করে বললো, সবই ঠিক আছে।

স্থানীয় হাটুরেদের মধ্যে কয়েকজনে উদ্যোগ নিয়ে সারাদিন ধরে চাঁদা আদায় করে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিল এবং প্রকৃত ঘটনা প্রচার হয়ে গেল, ফুলে ফেপে তা মারাত্মক আকার ধারণ করলো।

এলাকার আপামর জনসাধারণ এ ঘটনাতে এত বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে গেল যে, ছাত্র লীগের ঐ সমস্ত ছেলেরা বাড়ি যেতে আর সাহস পায় না।

শ্যামলরা তখন জনগণকে বুঝিয়ে দিল দোষী শুধু ওরাই নয়, ওদের পিছনে আছে কিছু সংখ্যক মোড়ল আর আওয়ামী লীগের তৈরী দলই হলো ঐ ছাত্র লীগ। ফলে জন সাধারণের সমস্ত রোষ গিয়ে পড়লো আওয়ামী লীগ ও তার স্থানীয় নেতাদের উপর।

নেতাদের এতক্ষণে টনক নড়ে গেল। বুঝলো এ ঘটনার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিলে তারা জনগণ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফলত ওদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে।

অলকবাবু, মধুবচনবাবু প্রভৃতিরা মিলে পরামর্শ করে স্থির করলেন ঐ সমস্ত ছেলেগুলো কোন কাজেরই নয়। বরং শুধুই ডোবাচ্ছে। বর্তমান অবস্থাতে লোকের মনে তাদের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় হলো, ছাত্র লীগের ঐ সমস্ত ছেলেদের প্রকাশ্যে নিন্দা করা এবং ওদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।

যথা সিদ্ধান্ত তথা কাজ। ওদের তীব্র ভাষায় প্রকাশ্যে নিন্দা করা হলো এবং মারাত্মক ধারায় কেস দিয়ে হাজতে পুরতে দেরী হলো না।

পাণ্ডারাতো অবাক; একি হলো! আওয়ামী লীগের জামানায় হাজত বাস! ধীরে ধীরে ওদের চোখে সবই পরিস্কার হয়ে গেল, কিন্তু তখন আর সময় নেই। আসল তথ্য ফাঁস করে দেবার সুযোগ কত দিনে আসবে তাই বা কে বলতে পারে!—তখন কি আর কেউ তাঁদের বিশ্বাস করবে।

অলকবাবু, মধুবচনবাবুরা, তাঁদের কাজে সফলতা লাভ করলেন। লোকে তাদের বিশ্বাস করলো যে, তারা এসব বাজে নোংরা কাজ সমর্থন করে না বরং বিরোধীতা করে, শাস্তি দেবার চেষ্টা করে জনগণকে তাঁরা আপাতঃ-ভাবে হলেও বোকা বানিয়ে রাখলো।

শ্যামল দিন পনেরো বিছানায় শুয়ে রইলো। বারে বারে রীতাকে মনে পড়ে। কাজের মধ্যে থাকলে বেশ ভালই কেটে যায় কিন্তু অবসর মুহূর্তগুলো বড় কষ্টের। শত চেষ্টা করেও রীতার চিন্তা দূরে ঠেলে দিতে পারে না, বরং দিন দিন বেশী করে জাঁকিয়ে বসছে তার মনের মধ্যে। শ্যামল অনেক চিন্তা করেছে শুয়ে শুয়ে, তারপর স্থির করে ফেললো, রীতাকে সরাসরি সে বলবে তার মনের ইচ্ছা। ওসব কল্পনা নিয়ে খেলা আর ভাল

লাগে না। যাহোক, হঁ্যা অথবা না শুনে সে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু বলতে পারবে কি-না সে দিকটাও বারে বারে ভেবেছে। তার-পরেও 'না' বোধক উত্তরের ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও বিবেচনার মধ্যে রেখেছে—প্রাণে কতটা লাগবে তেমন হলে; কারণ এ নিয়ে তো আর আন্দোলন চলবে না।

লোকলজ্জার পরাজয় হলো রীতার ভালবাসার কাছে। দু'ধরণের চিন্তার অনেক টানাপোড়নের পর চিন্তা করলো শ্যামলকে একবার দেখতে সে যাবেই, লোকে যা বলে বলুক সে তো আর কোন অন্যায় করতে যাচ্ছে না। রীতা একদিন এক বান্ধবীকে সংগে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে এলো শ্যামলদের বাড়িতে। একদিন এ বাড়িতে ছিল তার অবাধ যাতায়াত, অপ্রতিহত গতি, সে সব আজ শুধুমাত্র স্মৃতি · রীতা জানে না আবার কোনদিন ঐভাবে সে এ বাড়িতে আসতে পারবে কি-না।

কিন্তু আজ বাড়িতে ঢুকছে চোরের মত, লজ্জায়, ভয়ে এতটুকু হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন মনে হচ্ছে সে নিজেও তার কারণ খুঁজে পায় না, কি এমন ঘটেছে যে, একজন বন্ধুর এ অবস্থায় একবার দেখতে আসতে পাবে না! —তবে কি সব দোষ তার নিজেরই মনে!

দুপুর বেলায় অন্য কেউই বাড়িতে ছিল না। রীতা আস্তে আস্তে শ্যামলের বিছানার পাশে বসলো। চেষ্টা করলো ওর অসুবিধার কথা জিজ্ঞেস করতে কিন্তু পারলো না। সমস্ত শক্তি যেন কে কেড়ে নিয়ে গেছে, অঝোরে চোখের জল ঝরে পড়ছে। অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর আস্তে আস্তে অনেক কথা হলো। শ্যামল বারে বারে চেষ্টা করছে অনেক দিনের সযত্নে গচ্ছিত কথাগুলো বলবে; কিন্তু পারছে না। রীতা যদি ভাবে—শরীর খারাপ দেখতে এলাম, বাড়িতে পেয়ে অপমান করলো ইত্যাদি। কিন্তু শ্যামল তবুও এ সুযোগ হারাতে রাজী নয়, কে জানে কত দিনে এমন একান্তে দু'টো কথা বলার সুযোগ আসবে অথবা সারা জীবনে আদৌ এ সুযোগ আর আসবে কি-না।

মরিয়া হয়ে শ্যামল বললো, রীতা, তুমি যদি কিছুই মনে না করো, তাহলে তোমাকে দু'চারটে কথা বলার ছিল।

রীতা, কি কথা বলো।

ঃ না, ভাবতে পারো বাড়িতে এসেছ, সেই সুযোগে তোমাকে দু'চারটে বাজে কথা বলে দিলাম—অপমান বোধ করতে পারো।

ঃ অপমান করেছ ভাববো কেন। নিশ্চয়ই তুমি অপমান করার জন্যে বলবে না!

ঃ না, তোমাকে অপমান করার কোন প্রশ্নই ওঠে না; কিন্তু তবুও কথাগুলো বলে যদি কোন অন্যায় করি ক্ষমা করে দিও।

রীতা শ্যামলের আবেগভরা কথাগুলো রুদ্ধশ্বাসে শুনলো।

শ্যামলের স্পষ্ট কথার কোন জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পায়নি সে। নীরবে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর প্লাবন নেমে এসেছে। যাবার সময় বলে গেল, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো তারপর অনেক কথা বলা যাবে।

★

দীননাথের নেতৃত্বে কৃষক সমিতি দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করে চললো। প্রত্যেকটা গ্রামের কৃষক সমিতিকে আরও বেশী ঐক্যবদ্ধ ও জংগী মনোভাবে গড়ে তোলা হলো। আঞ্চলিক সমিতিকে আরও বেশী সংহত ও সুসংবদ্ধ করা হলো; দীননাথ তাদের সর্বসম্মত নেতা।

কৃষক সমিতি প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে চললো ইউনিয়ন কাউন্সিলের অস্থায়ী রিলিফ কমিটিতে কৃষক সমিতির প্রতিনিধি নেবার জন্যে, কিন্তু সাড়া মিলছে না। অবশেষে একদিন ইউনিয়নের সতেরটি গ্রামের সংঘবদ্ধ কৃষকেরা কাউন্সিলের গুদাম ঘিরে ধরলো—কৃষক সমিতির প্রতিনিধি কমিটিতে নিতেই হবে নতুবা পাল্টা কমিটি খাড়া করে তাদের তত্বাবধানে রিলিফ সামগ্রী বণ্টন করে দেওয়া হবে।

অবশেষে বাধ্য হয়ে অস্থায়ী চেয়ারম্যান ওদের প্রতিশ্রুতি দিলেন; ওরা সেদিনের মত নিরস্ত হলো। তারপর অনেক সভা সমিতি, আলাপ-আলোচনার নামে তালবাহানা কিন্তু ওরা প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে সাহসী হলো না।

কৃষক সমিতির প্রত্যক্ষ তত্বাবধানের ফলে চুরি স্বাভাবিকভাবেই কমে

গেল, আর পরজীবি জানোয়ারগুলো ততই চঞ্চল হয়ে উঠলো একটা সুযোগের লোভে। শেষ পর্যন্ত তারা প্রায় বেপরোয়া। আর বেপরোয়া বলেই অসাবধান, পা দিল মারাত্মক ফাঁদে।

সাবেক পূর্ব্ব পাকিস্তান তৎকালে পুরোপুরি নির্ভর করতো করাচী থেকে আমদানীকৃত লবণের উপর। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর স্বাভাবিকভাবেই সে যোগান বন্ধ হয়ে যায়, আর সমস্ত দেশে তখন দারুন লবণ সংকট।

বাজারে লবণ নেই বলতেই হাওয়া, প্রতিসের চারআনা থেকে পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা, চল্লিশ টাকা। শেষ পর্যন্ত মেলে না, লবণ নেই। সম্ভবতঃ এই হিসাবে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল দিনাজপুর, প্রতিসের পঁচাত্তর টাকায় বিক্রির সংবাদ বেরিয়েছিল আওয়ামী লীগের সেবাদাস সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাকে।

এমতাবস্থায় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় রেশনে লবণ দেওয়া হবে। প্রয়োজনের তুলনায় অতি কিঞ্চিত হলেও জনসাধারণের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

প্রসঙ্গতঃ অপর একটি রেকর্ডের উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না।—জনৈক গরীব সীমান্ত এলাকায় বাস করেন। তিনি পাঁচ কিলো লবণ নিজের ব্যবহার অথবা চোরাকারবারী যাই বলুন, বনগাঁ থেকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে B D. R এর হাতে ধরা পড়েন এবং তিনি সতের বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। যতদূর জানি ভিতর থেকে হাইকোর্টে আপীল করে ছ'বছর পর জিয়া সাহেবের জংগী জামানায় বেকসুর খালাস হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

যাহোক, ইউনিয়ন কাউন্সিলের কৃষক সমিতির প্রতিনিধি জানতে পারলেন একটা কিস্তির পুরো লবণ চেয়ারম্যানবাবুর যোগাযোগে ডিলার কালোবাজারে বিক্রি করেছে। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। কারণ লবণ বলতে কথা! কৃষকেরা যতদূর সম্ভব খোঁজ খবর নিলো কিন্তু অসম্ভব। অংশভোগী এসব আমলাদের হিসাবপত্র পুরোপুরি ঠিক। চলতি আইন কানুনে কোথাও এতটুকু ত্রুটী নেই।

শান্তিরামের সংগে যুক্তি করে দীননাথ একটা অভিনব উপায় উদ্ভাবন

করলো। ডিলার একটা ক্যাবলা লোক; ধরে ভয় দেখালে হয়তো আসল তথ্য ফাঁস করে দিতেও পারে।

গভীর রাত, দীননাথ কয়েকজন বিশ্বস্ত সাথীকে সংগে নিয়ে ডিলার-বাবুর বাড়িতে চলে এলো, ওকে ডাকলো, ডিলারবাবু বেরিয়ে এলো, তারপর ওকে ডেকে রাস্তায় নিয়ে এলো এবং অতঃপর কাধে চড়ে অনেক দূরে, একেবারে বিলের মাঝে হরিতলাতে।

ডিলারবাবুর ততক্ষণে আক্কেল গুড়ুম। দীননাথের ক্রিয়াকর্মের কিছু কিছু খবর ভারত থেকে ফিরে গিয়ে সবাই শুনেছে সত্য-মিথ্যা জড়িয়ে। সে আজ ডিলারবাবুর ওপর খড়গহস্ত। ধমক খেয়ে সবই ফাঁস করে দিয়ে বললো, আমাকে তোরা খুন করিস না, বাড়িতে চল্, সব কাগজপত্র তোদের দিয়ে দিচ্ছি। চালানের মাল তুলেছিলাম তার রসিদ পত্র, মেমো নম্বর, তারিখ সবই আছে এবং আক্ষেপ করে বললো, কাজটা তাঁকে দিয়ে করিয়ে একটা ছোট্ট অংশমাত্র ওকে দিল!

দীননাথরা ছিচ্কে চোর এই ডিলারকে ছোটবেলা থেকেই জানে। এতবড় চুরি বা ঝুঁকি ওর একার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। ওদের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হলো। এখন রুই-কাতলাগুলোকে জালে জড়িয়ে টেনে তুলতে হবে।

ডিলারবাবুকে নিয়ে সবাই ওর বাড়ি ফিরে গেল। কাগজপত্রগুলো সবই নিয়ে নিলো এবং সমস্ত বিবরণ বিস্তারিত লিখে ওকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হলো।

ভোর বেলাতেই সমিতির মাধ্যমে খবর প্রচারিত হয়ে গেল, সমস্ত অঞ্চল যেন ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠলো। স্কুলের সামনে ওদের বিচারের জন্যে এক সভা ডাকা হলো। আসামীদের ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠানো হলো।

সতেরোটি গ্রামের আপমর জনসাধারণ মিটিং-এ যোগদান করলো কিন্তু মধুবচনবাবুরা সরাসরি ঘটনা অস্বীকার করলো। কাগজপত্র বের করে ধরলে ওরা ডিলারবাবুর ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করলো। ডিলার-বাবু পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে ভীত হয়ে পড়লো যারজন্যে বহুকালের অসংখ্য কারবার ফাঁস হয়ে গেল, জনসাধারণ তখন আহত কেউটের মত ফুঁসছে।

দায়িত্ব এড়ানোর উপায় চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যানের ছিল না। কারণ প্রত্যেকটা চালান তোলবার আগে চেয়ারম্যানের অবশ্যই লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন এবং কবে, কোথায় এবং কতটুকু করে, প্রত্যেক গ্রামের কতজনকে, কাকে কাকে কোন জিনিষ দেওয়া হবে তার একটা তালিকাও চেয়ারম্যানদ্বয় দিয়ে থাকেন, লোক সংখ্যার অনুপাতে জিনিষপত্র কম থাকায় এ ব্যবস্থা চালু ছিল। যথারীতি মাসাধিককাল আগে লবণ তোলার জন্যেও তিনি অনুমোদন করেছিলেন, সে কাগজ পত্র ডিলারবাবু বের করে দিলেন। তাতেও চেয়ার-ম্যানবাবু দোষ স্বীকারে রাজী নন; যুক্তি দেখিয়ে পাশ কাটবার চেষ্টা করলেন যে, অনুমোদন করেছিলাম কিন্তু ও তুলে যে বিক্রি করেছে তা আমার জানবার কথা নয়।

দীননাথ: ওসব ন্যাকামো কথা ছাড়ো। আমরা তোমার কাছে বারে বারে জানতে চেয়েছি যে, কোন লবণ এসেছে কি-না। তুমি বলেছ লবণ আসেনি, আসলে নাকি তোমারই আগে জানবার কথা! এখন ধোয়া তুলসী পাতা সাজলে চলবে না, ভাল মানুষের মত টাকাগুলো ফেরত দাও।

চেয়ারম্যানবাবুরা এ অবস্থার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, ডিলারবাবুর সাথে তাঁদের ইতিমধ্যে কথা হয়েছিল যে, সে (ডিলার) নিজের ঘাড়েই পুরো দোষ নিয়ে নেবে এবং পরে ওকে চেয়ারম্যানরা বাঁচাবার ব্যবস্থা করবে। ডিলারবাবুও রাজী হয়েছিল কিন্তু মিটিং-এর চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাণটা বাঁচলেই তবে আইনের সাহায্য। এখানে নিজের ঘাড়ে দোষ নিলে পরে আর চেয়ারম্যানদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। তাই প্রিয় পৈত্রিক প্রাণটাকে বাঁচাতে সব সত্যই প্রকাশ করে দিল।

চেয়ারম্যানদ্বয়ের কোন যুক্তিই ধোপে টিকলো না। বিরাট জনসভা একবাক্যে রায় দিলো আগে টাকা ফেল তারপর অন্য কথা।

টাকার অংক বেড়ে গেল। কারণ জনসাধারণ টাকা চায় না, চায় লবণ। কালোবাজারে বিক্রি করতে গিয়ে যে লোকসান চোরের দলে করেছে তার খেসারত জনগণ দেবে না। লবণের যে পরিমাণ, তার মূল্য বিশ হাজার টাকার মতই, ফলে তাই দিতে হবে, যে দামেই বিক্রি করুক না কেন।

অনেকেই প্রস্তাব করলো ঐ সাথে আরও কয়েক হাজার জরিমানা ; কিন্তু কৃষক সমিতি সে প্রস্তাবে রাজী হলো না। আগে চুরি করা টাকা উদ্ধার হোক, তারপর ওদের বিচার হবে।

বাড়িতে গিয়ে টাকা আনার সুযোগ দিতেও কমিটি নারাজ। লোক মারফত আনাতে হবে, কোন বিশ্বাস নেই চোরগুলোকে।

এতক্ষণে ওদের শিরে সংক্রান্তি ; জ্ঞান হলো যে টাকার মোটা অংশই মধুবচনবাবুর পকেটে অথচ তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

চেয়ারম্যানবাবু বললেন, মধুবচনদা, তোমার কাছে যেটা আছে, ওটা আনতে কাউকে পাঠাও ?

মধুবচনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। আমার কাছে টাকা ! কিসের টাকা ! আমি তোমাদের ওসব চুরি-চামারির মধ্যে নেই। —বলে উঠতে যাচ্ছিলেন।

চেয়ারম্যানবাবু উঠে গিয়ে হাত চেপে ধরলেন। বললেন, উঠবেন না। ছোট্ট কাগজটুকু আমিও যত্ন করে রেখেছি। যে যত টাকা নিয়েছেন, টাকার অংকের পাশে সবার স্বাক্ষর করা আছে।—বলতে বলতে একটা চিরকুট বের করে দীননাথের হাতে তুলে দিলেন।

মধুবচনবাবু দীননাথ দৈত্যের কানা চোখটার দিকে একবার তাকিয়ে ধপ্ করে আবার বসে পড়লেন।

মধুবচনবাবু জড়িয়ে পড়ায় আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো। সবাই জানে ঐ লোকটাই নষ্টচন্দ্র কিন্তু সব সময়ই ধরা-ছোঁয়ার উর্দ্ধে ; আজ হাতী নরম কাদায় পড়েছে।

প্রত্যেকের বাড়ি থেকে টাকা এসে গেল, দেরী হলোনা। টাকা দেখেই বোঝা গেল হাজার পনের একেবারেই নতুন চকচকে নোট। বাকী পাঁচ হাজার যে জোগাড় করে আনা হয়েছে তার ছাপ সুস্পষ্ট। টাকাগুলো দীননাথ সভাপতি মশায়ের হাতে তুলে দিল। আর সংগে সংগে জনাকীর্ণ সভা যেন উবু হয়ে এসে ওদের তিনজনের মাথায় পড়লো। ধোলাই কাকে বলে—এ দৃশ্য যারা দেখেনি তাদের দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

— তের —

অবশেষে বিচারে ওদের কোন জরিমানা হলো না। কারণ দু'-পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া ওদের পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়, চুরির টাকাইতো ফেরত দিতে হবে মাত্র। তাই সে দিকে লক্ষ্য রেখে শাস্তি দেওয়া হলো—মাথা ন্যাড়া করে, মুখে চুন-কালি লাগিয়ে, গলায় টিন ঝুলিয়ে দেওয়া হবে এবং ওরা ঐ টিন বাজিয়ে ইউনিয়নের সতেরটি গ্রাম ঘুরবে এবং রাস্তার জনসাধারণকে ডেকে ডেকে বলবে "আমরা লবণ চুরি করেছি, তাই আমাদের এই সাজা।" ডিলারবাবু ধোলাই-এর হাত হতে রেহাই পেলেও, এ ব্যবস্থায় মাফ পেল না।

কৃষক সমিতি শুধু রিলিফ সামগ্রী নিয়েই তাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ করে রাখেনি। পূর্বের সমস্ত দাবীগুলোকে আদায় করার জন্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে শুরু করলো। দিন মজুরীর ওপর একান্তভাবে নির্ভর করতে না হওয়ায় তারা অনেকটা বাড়তি সুবিধা পেয়ে গেল। চার টাকার কমে জন বিক্রি করতে কেউই যাচ্ছে না, বাড়ির কাজকর্ম অথবা সীমিতভাবে টুকিটাকি ব্যবসা করছে। পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাগ-চাষীদের রসিদ দিতেই হবে এবং খুশীমত উচ্ছেদ করা চলবে না। হাল বলদে চাষ করলে দুই তৃতীয়াংশ ফসল কৃষককে দিতেই হবে। বন্ধকী জমি সম্পর্কে পূর্ব্বের সিদ্ধান্তে অচল থেকে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো নিজেদের মধ্যে। কোথায়, কার কাছে কি পরিমাণ জমি কতদিন ধরে বন্ধক দেওয়া আছে তার হিসাব শুরু হয়ে গেল এবং আলোচনায় বসবার জন্যে জোতদার-মহাজনদের জানিয়ে দেওয়া হলো। ভিতরে ভিতরে জোর তৎপরতা শুরু হলো এসব দাবী নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, যাতে কোন সুষ্ঠু মীমাংসা হতে পারে।

কয়েক বছর আগে কৃষক সমিতি বহু খাস জমিতে যৌথভাবে চাষ করেছিল কিন্তু সেগুলো অন্যেরা কেটে নেয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তারই জবাবে ঐ সব জমির ধান এবার সমিতি কেটে নেবে এবং আগামীতে আবার নিজেরাই চাষ করবে।

কৃষকদের এই অনমনীয় ও জংগী মনোভাবে জোতদার-মহাজন, ধনী-কৃষক ও মোড়লেরা ভীত হয়ে পড়লো। এদের মধ্যে অনেকেই লবণ

কেলেংকারীতে সমিতিকে সাহায্য করেছে। এতক্ষণে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো। কারণ, এই লবণ কেলেংকারীই সমিতিকে একেবারে তুংগে তুলে দিয়েছে। সমগ্র জনগণ এতদিনে কৃষক সমিতির, গুরুত্ব প্রয়োজন ও সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। সমিতি মানুষের মনের গভীরে স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছে, নিজেদের ওপরও আস্থা অনেক বেড়ে গেছে।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই কৃষক সমিতি দাবী তুললো, পুলিশের দালাল মধুবচনবাবুর বিচার চাই। উনি ষড়যন্ত্র করে ডাকাতি কেসে দীননাথকে জেলে পাঠিয়েছিলেন; যার জন্যে ওকে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, একটা চোখ হারাতে হয়েছে। শুরু হলো মধুবচনবাবুর অপকীর্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজ।

*　　　*　　　*

মশিয়াহাটী অঞ্চলে মেয়েদের বিয়ে হয় অনেকটা অল্প বয়সে। যারা পড়াশুনা করে তাদের সাধারণতঃ নবম বা দশম শ্রেণীতে অথবা তার আগেই; কদাচিৎ মাধ্যমিক পরীক্ষাটা শেষ হলেই। আর সমবয়সী, যারা পড়াশুনা করে না তারা ততদিনে মা তো হয়ই, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আরও কিছু।

রীতার এক বছর আগেই মাধ্যমিক পাশ করে যাবার কথা; কিন্তু ৭১ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্যে পরীক্ষা একটা বছর পিছিয়ে গেছে। তাই ওর অভিভাবকেরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে গেছেন ওকে পাত্রস্থ করার জন্যে। এর মধ্যেই পুকুর পাড়ে, কলের ঘাটে মেয়েরা অনেক অপ্রীতিকর মন্তব্য করা শুরু করেছে, যেগুলো কানে মোটেই শ্রুতিমধুর লাগে না। তাই, সবাই উঠে পড়ে-লাগলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

সাধারণতঃ এখানে বিয়েতে অভিভাবকদেরই মতামত চূড়ান্ত হয়ে থাকে, পাত্র-পাত্রীর মতামতের ওপর কিছু নির্ভর করে না। মেয়েদের বেলায়তো নয়ই ছেলেরাও তাদের মতামত নিয়ে জোর করতে পারে না। কারণ অধিকাংশ ছেলেরই যখন বিয়ে হয় তখন তারা হয়তো বেকার নতুবা অধ্যয়নরত।

অশিক্ষিতদের বেলায়ও ব্যতিক্রম নয় ; তাদেরও একমাত্র সহায় পৈত্রিক সম্পত্তি ; তাই মতামতও বাবা-কাকার। জনসাধারণ পুরোপুরিই ক্ষেতের ফসলের ওপর নির্ভরশীল, তাই চাকুরী কিছু কিছু লোকে করলেও এসব কাজের ওপর এ ধরণের পেশার কোন প্রভাব গড়ে ওঠেনি।

রীতার বিয়ে দিতে গিয়ে ওর অভিভাবকেরা চোখে শর্ষে ফুল দেখলেন, সামাজিকভাবে বিচার-বিবেচনা করতে গেলে যে ধরণের ছেলে প্রয়োজন, পাওয়াই যায় না। এ ধরণের ছেলেদের প্রায় প্রত্যেকের বিয়ে ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। কিছু কিছু যারা বাকী তার একটা অংশ কোন মেয়ের বাবার টাকায় পড়াশুনা করে অর্থকষ্টের জন্যে। অবশিষ্টাংশের দাবী-দাওয়া এত বেশী যে, রীতার বাবার পক্ষে তার লেজ স্পর্শ সম্ভব নয়। কোন কোন সময়ে এই লজ্জাজনক দর কষাকষি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পাড়ার লোক বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না যে, "এঁড়ে দরে উঠেছে"।

এ অবস্থায় অভিভাবকেরা যত বেশী হতোদ্যম, রীতা মনে মনে ততধিক খুশী ; কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করলো না। অবাধ্য না হয়েই যদি প্রয়োজন মিটে যায়, ক্ষতি কি !

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রীতার বাবা চরম হতাশা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে পায়ে যেন মাটি পেলেন। একটা ভাল ছেলে খুঁজে পাওয়া গেল। মনে মনে বললেন, এই জন্যেই বলে "সবুরে মেওয়া ফলে"।

ছেলেটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে Final পরীক্ষা দিয়েছে। Result এখনও বের হয়নি, ছাত্র ভাল পাশ করবেই। চেহারা-ছবি, স্বাস্থ্য এবং বাড়ির অবস্থাও ভাল। ছেলের পরিবার যেমন ভাল, যতদূর জানা গেল ছেলে অত্যন্ত সচ্চরিত্র, তেমন কোন দাবীও নেই। রীতা ও ওর বাবার জন্যে এতো আকাশের চাঁদ !

ছেলের অভিভাবকেরা এসে দেখে গেলেন। সবার পছন্দ, পছন্দ না হবার কথাও নয় ; কিন্তু বেঁকে বসলো রীতা নিজেই। রীতা ওর বৌদিকে বললো, বৌদি, তুমি দাদা আর বাবাকে বলে দিও, B.Sc. পাশ না করে আমি বিয়েই করবো না, ওরা যেন আর যোগাযোগ না করে।

ঃ ধাড়ী মেয়ের আবার লজ্জা ! —বলে বৌদি চলে যেতে চাইল।

রীতা এগিয়ে গিয়ে আঁচল টেনে ধরলো। বললো, তামাশা নয়, আমি সত্যি সত্যি বলছি, ওরা যদি বিয়ে ঠিক করে, তাহলে লজ্জায় পড়ে যাবে।

বৌদি রীতার চোখ মুখের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। ও সত্যিই এমন ছেলেকে বিয়ে করতে চায় না! বললো, ক্যান্, বিয়ে করবিনে ক্যান্?

ঃ এমনিতেই; B.Sc পাশ না করে আমি বিয়ে করবোই না।

ঃ না রীতা, তুই অমত করিস্নে, তালি শেষ পর্যন্ত তুই-ই ভুগবি, মা-বাবা আর কয়দিন! উরা না হয় যে কয়দিন আছে চিন্তা করবেনে কিন্তু অসুবিধে হলি শেষ পর্যন্ত তোরই ভুগদি হবেনে।

ঃ না, আমার জন্যে তোমাদের অত চিন্তা করতে হবে না, তুমি ওদের বলে দিও।

ঃ ক্যান্. প্রেম-ট্রেম করিচির নাহি?

ঃ করেছি. তুমি ওদের আগে বারণ করে দাও, তারপর অন্যচিন্তা করা যাবে।

রাতে বৌদি রীতার অমতের কথা দাদাকে জানিয়ে দিল। দাদা শুনে প্রথমে আমল দিতে চায়নি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব শুনে রেগে আগুন হয়ে গেল। বললো, বিয়ে দেব আমরা, ওর আবার মত --অমত কি? — ভাল-মন্দ কি আমরা ওর চেয়ে কোম বুঝি? বৌদি আর বেশী কথা বলার সাহস পেল না। বললো, তুমার বাবারে কথাডা সুহালে কয়ে দিয়েনে, উগেও তো কথাডা শুনা দরকার।

সকাল বেলায় দাদা কথাটা বাবাকে জানিয়ে দিল। ওর বাবা রীতাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বড় ছেলেটাকে তিনি পড়াতে পারেননি, বড় মেয়েকেও তাই। ছেলেমেয়ের মধ্যে একমাত্র রীতাই মাধ্যমিক পাশ করলো, তাই ওর প্রতি দুর্বলতা একটু বেশী। বললেন, ছোট মানুষ আপত্তি করেচে, বুঝোয়-টুঝোয় রাজী করলিই হয়ে যাবেনে।

ওর বাবা রীতাকে ডেকে বললেন, মণি, আমরাতো বুঝি, এ ছেলে খুব ভাল ছেলে। শান্তিতি থাকতি পারবি, অমত করিস্নে।

রীতা বললো, বাবা, আমি B.Sc. পাশ না করে বিয়ে করবো না। একদিন তোমাকে ও বাড়ীর ওরা কি বলেছিল মনে পড়ে? —তোমার মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে তা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিল। আমি 1st. Division-এ পাশ করেছি, B. Sc. পাশ করতে আমার আটকাবে না, তোমরা শুধু অমত করো না।

রীতার বাবার খুব ইচ্ছা মেয়ে B. Sc. পাশ করুক। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার অনেক আগে থাকতেই ওকে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করেছে; কিন্তু রাজী করাতে পারেনি। তা নিয়ে অনেকেই অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছে। তাই মেয়ে যদি B. Sc.-টা পাশ করতে পারে, তাহলে ওদের কথার একটা যোগ্য জবাব দেওয়া হয়। এ তল্লাটে কারুর কারুর মেয়ে গ্রাজুয়েট হলেও, Science গ্রাজুয়েট কেউ নেই। তাই, নিজের মেয়ে সম্পর্কে এ লোভটা বড় কম নয়।

কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত তিনি এ লোভটা সামলে নিলেন। বাপ-বেটায় মিলে পরামর্শ করলেন, এত বড় সুন্দর ছেলে মেলা কষ্ট, ভাগ্যে না থাকলে জোটে না; তাই কোনক্রমে এ সুযোগ হারানো চলে না। বিয়েতে রীতার সামান্য আপত্তি, ওটা বিয়ে হলেই ঠিক হয়ে যাবে। এমন সুন্দর জামাই হলে মেয়ে কি আর কখনও অসন্তুষ্ট হতে পারে। তাছাড়া, এমন ঘরে মেয়ে পড়লে বিয়ের পরেও পড়াশুনা করার সুযোগ পাবে।

রীতার বাবার পক্ষ থেকে কয়েকজনে ছেলে দেখে এলো। সবাই খুশী, ছেলের একবার দেখার ইচ্ছা, তাই আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে।

নির্দিষ্ট দিনে দু'জন বন্ধুকে সংগে নিয়ে ছেলে দেখতে এলো। দু'জনের একজন মশিয়াহাটী এলাকারই।

রীতা বাবা-দাদাকে অপমান করার কথা চিন্তা করতে পারে না। লজ্জিতভাবে ওদের সামনে গিয়ে বসলো। ছেলের বন্ধু প্রথমেই প্রশ্ন করলো—আচ্ছা রীতা, এ বিয়েতে আপনার মত আছে তো?

রীতা ধীরে ধীরে জবাব দিলো—আমার বাবার আমন্ত্রণে আপনারা এসেছেন, আমি আপনাদের অপমান করতে পারি না। কিন্তু আপনারা জানতে চাচ্ছেন, সত্যি কথাই বলবো, আমার ছেলেবেলা থেকেই একান্ত ইচ্ছা

পড়াশুনা করার —তাই B.Sc. টা অন্ততঃ পাশ না করে বিয়ে করার কোন আন্তরিক ইচ্ছা আমার নেই। মা-বাবা গ্রামের মানুষ, তাই বোঝাতে পারছি না, আশাকরি আপনাদের হয়রানি করার জন্যে আমার মা-বাবাকে কোন দোষ দেবেন না, ওদের হয়ে সেজন্যে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

★

ইতিমধ্যে মশিয়াহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ে সরকারী circular এসেছে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী কার্য নির্বাহক কমিটি গঠন করার। শ্যামলরা নেমে পড়েছে একটা তৃতীয় শক্তি সংগঠিত করার কাজে। যার ফলে নির্বাচন রোধ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, নিরপেক্ষ, বুদ্ধিমান ও সৎ জনসাধারণকে নিয়ে কার্য নির্বাহক কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়।

ভোটার তালিকা তৈরী করার অসম্পূর্ণ সভা আবার বসলো। শুরু হয়ে গেল কলহ, ঝগড়া-ঝাঁটি, সমস্যার জট খুলতে অনেকেই নিজ নিজ মত ব্যক্ত করলেন। শ্যামল সুযোগ পেয়ে দু'কথা বলতে উঠে দাঁড়ালো —শ্যামল তার পরিকল্পনা মাফিক প্রথম থেকেই শুরু করলো, এইসব কাড়াকাড়ির কারণ কি? কেন কাড়াকাড়ি হয়, কাড়াকাড়ি করার উদ্দেশ্যই বা-কি? এবং এইসব কাড়াকাড়ি-খেয়োখেয়ির পরিণতি কি হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতে হবে। শ্যামল বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে এসব ঘৃণ্য দলাদলির তীব্র সমালোচনা করলো, সুফল-কুফলগুলো পাশাপাশি সঠিকভাবে তুলে ধরলো। পরিশেষে সে আবেদন জানালো দলাদলি নয়, মিলেমিশে একটা কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করা হোক এবং সেখানে দলাদলি বিষাক্ত লোকগুলোকে আপাততঃ বাইরে রেখে, নিরপেক্ষ, বুদ্ধিমান ও সৎ জনসাধারণকে নিয়োগ করা হোক।

সভার সমস্ত লোক একেবারে স্তম্ভিত — এ ধরণের চিন্তা তো কেউ কখনও করেনি। শীর্ষ স্থানীয়দের চিন্তা কিভাবে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যায়, গোঁড়া সমর্থকেরা নেতার মুখ দিয়ে কি নির্দেশ আসে তার অপেক্ষায়, ভাল-মন্দের ধার ধারে না; সুযোগ সন্ধানীরা দর কষাকষিতে ব্যস্ত — কার দলে গেলে কতটুকু পাবো। কিন্তু সমস্যা হলো এক শ্রেণীর মাতব্বরদের —তারা সত্যিকারের স্কুল দরদী, সাধারণের জন্যে চিন্তা করার চেষ্টা করে,

ভাল-মন্দ বিচার করতে চায়। কিন্তু তারা সংখ্যায় এমন কিছু বেশী নয় অথবা ক্ষমতা বা ইচ্ছাও তেমন হয়ে ওঠে না—যাতে করে পরিবেশকে নিজেরা পরিচালনা করতে পারে। ফলে, এরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে—কাদের সমর্থন করলে সত্যিকারের কিছুটা ভাল কাজ হতে পারে তা স্থির করতে না পেরে; কিন্তু শ্যামল আজ আবার বলে কি! একি সম্ভব! জঁাদরেল জঁাদরেল মাতব্বরদের বাদ দিয়ে স্কুল পরিচালনা! এ যে কেউ কল্পনা করতেও সাহস করে না!

কিন্তু শ্যামলের উপর ওদের ভরসা অনেক। এ ছেলেকে তারা ছেলে বেলা থেকেই দেখে আসছে, একেবারে নাছোড়বান্দা, কোন কাজে হাত লাগালে শেষ না হলে ছাড়বে না। আর পরাজয়! ওটাতো ওর অভিধানে লেখা নেই — কি অভূতপূর্ব সাংগঠনিক পারদর্শিতা!

সং মাতব্বরেরা অনুপ্রাণিত হলো। এগিয়ে এলো ধুরন্ধরদের একটা অংশ — যারা জঁাদরেল সব মাতব্বরদের পয়লা নম্বরের চ্যালা। ওদের বরাবর নেতার মুখের দিকে তাকিয়ে কাটাতে হয়; উচ্ছিষ্ট যদি কিছু দয়া করে দেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ক্ষতি কি একটা ঝুঁকি নিতে! কপাল ভাল থাকলে এতকালের মুরব্বিকেও কলা দেখানোর সুযোগ এসে যেতে পারে।

শ্যামল বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নেমে পড়লো গ্রামে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার শুরু করলো, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝাতে চেষ্টা করলো তাদের বক্তব্যকে; কিন্তু খুব একটা উৎসাহ পেল না জনগণের দিক থেকে। পাবেই বা কেন! যুগ যুগ ধরে যে বদ্ধমূল ধারণা ওদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে তার প্রভাবমুক্ত হওয়া কি এতই সহজ! গ্রামের সাধারণ মানুষ এতকাল ধরে বুঝতে শিখেছে তারা হলো গরু-ভেড়ার পাল আর অলকবাবু, মধুবচন-বাবুরা হলো রাখাল — রাতারাতি এর উল্টো চিন্তা করার সাহস তাদের আসবে কি করে!

শ্যামল বুঝতে পারলো জনসাধারণ তাদের ভুল বুঝছে, তারা ওদের স্নেহ করলে, ভালবাসলেও স্কুল পরিচালনার কর্ণধার করার চিন্তা করতে পারছে না, শ্যামলরা বোঝাতে পারছে না যে, তারা (ছাত্রেরা) কখনই যাবে না

স্কুলে খবরদারি করতে।

নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনার পরে স্থির করলো— প্রচারে তাদের সাথে কৃষক সমিতির নেতৃস্থানীয় কৃষকদের সংগে নিতে হবে, এটুকু কষ্ট তাদের করতেই হবে। কিন্তু দিনের বেলায় কাজের ক্ষতি করে দিনের পর দিন তাদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। তাই সন্ধ্যেবেলাতেই প্রচারে বেরোতে হবে এবং ওদিকে যতটা রাত সম্ভব। তাতে দু'দিকে সুবিধা হবে; কাজের যেমন ক্ষতি হবে না; আর জনসাধারণকে নিশ্চিতভাবে বাড়িতে পাওয়া যাবে। তাছাড়া সংগে নিতে হবে গ্রামের সং-নিরপেক্ষ বয়স্ক লোকগুলোকে।

কাজের সুবিধার জন্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নয় —তালিকা তৈরী করে পরিকল্পনা মাফিক এক একটা গ্রামের অংশ বিশেষে এক একটা রাতে কাজ করতে হবে এবং আগে থেকেই ওখানকার জনসাধারণকে সংবাদ দেওয়া হবে। ঐ পাড়ার ছেলেরাই নির্দিষ্ট বাড়িতে সবাইকে একত্রিত করার চেষ্টা করবে।

মাতব্বরদের অনুকূল অংশটিকেও সংগে নেওয়া হবে এবং এ ব্যাপারে ছাত্র ও কৃষক সমিতির সভ্যদের আগে থেকেই ওদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হলো— ধীরে ধীরে ক্ষমতা যেন ওদের কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে, নিয়ামক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ যেন ওরা না পায় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। ওদের, নিজেদের প্রয়োজনে, ভালোর প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।

অগণিত কর্মী, পরিকল্পিত প্রচার, যুক্তিসংগত বক্তব্য আর সদিচ্ছা জনসাধারণের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দ্বিধাবিভক্ত — নিজেদের টিকিয়ে রাখবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে; কিন্তু অনুভব করলো ধীরে ধীরে যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তবুও তারা দমলো না। ভোটের হিসাব করে তখনও জেতবার আশা।

অবশ্য তাদের সে আশা একেবারে অমূলক নয়। কারণ, সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে ভোটার সংখ্যা খুবই কম। ফ্রি লজিং ন্যূনতম মধ্যবিত্তরা দিতে পারে—একেবারে গরীব কৃষকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিদ্যোৎসাহী

হিসাবে বাড়ির কর্তা যেমন একজন ভোটার আর বিদেশী অভিভাবকেরা স্বাভাবিকভাবেই লজিংম্যানের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। তাছাড়াও অলকবাবু-মধুবচনবাবুরাই লজিং-এর ব্যবস্থা করে থাকেন, ফলে বিদেশী গার্জেনরাও ওদের অনুগ্রহধন্য। ফলে ভোটটা স্বাভাবিকভাবেই মোড়লদের কুক্ষিগত হবার কথা। অন্যদিকে গরীবদের অনেক অসুবিধা। তাদের ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর তাই আগ্রহও কম, ফলতঃ ভোটার হবার তাদের সুযোগ কোথায়।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও অবস্থা দিন দিন আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে থাকলো। তখন মধুবচনবাবু, অলকবাবুর কাছে প্রস্তাব দিলেন; তিনি (অলকবাবু) যেন ওদের প্রতিরোধ করার সমস্ত ব্যবস্থা নেন. মধুবচনবাবু শর্তমুক্ত সাহায্য করবেন।

অলকবাবু সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে সলা পরামর্শ আরম্ভ করলেন — কি করা উচিৎ এমতাবস্থায়। মধুবচনবাবুর মত ধূর্ত লোক কেন আজ শর্তমুক্ত সাহায্য করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছেন. তিনি তো এত সোজালোক কোনদিন নন!

অলকবাবুরা দেখলেন, মধুবচনবাবুর গলায় টিন ঝোলাবার পর উঁনার মাতব্বরিতে ষোল আনা মন্দা যাচ্ছে, তারপরেও কৃষক সমিতি শ্লোগান তুলেছে দীননাথের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা ও পুলিশের দালালীর অভিযোগে ওর বিচার করবে। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করলে মধুবচন-বাবুর পক্ষে যে কোন প্রকারে দীননাথ-শ্যামলদের পরাজিত করার চিন্তা মোটেই অযৌক্তিক নয়। কিন্তু এ সমস্তের মাঝেও তিনি তাঁর স্বাভাবিক চাতুরতা ত্যাগ করেননি।

মধুবচনবাবু নিশ্চিত জানেন পৃথকভাবে হোক আর যৌথভাবেই হোক নির্বাচন লড়লে গোহারা হারতে হবে, তাই এ অবস্থায় পরাজয়ের গ্লানির মোটা অংশ তিনি অলকবাবুর মাথায় চাপাতে চাচ্ছেন। পক্ষান্তরে অলকবাবুর সেই দুর্বলতার সুযোগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যদি কোন উপায় উদ্ভাবন সম্ভব হয়।

অলকবাবু গত নির্বাচনে মধুবচনবাবুর দলবলের নিকট হেরে গিয়েছিলেন।

স্কুল এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল — উভয় নির্বাচনেই। তারপর মধুবচনবাবু নিজে এবং তাঁর নেতৃত্বে সাঙ্গপাঙ্গেরা যে অপমানজনক ব্যবহার তাঁর (অলকবাবু) প্রতি করেছেন তিনি (অলকবাবু) তা কখনই ভুলতে পারেন না। সেজন্যে, তিনি প্রকারান্তরে মধুবচনবাবুকে বিপদমুক্ত করার মত কোন পদক্ষেপ নিতে মোটেই রাজী নন। তাতে যদি শেষ পর্যন্ত ছাত্র ও কৃষক সমিতির কাছে আত্মসমর্পণও করতে হয়।

অলকবাবু নিজের মতামত ব্যক্ত করলেন—নির্বাচনে আমরা হেরে ভূত হবো, এটা প্রায় নিশ্চিত। এ অবস্থায় নির্বাচন করা অপেক্ষা আমার মনে হয় ওদের সংগে সহযোগিতা করাই ভাল। কারণ, তাতে জনসাধারণের কাছে আমাদের ভাবমূর্ত্তি উজ্জ্বল হবে। ওরা সবাই অনভিজ্ঞ, একটা বছরের পুরো সময়টাই লেগে যাবে অবস্থাটা বুঝে নিতে, কাজ এমন কিছুই করতে পারবে না। ওদের প্রতি সবার মোহ কেটে যাবে। ফলে, আগামীতে আমাদের একটা সুযোগ আসলেও আসতে পারে। আর নির্বাচন করে হেরে গেলে সে হবে আরও লজ্জার। তাছাড়াও ওরা যদি এবার ওদের মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে মধুবচনবাবুকে এক হাত দেখে নেবে সেটাও আমাদের মস্ত লাভ। নির্বাচন করে আমরা পরোক্ষে মধুবচনবাবুদের সুযোগ করে দিতে পারি না। আমার মনে হয় প্রতিপক্ষ হিসাবে মধুবচনবাবু অপেক্ষা শ্যামল-দীননাথ অনেক উৎকৃষ্ট।

কিন্তু অলকবাবুর অধিকাংশ সাঙ্গপাঙ্গেরা তাঁর কথায় সাড়া দিলো না; তাঁদের মতামত অন্য রকম। এ অবস্থায় ওদের সাথে সহযোগিতার অর্থ হলো একেবারে আত্মসমর্পণ। সেটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় এর সংগে মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। লড়ে হারলে যে হার হবে বীরের পরাজয়।

তাছাড়া মধুবচনবাবু নাকি আভাষে-ইংগিতে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নির্বাচনের আগেই ওদের একটা ব্যবস্থা করা হবে; তাতে কারুর সহযোগিতার প্রয়োজন নেই; শুধুমাত্র বিরোধিতা না করলেই চলবে। ফলে চিন্তা কি!

কথায় বলে দশে চক্রে ভগবান ভূত, অলকবাবু কোন্ ছার! হলোও তাই।

নির্বাচনের তখন মাত্র আর তিন দিন বাকী। রক্ষী বাহিনী এসে নামলো মশিয়াহাটির বুকে; অজুহাত এতদঞ্চলে নাকি উগ্রপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ

অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

হেডমাস্টার ওদের অস্থায়ী ক্যাম্প করতে ছেলেদের ক্লাসের ক্ষতি করে স্কুলের ঘর ছেড়ে দিতে সোৎসাহে রাজী হলেন। কিন্তু ওদের তাতে হবে না। দোতালার অন্ততঃ বড় চারটি হলঘর ছাড়তে হবে। কারণ নীচের ঘরগুলো অপেক্ষা উপরের ঘরগুলো নিরাপত্তার দিক দিয়ে অনেক বেশী নিরাপদ। হলোও তাই, ওরা ওপরেই গেড়ে বসলো।

শুরু হলো মশিয়াহাটীর কোমল বুকে ওদের সহজাত তাণ্ডব নৃত্য। বিনা প্রয়োজনে যাকে তাকে ঠেঙায়, ভয় দেখায়, খুশিমত অন্যের গাছ-পালা কেটে আনে জ্বালানির প্রয়োজনে, বাধা দিলে রাইফেল উঁচু করে তেড়ে আসে, দু'দিনেই মশিয়াহাটীতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। পাশের গার্লস হাই-স্কুল ছাত্রী হাজিরার অভাবে বন্ধ হয়ে গেল, রক্ষী বাহিনীর চারিত্রিক গুণের মহিমা দেশব্যাপী Open secret

তৃতীয় দিনের গভীর রাত্রি। কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে সমস্ত বাহিনী গ্রামে ঢুকে পড়লো! খোঁজ করলো দীননাথ, শ্যামল, শান্তিরাম ও তরুণ অনেককে। কিন্তু কাউকে পেল না। ক্ষিপ্ত হয়ে আগুন লাগিয়ে দিল দীননাথ, শান্তি-রামের বাড়ি সমেত পাশের গ্রামের আরও একটি বাড়িতে। দাউ দাউ করে খড়ের ঘরগুলো জ্বলে উঠলো, বলাৎকারের চেষ্টা করতেও ওরা পিছ্‌পা হলো না; কিন্তু ততক্ষণে গ্রামের মানুষ সর্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখার আকর্ষণে প্রজাপতির মত ঝাঁপিয়ে পড়লো আগুনের ওপর, সর্ব্ব-শক্তি নিয়োগ করলো আগুনের সংগে লড়াই করতে।

কিন্তু সবার চেষ্টা ব্যর্থ করে বাড়িগুলো পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, সাথে সাথে ভেঙে পড়লো আজন্ম যত্নে তিলে তিলে গড়ে তোলা প্রিয় সাজানো সংসারগুলো, আর্তচিৎকারে বোধহয় আকাশ-বাতাসও কেঁদে উঠলো।

সারাদিন দাঁতে দাঁত চেপে রাতের অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করলো গ্রামের না খাওয়া মানুষগুলো। তারা এর প্রতিশোধ নেবেই। একইভাবে গ্রামের মানুষ হামলা করলো মধুবচনবাবুর বাড়িতে। মুর্ত্তিমান অদৃশ্য কিন্তু কত দিন? —টেনে ঘর থেকে বের করে আনলো ওর বয়োঃবৃদ্ধ জন্মদাতা পিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে। তারপর মহামান্যের অপকর্মের পাল্টা তারা

যে এ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছে একথা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে প্রথমেই আগুন লাগানো হলো ধানের গোলায়, তারপর একে একে প্রত্যেকটি ঘরে। মড়া পোড়াবার মত উল্টে-পাল্টে পরিপূর্ণভাবে বাড়িটাকে পুড়িয়ে দিয়ে যে যার মত বেরিয়ে পড়লো আশ্রয়ের খোঁজে—যেখানে আত্মগোপন করা সম্ভব। সবার মনে আফসোস্ বাড়ির সাথে বাড়ির মালিককে পোড়ানো আপাততঃ সম্ভব হলো না।

শেখ মুজিবর রহমান বারে বারে বেতারে ঘোষণা করতেন দেশের ওপর দিয়ে তিনি লাল ঘোড়া দাবড়াবেন। তাঁর সে লাল ঘোড়ার আসল রূপ হলো এই কুখ্যাত রক্ষী বাহিনীর বর্বরতা। অধুনালুপ্ত সে বাহিনীর নৃশংসতার নজীর ইতিহাসে অতুলনীয়, আজও দেশের লোক ওদের নাম শুনলে আৎকে ওঠে, নিজের অজান্তে হাতটা পিঠে বুলিয়ে দেয়। এদের অত্যাচারে (একটা কারণ) গণতন্ত্র হত্যাকারী, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী, খুনী, ব্যর্থ, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী শাসক শেখ মুজিবর রহমান জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন; আর এদের প্রতি তাঁর অহেতুক ও অতিরিক্ত দরদই (আরেকটি কারণ) তাঁকে নিয়মিত বাহিনীর কাছে ধীরে ধীরে অপ্রিয় করে তুলেছিল। তার বিনিময়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট কঠিন মূল্য দিয়ে তিনি চেষ্টা করে গেছেন কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার।

ভোর বেলাতেই লাল ঘোড়া যেন লাগাম ছাড়া হয়ে পড়ে। ভেঙে চুরে তছ্‌নছ্‌ করে দিল মশিয়াহাটীকে। গ্রেফতার করলো নারী-বৃদ্ধ আর শিশুদের; যুবকেরা তাদের নাগালের অনেক বাইরে।

দীননাথ শ্যামলকে আশ্বস্ত করে বললো, ভাইডি, এতটুকুতে ভয় পেলে চলে না। যা অনিবার্য তাই ঘটেছে, এর জন্যে মুষড়ে পড়লে চলবে না, আমরাতো আজ নোঙর বিহীন নৌকা। এর থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কঠিন ও দীর্ঘ লড়াই-এর জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে, মনকে করতে হবে বজ্রকঠিন; সুদীর্ঘ এই লড়াই-এ উজান-ভাঁটি তো আমাদের চিরন্তন সাথী!

— শেষ —